বিক্কি

বিদ্ধি

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ

মডেল পাবলিশিং হাউস
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
কলিকাতা।

এই বই বিক্রির নিট লাভ গ্রন্থকার কর্তৃক শ্রীহট্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবা-সমিতিকে শিক্ষা বিস্তারকল্পে দান করা হয়েছে।

দাম তিন টাকা

প্রকাশক : এস্ মণ্ডল, মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ; প্রিণ্টার : শ্রীবিভূতিভূষণ পাল, দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৪, বাগমারী রোড, কলিকাতা।

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মূল কথা—জ্ঞানেই শক্তি; হিন্দুসভ্যতার মূল কথা—জ্ঞানেই মুক্তি।" আমরা শক্তিই চাই কিংবা মুক্তিই চাই—জ্ঞানলাভ আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এই বইয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞানপিপাসা জন্মানো কিংবা বাড়ানো,—জ্ঞানপিপাসা মিটানো এর উদ্দেশ্য নয়। গুটিকতক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ে শুধু একটু-খানি পথ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে এর পর পথিক নিজে নিজে চলতে পারেন, এবং এগিয়ে চলার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে তীব্র হয়ে জাগে।

আজকাল লোকশিক্ষার আয়োজন স্থানে স্থানে হয়েছে এবং হচ্ছে। তাই সাধারণ পাঠকদের জন্য বাংলাভাষায় এরূপ একখানি বইয়ের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। আশা করি স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিকটও আনুষঙ্গিক পাঠ্য হিসাবে বইখানি কাজে লাগতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত পরিভাষা ও বানানপ্রণালী যথাসম্ভব অনুসৃত হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়গুলির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা অবশ্য আছে; কিন্তু তা হলেও অধিকাংশ অধ্যায়গুলি বিচ্ছিন্নভাবেও পড়া যেতে পারবে—তাতে বুঝবার পক্ষে বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না।

প্রাণিবিদ্যার আলোচনায় নাগপুর কংগ্রেসনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্তর নিকট থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। করাচী

মিউজিয়মের অধ্যক্ষ নৃতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায় এম-এ বি-এল পাণ্ডুলিপির আগাগোড়া,—এবং বিজ্ঞান কলেজের গবেষণা বিভাগের শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম-এস্-সি, পি-আর্-এস্ পাণ্ডুলিপির কতক অংশ অনুগ্রহপূর্বক দেখে দিয়েছেন। 'মাসপয়লা'-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য আগুয়ান হয়ে সাহায্য না করলে বর্তমানের নানা-অসুবিধার মধ্যে বইয়ের মুদ্রণ সম্পন্ন করান আমার পক্ষে খুবই কঠিন হত। এঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ইতি—

কলিকাতা
১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৬

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

সূচী

"অজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের সংগ্রাম। যুগে যুগে আবহমান কাল ধরিয়া ব্যক্তির ভিতর, জাতির ভিতর, সমাজের ভিতর, দেশের ভিতর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর— কতভাবে, কতরূপে কতই না হইল ও হইতেছে! ইহাই কি শাস্ত্রকথিত দেবাসুরের দ্বন্দ্ব? * * * এই সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইও না। হইয়াই বা করিবে কি? ভিতরে বাহিরে যেখানে চাহ, দেখ ঐ সংগ্রাম। আত্মহিত চাও উহা করিতে হইবে, পরহিত চাও উহাই; নিশ্চিন্ত বিশ্রামলাভ-করিতে চাও, উহা না করিলে বিশ্রামলাভ হইবে না। তবে উঠ, জাগ, কোমর বাঁধ, শক্তিরূপিণী তোমার সহায় হইবেন।

অন্যদেশে মা শতহস্তে ধনধান্য ঢালিয়া দিতেছেন। দেখিয়া ঈর্ষ্যায় তোমাব অন্তস্তল জ্বলিয়া উঠে। তাহাদের হৃষ্টপুষ্ট সন্তানসকলের প্রফুল্ল মুখকমলের সহিত ক্ষুৎকামকণ্ঠ, আচ্ছাদন-বিরহিত, রোগে জর্জরিত, তোমার সন্তানসকলের তুলনা করিয়া তুমি জগদম্বাকেই শত দোষে দোষী কর। অন্যের পদাঘাত-পীড়িত হইয়া তুমি অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিতে থাক;—কিন্তু দোষ কার? দেখিতেছ না, তাহারা অজ্ঞানসমরে সামর্থ্যপ্রকাশ করিয়াই বড় হইয়াছে—আর তুমি সহস্র বৎসরের অজ্ঞানতাকে হৃদয়ে অতি যত্নে পোষণ করিয়া নীরব-নিশ্চিন্ত আছ।"

স্বামী সারদানন্দ

বিদ্ধি

কেন ?

জানতে চাওয়াই মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। মানুষের কৌতূহলের সীমা নাই। ভূমিষ্ঠ হবার মুহূর্ত থেকেই মানবশিশু চারদিকের জগৎকে জানতে, বুঝতে ব্যাকুল। সমস্ত বিষয়ে, সমস্ত বস্তুতে শিশুদের অপরিসীম কৌতূহল কে না লক্ষ্য করেছেন ? প্রকৃতি তাঁর অপরিসীম রহস্যজাল দিয়ে আমাদিগকে ঘিরে রেখেছে ; অনুক্ষণ আমাদের মনকে, বুদ্ধিকে সংগ্রামে আহ্বান করে বল্‌ছে—"এস, সাধ্য থাকে ত এই জাল ছিন্ন কর।" আকাশের নীলিমা থেকে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অনু-পরমাণু সমস্তই রহস্যে ভরপূর। কেন এই জগৎ, কোথায় এর উৎপত্তি, কি এর আশ্রয়, কবে এর লয়—এ সকল প্রশ্ন প্রত্যেক সুস্থ মনেই উঠে। উঠে না শুধু তাদেরই যাদের মন আলস্য, অসৎ-সঙ্গ, অসদাচরণ কিংবা জগতের নিষ্ঠুর চাপে পর্যুদস্ত ও নিষ্পিষ্ট হয়েছে। উগ্রকর্ম, উগ্রচেষ্টা, বিষয়-বাসনার তীব্র উত্তেজনা, জীবিকার্জনের জন্য অতিমাত্রায় খাটুনি—এগুলি আমাদের জিজ্ঞাসাকে দাবিয়ে রাখে, কৌতূহলকে নিবৃত্ত করে, মনকে ঘুলিয়ে দেয়, বুদ্ধিকে ম্লান করে। কিন্তু জিজ্ঞাসা একেবারে বিলুপ্ত

হয় কি? যে ব্যক্তি ঘোর বিষয়াসক্ত, যে ধনসঞ্চয়ে অতিমাত্র ব্যগ্র, যে পরিবার-প্রতিপালনে ব্যতিব্যস্ত, যে রুগ্ন, যে দুঃখী, যে আর্ত, যে অক্ষরজ্ঞান-বর্জিত,—তারও চিত্ত মথিত করে ক্বচিৎ কখনো এই প্রশ্ন দুর্বার হয়ে উঠে না কি,যে—কেন এই দুঃখদৈন্য,কেন এই উদগ্র চেষ্টা —'আমি' কে,—কেন এলাম, কোথা হতে এলাম, মৃত্যুই কি আমার শেষ?

জিজ্ঞাসা মনুষ্যত্বের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কেন জানতে চাই—এ প্রশ্ন নিরর্থক। আমি মানুষ, আমি বুদ্ধিমান;—কৌতূহল আমার স্বভাব, জিজ্ঞাসা আমার ধর্ম। আমি যদি জিজ্ঞাসাকে বিলুপ্ত করি, জ্ঞানচর্চা না করি,—তবে আমার মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ হয়—আমি মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হই।

কথা উঠবে সাধারণ লোকের পক্ষে ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থাই সকল আগে চাই। জ্ঞানচচা ত সখের ব্যাপার। অন্নবস্ত্রের অভাবে আমাদের সমগ্র সমাজ মরতে বসেছে—জ্ঞানচচার অবকাশ আমাদের কোথায়, সার্থকতাই বা কি? কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে যে আমাদের অন্নসমস্যার সমাধান,—আমাদের আর্থিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রিক উন্নতির জন্যেই জ্ঞানচচা আমাদের পক্ষে আরো বেশী করে দরকার। অন্নসমস্যার সমাধানে আজকাল শুধু গায়ের মেহনত যথেষ্ট নয়, বুদ্ধির সঙ্গে শরীরকে খাটাতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে সেগুলোকে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে এবং দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে হবে। আমরা ইহা করিনি বলেই আজ আমাদের এত দুর্দশা।

ইতিহাস থেকে একটা স্থূল দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমাদিগকে শিখানো হয়, জয়পাল-অনঙ্গপাল মোহম্মদ ঘোরীকে ডেকে আনলেন, তাইতে দেশের সর্ব্বনাশ হল। আরো শিখি যে মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্যকে চির-অস্তমিত করলেন। এগুলি ঠিক, কিন্তু আংশিকভাবে ঠিক। আমাদের জাতীয় দুর্গতির একটা প্রধান কারণ এই যে আমরা হিন্দু-মুসলমান সকলেই কূপমণ্ডূক হয়ে পড়েছিলাম। প্রাচীন হিন্দু আমলে ভারতবাসীরা দূর-দূরান্তরে যেতেন,—দেশবিদেশের খবর রাখতেন। কিন্তু কালক্রমে সেই যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। কখন, কি কারণে, এবং কিভাবে হল তার ইতিহাস আজও সম্পূর্ণভাবে জানা যায় নি। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নাই যে এই আত্ম-সঙ্কোচন থেকেই আমাদের জাতীয় অবনতির সূচনা।

মোগল বাদ্‌শাহ্ জাহাঙ্গীরের সভায় স্যার টমাস্ রো নানাবিধ উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হলেন; তার মধ্যে মায় জুড়ীগাড়ীও ছিল। তিনি ভাল ভাল মদ বাদশাহ্‌কে,—শাহজাদাকে এবং অন্যান্য আমীর ওম্‌রাহ্‌কে উপহার দিলেন। এদেশের নানাস্থানে আড্ডা গেড়ে রো সাহেব সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করে দেখলেন, লিপিবদ্ধ করলেন, ইংলণ্ডে জানালেন। ইংরেজদূত মোগলশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করলেন। অপরদিকে হিন্দুস্থানের বাদ্‌শাহ বিলাতী শরাব পেয়েই খুশী। ইংলণ্ডে একজন দূত পাঠিয়ে কোন খোঁজ খবর নেওয়া তিনি আবশ্যক মনে করলেন না। ইউরোপে যে সময়ে নবযুগের সূচনা হল,—নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় লোক মন দিল—নূতন মহাদেশ, নূতন সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হল—বিশ্বজয়ের নবডঙ্কা

বেজে উঠল;—সেই সময়ে আমাদের বাইরের কপাট একেবারে রুদ্ধ,—বাইরের জ্ঞানজগৎ থেকে ভারতের শাসকমণ্ডলী ও সুধীসমাজ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন! যে সকল আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের যুদ্ধ-প্রণালী, শিক্ষাব্যবস্থা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়ে ইউরোপকে সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছে, ভারতবর্ষে সেই সকল আবিষ্কারের সংবাদ পর্যন্ত পৌঁছল না। আমাদের শাসকবর্গ ও জনসাধারণ সনাতন পন্থায় অবিচল হয়ে রইলেন। তখন থেকে সভ্যজগতের যাত্রাপথে আমরা ক্রমাগত কেবলি পেছিয়ে পড়লাম। নিজকে কূপমণ্ডূক করে রাখার, জ্ঞানচর্চায় অবহেলার, জানতে না-চাওয়ার—নিদারুণ ফলভোগ আমাদিগকে এখন করতে হচ্ছে।

আমাদের দেশের গোয়াল-ভরা গরু, মরাই-ভরা ধান, আরো কত কি বিগত ঐশ্বর্যের কথা আমরা প্রাচীন লোকদের মুখে শুনি, কাব্য-নাটকে পড়ি। একটা অস্পষ্ট ধারণা আমাদের মনে জাগে, সহসা কোন যাদু-কাঠির স্পর্শে সেই বিগত স্বর্ণযুগ আবার ফিরে আসবে—তার জন্য আমাদের তরফ থেকে বিশেষ চেষ্টা উদ্যোগ কিছু করতে হবে না। অথবা হয় ত সরকার বাহাদুরকে আমাদের সকল দুর্দশার জন্য দায়ী করে আমরা নিজের দায়িত্ব থেকে খালাস পাই। কিন্তু ধনোৎপাদন যদি দেশে বাড়াতে হয়, তবে কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানকে কাজে খাটাতে হবে। আমাদের দেশে দু'তিন পুরুষ আগে যে ঘি-দুধ-মাছ ও ধান-চালের প্রাচুর্য ছিল, তা ছিল একান্ত-ভাবে প্রকৃতির দান। লোকসংখ্যা ঢের কম ছিল; গোচারণ ভূমি, খাল-বিল প্রচুর ছিল—জলে মাছ কিলবিল করত, অল্পচাষে ফসল

ফলত। তখনকার দিনে আমাদের দেশের মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে, পরিশ্রম করে গোগ্রাস জন্মায় নি, মাছের চাষ করে নি, ফসলের উন্নতির চেষ্টা করে নি। সেই প্রকৃতি-দত্ত প্রাচুর্যের অবস্থায় আর ফিরে যাওয়া সম্ভবপর নয়। এখন শুধু অক্লান্ত চেষ্টা ও বুদ্ধিবলেই সব ব্যবস্থা করতে হবে। অতএব আত্মরক্ষা এবং ভাতকাপড়ের জন্যেও চাই জ্ঞানচর্চা।

আমাদের প্রাচীন ঋষির কথা আছে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽ বিদ্যামুপাসতে—
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।
অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া
ইতি শুশ্রুম ধীরানাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে।
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।

"যাহারা অবিদ্যার অর্থাৎ কেবল কর্মের অনুসরণ করে তাহারা অজ্ঞানরূপ গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা কেবল জ্ঞানে রত তাহারা তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।

"জ্ঞানীরা জ্ঞান ও কর্মের পৃথক্ পৃথক্ ফল কহিয়াছেন। যাঁহারা আমাদের নিকট ইহা অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মতত্ত্ব ব্যখ্যা করিয়াছেন, সেই জ্ঞানীদিগের মুখ হইতে আমরা এরূপ শুনিয়াছি। যিনি জ্ঞান ও কর্ম উভয়কে একত্র অর্থাৎ একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানেন, তিনি কর্মদ্বারা মৃত্যু (অর্থাৎ প্রাকৃত জীবন) হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবন) লাভ করেন।" [৺সীতানাথ

তত্ত্বভূষণ কৃত অনুবাদ।] টীকাকারেরা লিখেছেন—'অবিদ্যা' মানে 'কর্ম', আর 'বিদ্যা' মানে জ্ঞান। যারা 'অবিদ্যা' অর্থাৎ শুধু কর্ম নিয়ে থাকে তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে, আর যারা শুধু 'বিদ্যা' অর্থাৎ জ্ঞান নিয়ে থাকে তারা গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করে। যারা বুদ্ধিমান্ তারা কর্মদ্বারা মৃত্যুর হাত এড়িয়ে জ্ঞানের দ্বারা অমৃতত্ব অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ করে।

উদ্ধৃত শ্লোকটির মধ্যে আমরা অধ্যাত্মতত্ত্ব বাদ দিয়েও লৌকিক দৃষ্টিতে একটি চমৎকার উপদেশ পাই। যারা কাজ করে না, যারা অলস—তারা ভাতকাপড়ের অভাবে মারা যায়। শুধু সৌখীন জ্ঞানচর্চা দ্বারা কোন সমাজ টিকে থাকতে পারে না। অপর পক্ষে যারা একান্তভাবে কর্মে রত তারা পরিশ্রম দ্বারা ভাতকাপড়ের অভাব থেকে বাঁচে বটে; কিন্তু শুধু জীবিকার্জনের জন্য খাটুনিতে আনন্দ নাই, অমৃতত্ব নাই। যারা দৈনিক পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচর্চাও করে তারা একদিকে যেমন পেটের ভাতের যোগাড় করে, অপরদিকে তেমনি উচ্চতর আনন্দও পায়। হাতের কাজটা তাদের পক্ষে তত গুরুভার হয় না। যে কৃষক উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান কতক জানে, এবং আরো জানতে চায়, সে চাষবাসের কাজে পদে পদেই কত আনন্দের উপকরণ পায়। প্রতি বৃক্ষে, প্রতি তৃণে, প্রতি ফল ফুলে কত রহস্য তার চোখে ধরা পড়বার জন্যে যেন অপেক্ষা করে রয়েছে। দেশবিদেশের কৃষকদের কথা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা,—সব কিছুই তার নিকট জ্ঞাতব্য বিষয় ও আনন্দের খনি। পক্ষান্তরে যে এ সকলের ধার ধারে না, সে কপালে করাঘাত করে বলে "হায়! হায়! চাষা

হয়েই জীবনটা গেল।” এরূপ কারো বা তাঁতি হয়ে, কারো বা ছুঁতোর হয়ে, কারো বা কেরাণী, উকীল, মাষ্টার প্রভৃতি হয়ে জীবনটা গেল।

বস্তুতঃ জীবনটাকে এরূপ ব্যর্থ মনে করবার কোনই কারণ নাই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকার্জন মানুষকে করতেই হবে; কিন্তু জ্ঞানচর্চা (যাঁর যে বিষয়ে অভিরুচি) এই খাটুনির সঙ্গে যুক্ত থাকলে এর মধ্যেও যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। যেহেতু জ্ঞান অনন্ত, অতএব এই আনন্দের খনিও অফুরন্ত। যারা সাধারণ বিদ্যাচর্চার ধাপ ছাড়িয়ে অধ্যাত্মজ্ঞানের কোঠায় পৌঁছতে পারেন, তাঁরা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকেও পরমানন্দ এবং পরাশান্তি লাভ করেন। ভারতীয় সাধনা-ধারায় এরি উপদেশ ও প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্যাধ, কৃষক ও তন্তুবায় এদেশে শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুর আসন লাভ করেছেন।

যেদিক দিয়েই বিচার করি না কেন, জ্ঞানচর্চাকে অবহেলা করবার যো নাই। আমাদের আর্থিক, বার্তিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সর্ববিধ অবনতির মূলে অজ্ঞানতা। চাই সংশিক্ষার প্রসার, চাই প্রত্যেক নরনারীর জীবনব্যাপী জ্ঞানানুশীলন। ডাক্তারের ছুরি, কৃষকের লাঙ্গল, কামারের হাতুড়ি, কুমারের চাক, সব কিছুর পিছনে চাই সতেজ ও সক্রিয় মস্তিষ্ক—চাই সুদৃঢ় চরিত্র।

লেখা-পড়া

একটি জেলের ছেলে খুব ভাল জাল ফেলতে ও মাছ ধরতে শিখল। কিন্তু সে আফিং ধরল, কিংবা কুসঙ্গে মিশল—কাজকর্মে মনোযোগ দিল না। সে যে মাছ-ধরার কৌশল আয়ত্ত করেছিল, তা' তার নিজের, পরিবারের কিংবা সমাজের কোন কাজে লাগ্‌ল কি? মোটেই নয়। কিছুদিন পরেই তার বিদ্যায় মরচে পড়তে সুরু হল, যে কৌশল সে ষোল-আনা আয়ত্ত করেছিল, ক্রমে ক্রমে তাও আবার অনায়ত্ত হয়ে গেল। অনভ্যাসে সকল বিদ্যা, সকল কৌশলই ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক।

লেখা-পড়া জানাটাও একটা কৌশল আয়ত্ত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। লিখতে পড়তে জানলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। লেখা-পড়ার বিদ্যাকে অর্থাৎ কৌশলকে কাজে খাটাতে হবে। যে লিখতে পড়তে শিখেছে সে এমন একটা কৌশল আয়ত্ত করেছে, যা' দিয়ে সে পুঁথিপত্রে লিপিবদ্ধ জ্ঞান আহরণ করতে পারে, এবং ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে অপরের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু লেখাপড়ার কৌশল আয়ত্ত করাই যথেষ্ট নয়; সেই কৌশলকে জীবনব্যাপী কাজে খাটানোই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা। আমাদের দেশে এটারই বেশী অভাব। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল পাশ করে বি, এ, এম, এ, ডিগ্রী নিয়ে বেরোন তাদের মধ্যে ও দু'চার জন ছাড়া বড় কেউ লেখাপড়ার

চর্চা করেন না। ফলে তারা অধীত বিদ্যা ক্রমশঃ ভুলে যান, অবশিষ্ট থাকে শুধু দৈনন্দিন কাজ চালানোর বিদ্যা, এবং উপন্যাস ও সংবাদপত্র পড়ার বিদ্যা। এতে অর্থ ও পরিশ্রমের দিক্ দিয়ে সামাজিক অপচয় যে কত হচ্ছে তা বলবার নয়।

আমরা চাই এমন সমাজ যাতে লোকে লেখাপড়া শিখবে; কিন্তু কোন একটা স্কুল কিংবা কলেজের ছাপ পেয়েই একথা মনে করবে না যে 'ব্যস্, হয়ে গেল'। অক্ষর-জ্ঞানকে সারাজীবন কাজে খাটানো চাই; উহার সাহায্যে নিত্য নূতন জ্ঞান আহরণ করা চাই।

প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য অক্ষর-জ্ঞান যে অত্যাবশ্যক তা নয়। কে না জানে জগতের অনেক মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ নিরক্ষরভাবেই জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন? যাঁর সেই দৃষ্টি, সেই কৌতূহল আছে, তার নিকট চার দিকের জগৎই একটা বিরাট্ গ্রন্থ, তার অপরিসীম আগ্রহই তাকে সেই গ্রন্থপাঠে সমর্থ করে। কিন্তু তা হলেও একথা স্বীকার্য যে লিখন-পঠন সাধারণ মানুষের নিকট জ্ঞানচর্চার পথ সুগম করে দিয়েছে। যে কোন বিষয়ে কৌতূহল হোক না কেন, বই পড়ে তার অনেক কথা সহজেই জানতে পারা যায়। যুগ যুগ ধরে মানুষ যত জ্ঞানরাশি সংগ্রহ করেছে—তা পুঁথিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, আমাদের অবগতির জন্যে। পড়তে জানলে এই জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি হাতে আসে, তখন ইচ্ছামত ভাণ্ডার থেকে ধনরত্ন আহরণ করা যায়।

এ যুগের আদর্শ এই যে লিখন-পঠন প্রণালী সর্বসাধারণের আয়ত্ত হউক, বিদ্যাশিক্ষার, জ্ঞানচর্চার পথ সকলের জন্য উন্মুক্ত হউক। এই আদর্শের সার্থকতার জন্য এটাও আবশ্যক যে লিখন-পঠন প্রণালী

আয়ত্ত করে লোক সারাজীবন উহা কাজে লাগাবে,—জীবিকার্জনের ব্যাপারে উহার প্রয়োগ করবে, উহার সাহায্যে ক্রমাগত নিজের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করবে,—বুদ্ধিকে মার্জিত ও বিশুদ্ধ করবে। ষোল-আনা লোক এরূপভাবে জীবন গঠিত করবে, একথা আজ হয় ত বাস্তবতার গণ্ডীর বাইরে। বর্তমান ব্যবস্থায় আমাদের সমাজে এমন বহুসংখ্যক স্থূলবুদ্ধি, দুর্বলমস্তিক, রুগ্ন ও বিকলাঙ্গ লোক আছে যাদের পক্ষে জ্ঞানচর্চা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু যে সকল সমাজ উন্নতিশীল, তাদের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা কমাবার জন্য নানারকম চেষ্টা হচ্ছে, এবং সেই চেষ্টায় অল্পবিস্তর সফলতাও দেখা যাচ্ছে। এদের কথা বাদ দিয়েও একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে যাদের বস্তুতঃ যোগ্যতা আছে এবং যারা ইচ্ছা করলেই কিছু না কিছু সময় করে নিতে পারে তাদের মধ্যেও অন্যূন পোনর-আনা লোক জ্ঞানচর্চায় মন দেয় না। নিজের ও দেশের উন্নতি যদি আমরা সত্যি সত্যি চাই, তা হলে প্রত্যেক নরনারীর চেষ্টা করা উচিত যাতে এই জড়তা ও ঔদাসীনের অবসান ঘটে। দেশে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানবিস্তারের আদর্শকে খুব স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে তুলে ধরা চাই। আদর্শের যত কাছে এগিয়ে যেতে পারি ততই আমাদের শ্রেয়ঃ। আমাদের বুঝা উচিত যে আমরা দুর্গম পথ দেখে ভয় পেলেও অন্যান্য দেশ এবং সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি চিরকাল মূর্খ ও ভারবাহী গর্দভ হয়ে থাকতে না চাই, তবে জ্ঞানের আলো সমাজের প্রতি স্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে।

বিরাট্ বিশ্ব

মেঘমুক্ত অন্ধকার রাত্রিতে যখনি আকাশের দিকে তাকাই, তখনি আমরা দেখতে পাই যে অগণিত জ্যোতিষ্ক গগনমণ্ডল ছেয়ে আছে। গগনমণ্ডলের যেমন কুলকিনারা নাই, জ্যোতিষ্কদেরও তেমনি সীমাসংখ্যা নাই। মহানগরীর দীপালি উৎসবে যে দিকে তাকানো যায়, সেদিকেই দেখা যায় অসংখ্য বাতি মিট্ মিট্ করে জ্বলছে। অনন্ত আকাশে অগণিত জ্যোতিষ্কের দীপালি উৎসব যেন লেগেই আছে। দেখতে দেখতে আমাদের মন এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর আঙ্গিনা ছেড়ে কোথায় কোন্ কল্পলোকে চলে যায়, তার ঠিক-ঠিকানা নাই। দিনের কর্মকোলাহল, সুখদুঃখ প্রভৃতির আবর্তে আমরা নিজের জীবন ও অস্তিত্বকে গণ্ডীবদ্ধ করে ফেলি। যে সকল বস্তু আমাদের রাগ-দ্বেষের বিষয় সেগুলি আমাদের মনকে এমন একান্তভাবে অভিভূত করে যে তাদের বাইরে আর তাকাবার অবসর থাকে না। কিন্তু রাত্রিতে যখন কর্মকোলাহল মন্দীভূত হয়ে আসে, তখন শান্তচিত্তে নক্ষত্ররাজির দিকে তাকালেই বিরাট্ বিশ্ব স্বভাবতঃই আমাদের মন কেড়ে লয়। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন দিনের বেলায় আমরা পৃথিবীতে বাস করি, আর রাত্রিতে আমরা অনন্তে বাস করি।

এই জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী কী,—তাদের গতিবিধি কি রকম,-এ সকল বিষয়ে মানুষ স্মরণাতীত কাল থেকেই চিন্তা করে আসছে। তাদের

সম্পর্কে নানা রকম উদ্ভট্ কল্পনা, নানা গল্পকাহিনী সকল দেশে এবং সকল সমাজেই রচিত হয়েছে। তাতে সাধারণ লোক তুষ্ট হয়ে থাক্‌লেও যারা জ্ঞানপিপাসু তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হয়নি। তাঁরা বরাবর চেষ্টা করে আসছেন এই দুর্ভেদ্য রহস্যজাল ছিন্ন করতে। আমাদের এই ভারতবর্ষে প্রাচীনকালের মনস্বীরা খালিচোখে পর্যবেক্ষণের ফলে অনেক গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধির বিষয় জানতে পেরেছিলেন। ঋতুচক্র, রাশিচক্র,সম্বৎসর, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতি—এবং অনেক গ্রহনক্ষত্রের উদয়াস্ত তাঁরা নিখুঁতভাবে গণনা করেছিলেন। কোনরূপ জটিল যন্ত্রপাঁতির সাহায্য তাঁরা নেন নি। আমরা ভেবে আশ্চর্য হই কিরূপ অসীম ধৈর্য ও মনোযোগের সঙ্গে তাঁরা সকল বিষয় লক্ষ্য করতেন।

দূরের জিনিস আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই না, আকারে অনেক ছোট দেখি এবং ঝাপ্‌সা দেখি। দূরে কোন অভিনব কিংবা আশ্চর্য জিনিষ দেখতে পেলে, আমাদের ইচ্ছা হয় কাছে গিয়ে ভাল করে দেখি। কিন্তু গ্রহনক্ষত্রের বেলায় আমাদের কৌতূহল এ উপায়ে মিটাবার যো নাই। নক্ষত্রলোক ঘুরে আসবার কোন যানবাহন মানুষ আজও আবিষ্কার করতে পারে নি। কিন্তু তা না হলেও আমাদের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ ও দূরগামী করবার উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রায় চারশ বছর আগে ইটালীদেশের গ্যালিলিও প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন। যন্ত্রটি তেমন কিছু জটিল ছিল না; দুখানি লেন্স্ ও এক টুকরা শক্ত কাগজ কিংবা টিনের চোঙ্গা হলেই গ্যালিলিওর দূরবীণের ন্যায় দূরবীণ তৈরি করা যায়। গ্যালিলিওর দূরবীণের দূরদর্শনের ক্ষমতা খুব বেশী ছিল

না। আজকাল যে সকল দূরবীণ ব্যবহৃত হয় সেগুলি অনেক বেশী ক্ষমতাশালী। বর্তমানে আমেরিকার মাউন্ট উইলসন্ মানমন্দিরের দূরবীক্ষণ বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী। উহার মুখের লেন্সের ব্যাস ১০০ ইঞ্চি। সম্প্রতি সেদেশে ২০০ ইঞ্চি ব্যাসের আরেকটি বিরাটাকার দূরবীণ তৈরি হচ্ছে।

গ্যালিলিও যে ছোট দূরবীণ তৈরি করেছিলেন, তারই সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রের সম্পর্কে তিনি এমন সব আশ্চর্য ব্যাপার আবিষ্কার করলেন যে পুরাকালের প্রচলিত অনেক কাহিনী নিতান্ত অলীক ও অসার বলে প্রমাণিত হল। আগে লোকে ভাবত পৃথিবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে স্থির হয়ে আছে; ঊর্দ্ধে আছে সাতমহল স্বর্গ, আর চন্দ্র, সূর্য, গ্রহতারকা প্রভৃতি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরছে। পৃথিবী হল ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র, আর মানুষ হল পৃথিবীর সেরা জীব। অতএব, মানুষের সমান আর কে আছে? গ্যালিলিও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন, পৃথিবী সূর্যের একটা ক্ষুদ্র গ্রহ বৈ আর কিছুই নয়। সূর্য তাকে বন্দনা করা দূরে থাক, সে নিজেই সূর্যের চারদিকে কলুর বলদের ন্যায় ঘুরপাক খেয়ে মরছে। খৃষ্টান পাদ্রীরা তাতে খুব চটে গেলেন। "যদি পৃথিবীকে সূর্যের চেয়ে ছোট ও নিকৃষ্ট বলে গণ্য করতে হয়, তা হলে ত মানুষ এবং খৃষ্টান ধর্ম নিতান্ত নগণ্য হয়ে পড়ে! অতএব গ্যালিলিওকে নানাভাবে বুঝানো হল যাতে তিনি তাঁর মত পরিত্যাগ করেন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিশ্চল কেন্দ্ররূপে পৃথিবীকে তার পুরাণো জায়গায় আবার বসিয়ে দেন। সাতজন জাঁদরেল পাদ্রী বিচারক মিলে তাঁকে জেলে

পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন এবং হুকুম করলেন তিনি যেন তিন বৎসর পর্যন্ত 'অনুতাপ-সপ্তক' স্তোত্র প্রতিসপ্তাহে অন্ততঃ একবার পাঠ করে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন।" (এইচ, জি, ওয়েল্‌স) যাঁরা সত্যের পূজারী, যুগে যুগেই তাঁদের এরূপভাবে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু উদ্যত রাজদণ্ড অথবা মৃত্যুভয় কিছুই তাঁদের দমিয়ে রাখতে পারে নি।

অধুনা গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে আমরা বিশ্বের যে পরিচয় পাই তা কতকটা এরূপ। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি-ওটা একটা গ্রহ। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস্, নেপচুন ও প্লুটো নামে আর ও আটটি গ্রহ আছে। তা ছাড়া মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে আছে এক ঝাঁক ক্ষুদ্রকায় গোলক—এদের নাম এষ্টিরয়েড্ (asteroids); মনে হয় যেন কোন গ্রহ চূর্ণীকৃত হয়ে এষ্টিরয়েডের ঝাঁক সৃষ্টি করেছে; কিংবা হয়ত এই উল্কাপিণ্ডরাশি মহাকর্ষের ঘূর্ণীপাকে এমন ভাবে আটকা পড়ে গিয়েছিল যে আর একত্র হয়ে গ্রহে পরিণত হবার সুযোগ কখনো পায় নি। গ্রহগুলি সবাই মিলে সূর্যের চারদিকে অনবরত ঘুরছে। সমস্ত কক্ষপথ ঘুরে আসতে আমাদের পৃথিবীর যেটুকু সময় লাগে তাকে আমরা বলি 'বৎসর'।

পৃথিবী বর্তুলাকার। উহা নিজ মেরুদণ্ডের উপর লাটিমের মত ঘুরপাক খেতে খেতে সূর্যের চারদিকে যাচ্ছে; আর তারই ফলে হচ্ছে আমাদের দিনরাত্রি। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে বটে; কিন্তু সেই ভ্রমণপথটি ঠিক গোলাকার নয়, কতকটা ডিম্বাকার। আর পৃথিবীর মেরুদণ্ডও কক্ষতলের উপর ঠিক লম্বভাবে দাঁড়িয়ে নেই,

একদিকে কাঁৎ হয়ে আছে। এই কাঁৎ অবস্থায় থেকেই অনবরত ঘুর-পাক খেতে খেতে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এই সকল কারণে বারোমাস পৃথিবীর গায়ে ঠিক সমানভাবে সূর্যাতপ পড়ে না। তাই ধরাপৃষ্ঠে আমরা দেখতে পাই ষড়্ ঋতুর বিচিত্র খেলা।

চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ; অর্থাৎ পৃথিবী যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে,চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীর চারদিকে অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যান্য গ্রহদের মধ্যেও কারো কারো উপগ্রহ আছে এবং একাধিক সংখ্যায়ও আছে; মঙ্গলের দুটি, বৃহস্পতি ও শনি প্রত্যেকের নয়টি, ইউরেনাসের চারটি এবং নেপচুনের একটি। সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের কথা ভাবলে মনে হয় যেন কোন যাদুকর কতকগুলি ভীম গোলক মন্ত্র পড়ে মহাশূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছে, আর সেগুলি একটি নির্দিষ্ট নিয়মে অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে; একমুহূর্তের জন্যও তাদের বিরাম নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে—কি নিয়মে তারা ঘুরছে, মানুষ তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে গুণে বার করেছে।

আমাদের এই সৌরজগতে গ্রহ উপগ্রহ ছাড়াও রয়েছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জড়কণা (যা থেকে উল্কার জন্ম হয়) এবং ছোটবড় কতকগুলি ধূমকেতু। হ্যালির ধূমকেতুর নাম লোকসমাজে সমধিক পরিচিত। প্রতি ৭৫ বৎসর অন্তর উহা একবার মানুষের দৃষ্টিপথে উদিত হয়। বিগত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে উহা দেখা দিয়েছিল; ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে আবার দেখা দিবে। গগন-মণ্ডল-ব্যাপী এর বিরাট পুচ্ছ ও উজ্জ্বল জ্যোতি মানুষকে যুগপৎ ভীত ও বিস্মিত করে।

এবারে সৌরজগৎ ছেড়ে নক্ষত্রলোকের একটু আভাস দেওয়া যাক। কিন্তু তা করতে গেলে এরূপ দূরদূরান্তরের কথা বলতে হবে যে, মাইল ক্রোশের মাপে তার কূল কিনারা পাওয়া যায় না। আমাদের সব চেয়ে নিকটে যে নক্ষত্র তার দূরত্ব মাইলের হিসাবে লিখতে গেলে একটা মস্ত বড় অঙ্ক হবে। অতএব নক্ষত্রলোকের দূরত্ব মাপবার জন্যে চাই সেরূপ প্রকাণ্ড মাপকাঠি। জ্যোতির্বিদেরা যে মাপকাঠি একাজে ব্যবহার করেন তার নাম আলোক-বৎসর। আলোকরশ্মির গতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এই বেগে অবিরাম চলে একটি আলোক রশ্মি এক বৎসর সময়ে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করবে তাকে বলা হয় এক আলোক-বৎসর। তা হলে এর পরিমাণ দাঁড়াল ১,৮৬,০০০ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ মাইল। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব মোটামুটি ৯·৩ কোটি মাইল। সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসতে ৮ মিনিটের চেয়ে একটু বেশী সময় লাগে। কিন্তু আমাদের সৌরজগতের নিকটতম যে নক্ষত্র তার আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে প্রায় ৪ বৎসর সময় লাগে। জ্যোতিষের ভাষায় সূর্য পৃথিবী হতে ৮ আলোক-মিনিট দূরে; আর নিকটতম নক্ষত্র (Alpha Centauri)৪$\frac{১}{৩}$ আলোক-বৎসর দূরে। ধ্রুবনক্ষত্রকে আমরা সকলেই চিনি। উহার আলো পৃথিবীতে আসতে ৪৬·৬ বৎসর সময় লাগে। কোন জিনিষ থেকে আলো এসে আমাদের চোখে লাগলে তবে আমরা সে জিনিসটাকে দেখি। আজ রাত্রিতে ধ্রুবনক্ষত্রের যে রশ্মিগুলি এসে আমাদের চোখের উপর পড়ছে এবং যার ফলে আমরা ধ্রুবনক্ষত্রকে দেখছি সেগুলি ৪৬·৬ বছর আগে ধ্রুবলোক ছেড়ে রওনা

হয়েছিল। আমরা যা দেখছি—তা ধ্রুবনক্ষত্রের ঠিক বর্ত্তমান চেহারা নয়,—৪৬৬ বছর আগেকার। আজ পর্যন্ত মাত্র আটটি নক্ষত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যাদের দূরত্ব আমাদের সূর্য থেকে ১০ আলোক বৎসরের কম। বাকী সব নক্ষত্রই আরো অনেক দূরে অবস্থিত।

গ্রহনক্ষত্রের দূরত্ব মাপবার, তাদের তাপ, ভর, উপাদান ও গতিবেগ প্রভৃতি নিখুঁতভাবে নির্ণয় করবার উপায় মানুষ বের করেছে। 'স্পেক্ট্রোস্কোপ' নামক আলোক বিশ্লেষণের যন্ত্র আছে। তার সাহায্যে যে কোন জ্যোতিষ্কের আলোক বিশ্লেষণ করে বলে দেওয়া যায় উহা কি কি উপাদানে গঠিত। যেমন যে কোন দুজন লোকের চেহারা কিংবা টিপসই হুবহু একরকম হয় না, তেমনি মৌলিক পদার্থগুলি যখন উত্তাপে উজ্জ্বল হয়ে উঠে তখন তাদের আলোকের যে বর্ণচ্ছটা স্পেক্ট্রোস্কোপ যন্ত্রে বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় সেগুলি কখনই পরস্পরের সঙ্গে মেলে না। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের একটা বিশিষ্ট বর্ণালী আছে, যেটা তার একেবারে নিজস্ব। অতএব যে কোন জ্যোতিষ্কের বর্ণালী থেকে আমরা বুঝতে পারি জ্যোতিষ্কটি কি কি উপাদানে গঠিত। এইরূপে নক্ষত্রের তাপ, আয়তন, ভর, গতিবেগ প্রভৃতি মাপবার জন্য বিভিন্ন কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের কথা বলতে গেলে বিষয় দুরূহ হয়ে পড়বে।

নক্ষত্রের দূরত্বের কথা হচ্ছিল। সে কথাতেই ফিরে আসছি। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রিতে যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তবে 'ছায়াপথ' দেখতে পাওয়া যায়। ছায়াপথ আর কিছুই নয়, অসংখ্য তারকার সমষ্টি। নক্ষত্রগুলির পরস্পরের দূরত্ব যদিচ কম নয়,

তবুও তারা এই পৃথিবী থেকে এতদূরে অবস্থিত যে আমাদের দৃষ্টিতে একাকার হয়ে যায়। মনে করা যাক একটা প্রকাণ্ড মাঠের একপ্রান্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, মাঠের অপরপ্রান্তে আছে যেন একটা মস্ত বড় গাছ ও তার এক মাইল পিছনে একটা বাড়ী। এখন এই বাড়ীটা আমাদের মনে হবে যেন গাছের গা ঘেঁসে রয়েছে। ছায়াপথের অসংখ্য নক্ষত্ররাজি তেমনি ভাবে আমাদের দৃষ্টিতে একাকার হয়ে যায়। তা ছাড়া ছায়াপথের মধ্যে কতকগুলি নক্ষত্র আছে যাদের বলা হয় নীহারিকা। এগুলি যেন কোটি যোজনব্যাপী উজ্জ্বল পাতলা মেঘের খণ্ড, এখনো তাল পাকিয়ে ঠিক পিণ্ডাকার হয় নি। এরূপ অসংখ্য তারকা ও নীহারিকা মিলে ছায়াপথের গঠন। রাত্রিতে ছায়াপথের সমগ্র চক্রের শুধু অর্ধেক আমরা দেখি, বাকী অর্ধেক ভূগোলকের অপর দিকে থাকে বলে দেখতে পাইনে। সমগ্র ছায়াপথের আকৃতি গোলাকার ; কিন্তু বুদ্বুদ কিংবা বর্তুলের মত নয়। কতকটা চেপ্টা ধরণের।

যে ছায়াপথ আমরা খালি চোখে দেখতে পাই, তারি ভিতরে অবস্থিত আমাদের এই সৌরজগৎ। এই ছায়াপথের ব্যাসের পরিমাণ আড়াই-লক্ষ আলোক-বৎসর। এই বিশাল ব্যাপকতা অঙ্ক কষে বার করলে এবং কাগজে লিখলেও আমরা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি না। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এই ছায়াপথের বিরাট চক্রের বাইরেও অন্ততঃ কুড়ি লক্ষ নীহারিকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজলে দেখা যায় প্রত্যেকটিতেই তারকারাজি রয়েছে। অনুমিত হয় প্রত্যেকটি যেন এক একটি

ছায়াপথ। তা হলে বিশ লক্ষের অধিক ছায়াপথ আমরা প্রত্যক্ষই দেখতে পাচ্ছি। এই বিরাট্ বিশ্বের কথা ভাবলে আমাদের এই পৃথিবীকে মনে হয় যেন ধূলিকণার চেয়েও নগণ্য। তাই কবি লিখেছেন—

"হে পৃথিবী! এ বিশ্বে ত রেণু তুমি!
তবে আমি কোথা? কল্পনে, ভারতি,
স্মৃতি,—করি আমি কার অহঙ্কার?"

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট্ আয়তনই শুধু আমাদিগকে অভিভূত করে না। গ্রহনক্ষত্রের ভিতরে আবার জন্মমৃত্যুর খেলাও আছে। কোনটা ঠাণ্ডা হয়ে নিবে গিয়েছে, কোনটা নূতন সংঘর্ষে দপ করে জ্বলে উঠছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে পরিচয় আমরা জ্যোতিষশাস্ত্রের নিকট পাই, তাতে আমাদের মাথা ঘুরে যায়। বিরাট্ বিশ্বের এক নিরালা কোণে আমাদের সূর্য তার কটি কাচ্চা-বাচ্চা (অর্থাৎ গ্রহ উপগ্রহ) নিয়ে অতি সামান্য একটুখানি জায়গা দখল করে আছে। কখন কোন্ নক্ষত্র এসে তাকে ধাক্কা মেরে চুরমার করে দেয় তার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। মনে করা যাক প্রবল ঘূর্ণীবাত্যা একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে; সেই গাছের ডালে পাতার বাসায় যেন অনেকগুলি পিঁপড়ে রয়েছে। ডালটিকে যখন ঝড়ের হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের কি অবস্থা? ভাবতে গেলে আমাদের অবস্থাও তাই কিংবা তার চেয়ে আরো সহস্রগুণে শোচনীয়। মহাশূন্যে এই পৃথিবী ছুটে চলেছে, আমরা তার বুকে পিঠে ঝুলে আছি। ঝড়ের হাওয়া যেমন

আপন বেগে ছুটতে থাকে, পিঁপড়ার সুখদুঃখ আপদবিপদের কথা ভাবে না ; তেমনি এই বিরাট বিশ্বযন্ত্র তার আপন নিয়মে কাজ করে যাচ্ছে,—আমাদের এই মানবসমাজের সুখদুঃখ কল্যাণ-অকল্যাণ জীবন মৃত্যুর প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন। কী নিদারুণ অবজ্ঞা! আমরা দুশো কোটি নরনারী, যাদের মধ্যে কত মহাপুরুষ, কত বীর, কত সাহিত্যিক, কত বৈজ্ঞানিক, কত রাজনৈতিক প্রভৃতি জন্মেছেন—বিশেষতঃ যাদের মধ্যে "আমি" রয়েছি—তাদের যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিধান গণনার মধ্যেই আনে না। অধিকন্তু মহাকাল সকলকেই গ্রাস করছেন। শিশু ক্রমে কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ হয়ে কালের কবলিত হচ্ছে। শুধু জীবজন্তু ও গাছপালারই এই পরিণতি নয়, জড় পদার্থেরও একই গন্তব্য পথ। ঘরবাড়ী, চেয়ার টেবিল প্রভৃতি সব কিছুই পুরাতন ও জরাজীর্ণ হচ্ছে,—অর্থাৎ মৃত্যুর বিবরে প্রবেশ করছে। মহাকাল যেন সব কিছু গ্রাস করবার জন্যে প্রকাণ্ড হা মেলে আছেন ; আর সমস্ত জড় ও প্রাণিজগতের সঙ্গে আমরাও তার ভিতরে ছুটে প্রবেশ করছি। মহাকালের এই ভয়ংকর সর্বগ্রাসী রূপ দেখেই গৌতমের মন বিষাদে পূর্ণ হয়েছিল—নিবিড় নিশীথে তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন তার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্বরূপের কোনই তফাৎ নাই। বিশ্বের স্বরূপ দেখে অর্জুনের ন্যায় বীরপুরুষ ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়তে পড়তে আমরা ভয়ে আঁৎকে উঠি, আমাদের সমস্ত কর্মপ্রবৃত্তি তিরোহিত হবার উপক্রম হয়। কিন্তু মানুষের বিচারবুদ্ধি এই 'না'

তে পর্যবসিত হয় নি। আমাদের সমস্ত সত্ত্বা আমাদের ক্ষুদ্রতাকে, নগণ্যতাকে এবং মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চায়। ধর্ম এবং দর্শন এতকাল এই 'না'র বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। অধুনা বিজ্ঞানও নিছক জড়বাদ প্রায় বর্জন করেছে—তার কথা পরে হবে। আপাতত আমরা ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট রূপের কথা ধ্যান করে যেন নিজেদের অহমিকাকে খর্ব করি—ঐহিক রাগদ্বেষ, মারামারি, কাটাকাটি প্রভৃতির অসারতা উপলব্ধি করি।

পৃথিবীর জন্ম ও বয়স

পৃথিবীর জন্ম কবে হল, কি করে হল, পুরাকালে পৃথিবী কি রকম ছিল—এ সব কথা জানবার কৌতূহল আমাদের খুবই হয়। সূর্য থেকে সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহের জন্ম হয়েছে,—এ বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু ঠিক কি প্রণালীতে এই সৃষ্টি ব্যাপার ঘটেছিল তার সম্পর্কে সকল বৈজ্ঞানিক একমত ন'ন। বর্তমানে যে মত সব চেয়ে বেশী আদৃত শুধু তার কথাই এখানে বলা হবে।

নক্ষত্রগুলি আকারে সুবৃহৎ এবং সংখ্যায় অগণিত হলেও খুব দূরে দূরে অবস্থিত। আমাদের সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তেরো লক্ষ গুণ বড়। আবার এমন নক্ষত্র আছে যেগুলি আমাদের সূর্যের তুলনায় বহুগুণ বড়। কিন্তু তাদের পরস্পরের দূরত্বও তেমনি বিশাল। নতুবা গগনমণ্ডলের অগণিত নক্ষত্রের মধ্যে ঠেলাধাক্কা এবং ঠোকাঠুকি হত নিত্যঘটনা। কোন বিশাল প্রান্তরে যদি মাত্র দুচার জন লোক ঘুরে বেড়ায় তবে দৈবাৎ ভিন্ন তাদের পরস্পরের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা নাই। নক্ষত্ররাজ্যে এরকমই অবস্থা। নক্ষত্ররাজি অসংখ্য হলেও গগনমণ্ডলের বিস্তার এমনি অসীম যে দুটি নক্ষত্র পরস্পরের কাছাকাছি ঘেঁসবার সম্ভাবনা খুবই অল্প। কিন্তু অল্প হলেও একেবারে নাই নয়। এরূপ একটি ঘটনা থেকেই আমাদের সৌরজগতের উৎপত্তি।

অন্যূন ২০০ কোটি বছর পূর্বে এরূপ ঘটে থাকবে যে আমাদের সূর্যের চেয়ে ভারী কোন নক্ষত্র সূর্যের খুব নিকটে এসে পড়েছিল, কিংবা হয়ত একেবারে গা ঘেঁসে গিয়েছিল। সূর্য হল একটি জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। কঠিন পদার্থের কণাগুলির মধ্যে বাঁধন যেমন শক্ত, তরল পদার্থ কিংবা গ্যাসের কণাসমূহের মধ্যে বাঁধন তেমন শক্ত নয়। এজন্য মহাকর্ষের টানে তরল পদার্থ এবং গ্যাস অধিকতর চঞ্চল হয়ে উঠে। ভূপৃষ্ঠে আমরা দেখতে পাই চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্রের জল উথলে উঠে। আরেকটি ভারী নক্ষত্র সূর্যের কাছে আসবার ফলে সূর্যের অবয়বে এল প্রবল জোয়ার। সেই জোয়ারের টানে সূর্যের দেহপিণ্ডের একরাশ গ্যাস একটি লম্বা বাহুর আকারে আগন্তুক নক্ষত্রের দিকে প্রসারিত হল। আগন্তুক নক্ষত্র খানিক দূরে সরে যাবার পর ঐ বর্ধিত বাহুর কিয়দংশ সূর্যে ফিরে এল, কিন্তু বেশীর ভাগ একটি লম্বা উজ্জ্বল মেঘের আকারে সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। একদিকে আগন্তুক নক্ষত্র, অপর দিকে সূর্য—এই দুয়ের টানাটানিতে পড়ে এই বিচ্ছিন্ন গ্যাসের মেঘে উৎপন্ন হল ঘূর্ণন ও গতিবেগ। গ্যাস ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে যতই ঘনীভূত হল, গ্যাসের মেঘ আর আস্ত থাকতে পারল না,—বলবিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী খণ্ড খণ্ড হয়ে উহা পরিণত হল বিভিন্ন গ্রহপিণ্ডে। তা ছাড়া এই বিভাজনের সময়ে অনেক ছোট ছোট অংশ চূর্ণীকৃত হয়ে ধূলিকণার আকারে ছড়িয়ে পড়ল সারা সৌরজগৎময়। অপর কতক অংশ আবার খণ্ডমেঘের আকারে বিক্ষিপ্ত হল ইতস্ততঃ। এগুলো থেকেই উল্কা এবং ধূমকেতুর উৎপত্তি।

গ্রহগুলির যখন জন্ম হল তখনো আগন্তুক নক্ষত্র খুব দূরে সরে যায় নি—উহার আকর্ষণ তখনো গ্রহপিণ্ডগুলির উপর চলছে। সেই আকর্ষণের এবং সূর্যের ও নিজেদের পরস্পরের আকর্ষণের ফলে গ্রহগুলির জীবনপ্রভাতের কক্ষপথগুলি হয়েছিল বড়ই আঁকাবাঁকা। আগন্তুক নক্ষত্র যখন এত অধিক দূরে সরে গেল যে উহার আকর্ষণ আর কার্যকরী রইল না, তখন থেকেই গ্রহগুলি হল সম্পূর্ণরূপে সূর্যের অধীন। যদি সৌরজগৎ একেবারে শূন্যস্থান হত তবে গণিতিক নিয়মে গ্রহগুলির কক্ষপথ হত সম্পূর্ণ উপবৃত্তাকার। কিন্তু একটু আগেই বলা হয়েছে যে সূর্যের ভাঙনের ফলে সৌরজগৎময় ছড়িয়ে পড়েছিল জড়কণা। গ্রহগুলিকে প্রথমত এই ধূলিসমুদ্রের ভিতর দিয়ে ঠেলে চলতে হয়েছিল; এই বাধার ফলেই গ্রহদের কক্ষপথ ক্রমশঃ অনেকটা গোলাকার ধারণ করেছে।

সৌরজগতের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জড়কণারাশির অনেকাংশ যুগযুগান্ত ধরে সূর্য ও গ্রহ-উপগ্রহের দিকে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হয়ে তাদের দেহে মিশে গিয়েছে। কিন্তু ইট-পাটকেলের ন্যায় বড় বড় টুকরোর আকারের জড়পদার্থ এখনো সৌরমণ্ডলের ইতস্ততঃ বহুল পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। যখন এগুলোর ঝাঁকের ভিতর দিয়ে পৃথিবী চলতে থাকে তখনি আমরা দেখতে পাই উল্কাবৃষ্টি। উল্কাপিণ্ড এরূপ প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে যে বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের উত্তাপে সেগুলি দপ্ করে জ্বলে উঠে এবং পরমুহূর্তেই গ্যাস হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়। চলিত কথায় একেই বলা হয় 'নক্ষত্র পতন'। যে সকল উল্কাপিণ্ড বেশী ভারী, সেগুলি পুরাপুরি বাতাসে

মিলিয়ে যায় না, মাটি পর্যন্ত এসে পোঁছে। অসংখ্য উল্কাপিণ্ড অনবরত সূর্যের উপরে গিয়ে পড়ছে এবং নূতন ইন্ধন জুগিয়ে কিয়ৎপরিমাণে উহার ক্ষয় পূরণ করছে। প্রতি সেকেণ্ডে সূর্যের অগ্নিকুণ্ডে যে পরিমাণ উল্কার আহুতি হচ্ছে তার মোট ওজন পঞ্চাশ হাজার মণেরও বেশী হতে পারে বলে হিসাব করা হয়েছে।

যদি সূর্য থেকে সকল গ্রহের জন্ম হয়ে থাকে তবে এটাও স্বীকার যে সূর্য যে যে উপাদানে গঠিত, আমাদের পৃথিবীও নিশ্চয়ই সেই সেই উপাদানে গঠিত। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত ৯২টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে ৩০।৪০টি সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়; বাকীগুলি দুষ্প্রাপ্য এবং পরিমাণে নগণ্য। আগেই বলা হয়েছে যে স্পেক্‌ট্রোস্কোপের সাহায্যে বর্ণালী পরীক্ষা করে যে কোন জ্যোতিষ্কের উপাদান নির্ণয় করা যায়। সূর্যের আলো এভাবে পরীক্ষা করে পার্থিব মৌলিক উপাদান সমূহের মধ্যে প্রায় সবগুলিরই অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই অনুসন্ধানের কাজে কতক দুরূহ সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন আমাদের বাঙালী বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা।

আপনার দেহকে ক্ষয় করেই সবিতা এই সৌরজগতের সমস্ত গ্রহউপগ্রহকে জন্ম দিয়েছেন। এই সৃষ্টিকার্যে তিনি যে নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করে ফেলেছিলেন তা নয়। সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের ভর মিলে সূর্যের ভরের $\frac{১}{৭৫০}$ ভাগ মাত্র। গ্রহ-উপগ্রহকে জন্ম দিয়েই সূর্যের কায শেষ হয়ে যায় নি; অনবরত তাপ বিকিরণ করে, অর্থাৎ নিজ দেহকে ক্ষয় করে সবিতা এগুলোকে আলো ও তাপ

জোগাচ্ছেন। সূর্যের তাপ ছাড়া এই পৃথিবীতে জীবের বাস সম্ভবপর হত না। অতএব সবিতাই সৌরজগতের প্রাণ। আত্মবলির দ্বারাই সবিতা সৌরজগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং সৌরজগৎবাসী প্রাণিমণ্ডলের পোষণ করে আসছেন।

পৃথিবী যখন গ্রহরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে তখন উহা ছিল একটি জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। ক্রমশঃ উত্তাপ একটু কমে গিয়ে উহা হল ফুটন্ত তরল পদার্থ—উপরিভাগ তখনো উত্তপ্ত গ্যাসে ঢাকা। ধীরে ধীরে আরো ঠাণ্ডা হবার ফলে তরল পদার্থের উপরে একটা সরের ন্যায় আবরণ পড়ল, এবং লৌহ প্রভৃতি ভারী জিনিষের কণাগুলি তলিয়ে গিয়ে কেন্দ্রস্থলে শাঁসের মত জমা হতে লাগ্‌ল। ভারী উপাদানগুলি তলিয়ে যাবার ফলে তরল পদার্থ যেমন একটু পাতলা হল অমনি উপরের দানাবাঁধা সর টুকরো টুকরো হয়ে নীচে ডুবে গেল। অতএব কতক উত্তপ্ত দ্রবপদার্থ নীচে থেকে উপরে এসে হাজির হল এবং ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আবার একটা সর পড়ল। বারম্বার এরূপ হবার ফলে পৃথিবীর বহির্ভাগ একটা পুরু এবং কঠিন আবরণে আবৃত হল। ভিতরটায় কিন্তু উত্তপ্ত তরল পদার্থ ই রয়ে গেল এবং এখনো আছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ এরূপ কঠিন ত্বকে পরিণত হ'তে অবশ্যি অনেক হাজার বছর লেগেছিল; কিন্তু গ্রহনক্ষত্রের আয়ুষ্কালের তুলনায় কয়েক হাজার বছর ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

স্থলভাগের সৃষ্টি এভাবেই হয়েছিল, একথা আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে সহজেই মেনে নিতে পারি। কিন্তু জলভাগ ও বায়ুমণ্ডলের উৎপত্তি কি করে হ'ল? ভূপৃষ্ঠের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এখন জলময় এবং পৃথিবীর

চারদিকে পঞ্চাশ মাইল কিংবা আরো বেশী দূর পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল অবস্থিত। গোড়াতে পৃথিবীর উপরিভাগ এত উত্তপ্ত ছিল যে গ্যাস ও জলীয় বাষ্প সেখানে আটকা পড়া সম্ভবপর ছিল না। ভূপৃষ্ঠের সমস্ত বাষ্প এবং গ্যাস উত্তাপে এত হালকা ও গতিশীল ছিল যে তাদের পক্ষে পৃথিবীর আকর্ষণ উপেক্ষা করে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাওয়া ছিল খুবই সহজ। বায়ুর দুটি উপাদান যথা নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড তখন পৃথিবীর বহির্ভাগে ছিল না; পৃথিবীর ভিতরে আটকা ছিল। জলও নিশ্চয়ই বাষ্পাকারে ছিল না। একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে গুরুভার চাপের অধীনে গলিতপাষাণ এবং জলীয়বাষ্প পরস্পরের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়ে আলকাতরা কিংবা চিটাগুড়ের ন্যায় একটা ঘন তরল পদার্থের সৃষ্টি করে। অতএব পৃথিবীর অতি শৈশবাবস্থায় সমস্ত মহাসমুদ্রের জল এবং বায়ুমণ্ডলের সমস্ত জলীয় বাষ্প পৃথিবীর পিণ্ডের ভিতরেই ছিল,—তাদের পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। পিণ্ড ক্রমশঃ শীতল হবার ফলে যখন গলিত পাষাণ ও ধাতুদ্রব্য কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হল, তখন পাষাণের বন্ধন থেকে জল ছাড়া পেয়ে উত্তপ্ত বাষ্পের আকারে পৃথিবীর বহির্ভাগে ছড়িয়ে পড়ল। পৃথিবী যখন আরেকটু ঠাণ্ডা হল, তখন সেই বাষ্প গরম বৃষ্টিজলের আকারে ভূপৃষ্ঠে গলে পড়ল। আবার তা গরম বাষ্প হয়ে উপরে উঠল এবং তার পর পুনরায় বৃষ্টি হয়ে ধরাতলে নামল। এরূপ বারংবার উত্থান-পতনের ফলে জল ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হতে লাগল। কালক্রমে সমস্ত মহাসাগর শীতল বারিতে পরিপূর্ণ হল।

পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় প্রবল ভূমিকম্প ছিল নিত্যঘটনা। পৃথিবী-

যতই শীতল হয়, তার উপরের কঠিন আবরণ ততই পুরু এবং ভারী হতে থাকে। ভিতরের উত্তপ্ত দ্রব পদার্থ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হচ্ছে, এবং তার ফলে আয়তন সঙ্কুচিত হচ্ছে। সুতরাং মাঝে মাঝে এরূপ অবশ্যি ঘটে যে ভিতরের তরল পদার্থ ও বাইরের কঠিন আবরণ—এ দুয়ের মাঝখানে একটা শূন্যস্থান অথবা ফাঁকের সৃষ্টি হয়। তখন কোন কোন জায়গার মাটি নীচের দিকে বসে যায়, পার্শ্ববর্তী স্থান উঁচু হয়ে উঠে, এবং সেই সঙ্গে কখনো মৃদু, কখনো প্রবল ভূমিকম্প ঘটে। এ রকম করেই পাহাড়ের জন্ম হয়। পৃথিবীর আদি যুগে এ সকল ব্যাপার ব্যাপকভাবে এবং বারংবার ঘটেছিল। এখনো মাঝে মাঝে ঘটে ; তত ঘন ঘন নয়, কিংবা তত প্রবলভাবেও নয়।

প্রথম যে সকল পর্বতমালা সৃষ্ট হয়েছিল সেগুলি ছিল প্রধানতঃ গলিত পাষাণ ও ধাতুর তৈরি। বড় বড় পর্বতশ্রেণী উৎক্ষিপ্ত হবার ফলে পার্শ্ববর্তী যে সকল স্থান বসে গিয়েছিল সেগুলি হয়েছিল সাগর বা মহাসাগর। মহাসাগরের মোট আয়তন এখনকার চেয়ে তখন ঢের বেশী ছিল। ভূপৃষ্ঠে তখন সমভূমি ছিল না। কতকস্থান ছিল শিলাময় উত্তপ্ত পর্বত, অবশিষ্ট স্থান ছিল উষ্ণবারিপূর্ণ মহাসমুদ্র। কোথাও জীবজন্তু কিংবা গাছপালার চিহ্নমাত্র ছিল না। বায়ুমণ্ডল সর্বদা গরম বাষ্পের ঘন কুয়াসায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত।

পৃথিবীর আদি পর্বতমালার চিহ্ন এখনো স্থানে স্থানে রয়েছে। আমরা সর্বদাই দেখতে পাই যে প্রবল বারিবর্ষণের ফলে পাহাড় ভেঙে বালি ও কাদায় পরিণত হচ্ছে এবং নদীর স্রোত সেগুলোকে সমুদ্রে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আদি যুগে

পর্বতশ্রেণীসমূহ এইরূপ ক্রমশঃ ক্ষয় হয়ে গিয়ে সমুদ্রের তল ভরাট করে তুলেছিল। ভূমিকম্প মাঝে মাঝে সেগুলিকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে কোথাও সৃষ্টি করল সমভূমি কিংবা মালভূমি, কোথাও বা পর্বত। আজকাল পৃথিবীতে যে সকল উচ্চ পর্বতমালা রয়েছে তার অধিকাংশই এইরূপ সমুদ্রের তলানি (পলল) থেকে উৎপন্ন 'পাললিক' শিলায় গঠিত। অল্পসংখ্যক পর্বতই আছে যেগুলি গলিত ধাতুতে গঠিত, অর্থাৎ আগ্নেয়গিরির দ্বারা সৃষ্ট। এই যে স্থলভাগ সৃষ্টির পর্ব, তা আজও শেষ হয় নি। গঙ্গা, মেঘনা, নীল, মিশিশিপি প্রভৃতি বড় বড় নদীর মোহানায় এখনো সেই সৃষ্টিব্যাপার পুরাদমে চলছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয় আরেকটু বিশদ ভাবে বলা হবে।

পৃথিবীর বয়স কত? নানা প্রণালীতে উহা গুণবার চেষ্টা করা হয়েছে। গাণিতিকেরা হিসাব করেছেন গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথ বিচার করে। গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথগুলি চিরকাল ধরে যে একই রকম ভাবে আছে তা নয়। প্রত্যেক গ্রহ এবং উপগ্রহের কক্ষপথের আকৃতি অল্পে অল্পে পরিবর্তিত হচ্ছে। এ সকল পরিবর্তন কি হারে এবং কি প্রণালীতে হয় তা অঙ্ক কষে বার করা যায়। কক্ষপথগুলি বর্তমান আকারে পৌঁছতে কত সময় লেগেছে, গাণিতিকেরা তা হিসাব করেছেন। এই গণনায় সৌরজগতের বয়স সম্পর্কে ৪০০ কোটি থেকে ১০০০ কোটি বছর পর্যন্ত বিভিন্ন অঙ্ক পাওয়া গিয়েছে। যারা ভূতত্ত্ববিদ্ তাঁরা গুণেছেন পৃথিবীর স্তর হিসাব করে। ভূপৃষ্ঠ স্তরে স্তরে সজ্জিত। প্রত্যেক স্তর কি করে গঠিত হয়েছে এবং এই গঠনকার্যে কত সময় লেগেছে ভূতাত্ত্বিকেরা তা অসীম ধৈর্যসহকারে নির্ধারণ

করেছেন। এই বিচারে দেখা গিয়েছে যে পৃথিবীর পৃষ্ঠশৈল অথবা কঠিন আবরণের বয়স অন্যূন দুকোটি বছর। ভূগোলক কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হবার আগে কত সময় কেটেছে তার হিসাব ভূবিদ্যার সাহায্যে করা যায় না। বলা বাহুল্য, এ সকল বিচারে দুচার লক্ষ বছরের পার্থক্য ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় না। একটা মুস্কিল এই যে এখানকার মাস বৎসরের মানদণ্ড পৃথিবীর আদি যুগের ঘটনাবলীর পক্ষে প্রযোজ্য নয়। তখন পৃথিবীর গতিবেগ ছিল অনেক বেশী, উত্তাপ ছিল প্রচণ্ড। এখনকার অবস্থায় যে সকল রাসায়নিক, জৈবিক ও নৈসর্গিক পরিবর্তন ঘটতে এক হাজার বছর সময় লাগে পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় সেগুলি হয় ত একশ বছরেই সম্পন্ন হয়েছে। পণ্ডিতদের মধ্যে এ সকল বিষয় নিয়ে মতভেদ ও তর্কাতর্কি অনেক। কিন্তু আধুনিক যুগে এক মজার ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে যা পৃথিবীর বয়স প্রায় সঠিকভাবে বলে দিচ্ছে।

রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম নামক কয়েকটি ধাতু পৃথিবীর বয়স নির্ধারণে আমাদিগকে সাহায্য করে। এগুলিকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় (Radio—active)। এদের পরমাণু আপনা হতেই ভেঙ্গে পড়ে এবং এক ধাতু অন্যবিধ মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়। এই ভাঙনের এবং রূপান্তরের কাজ একটা নির্দিষ্ট গতিতে চলে। উত্তাপের তারতম্য কিংবা অপর কোন কারণেই এই ক্রিয়ার তিলমাত্র হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। একটানা ভাবে এবং ঠিক সমান তালে এই কাজ চলছে। ইউরেনিয়ম রূপান্তরিত হয়ে পরিণত হয় রেডিয়ামে। রেডিয়াম ভেঙ্গে হয় হিলিয়াম ও র্যাডন। র্যাডন আবার কতগুলি পরিবর্তনের ভিতর

দিয়ে সর্বশেষে হয় সীসক বা সীসা। এই সমস্ত পরিবর্তনই তেজস্ক্রিয়ার ফলে একটা নির্দিষ্ট এবং অতিমন্থর গতিতে ঘটে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে একটা টুক্‌রা ইউরেনিয়াম অর্ধেক সীসায় পরিণত হতে ৫০০ কোটি বৎসর সময় লাগে। প্রাচীনতম শৈলমালায় যে সকল ইউরেনিয়ামখণ্ড পাওয়া গিয়েছে সেগুলিকে পরীক্ষা করে জানা যায় যে ঐ সকল শৈলমালার বয়স ১৪০ কোটি বছর। থোরিয়াম ধাতুর ক্রম-পরিণতির বিচার করে ঐ একই অঙ্ক পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীনতম শৈলমালার বয়স জানলেই পৃথিবীর বয়স জানা হয় না। যেহেতু ঐ সকল শৈলমালা গঠিত হবার বহু পূর্বেই নিশ্চয় পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্যেই আরো সূক্ষ্ম বিচার করে জানা যায় যে পৃথিবীর বয়স মোট ৩৪০ কোটি বছরের বেশী নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন প্রণালীর হিসাবে পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে খুব একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক পাওয়া যায় না; তবে মোটামুটিভাবে এটা ধরে নেওয়া যায় যে পৃথিবীর বয়স কমপক্ষে ২০০কোটি বৎসর। এর চেয়ে ভাল উত্তর দেবার ক্ষমতা বিজ্ঞানের আপাততঃ নেই। তবুও বিজ্ঞানশাস্ত্র যেটুকু বলে তাতেই বাহাদুরী কম নয়।

আরেকটা প্রশ্ন যা আমাদের মনে স্বভাবতঃই জাগে তা হচ্ছে এই যে পৃথিবীতে জীবের অবির্ভাব কবে এবং কি করে হল। আমরা সর্বদা দেখতে পাই যে জড় থেকে কখনো জীবর জন্ম হয় না। গাছের বীজ হয়, বীজ হতেই আবার গাছ জন্মে। প্রাণীদের বাচ্চা হয়; কোনটার বা প্রথমে ডিম হয়, ডিম থেকে বাচ্চা বেরোয়। একেবারে শৈশবে পৃথিবীর যে অবস্থা ছিল তাতে ধরাপৃষ্ঠে জীবের বাস সম্ভবপর ছিল না। পৃথিবী

তখন ছিল আগুনের পিণ্ড। ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষাকৃত শীতল হবার পর জড় থেকে জীব প্রথমে কি করে উৎপন্ন হল—তা একটা রহস্য। পৃথিবীর ক্রমপরিবর্তনের কোন্ পর্যায়ে এবং কি সূত্রে জীবের আবির্ভাব প্রথমে ঘটেছিল তা ঠিক বলা যায় না। সমুদ্রের তলানি থেকে উৎপন্ন যে সকল প্রাচীনতম পাললিক শৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তাতে কীট এবং শামুকজাতীয় জীবের কঙ্কাল প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। অতএব সেই যুগে কিংবা তারও আগে নিশ্চয়ই জীবের সৃষ্টি হয়েছিল। এখনকার পণ্ডিতদের অভিমত এই যে পৃথিবীতে একই জীবনধারা চলে আসছে। এক বৃক্ষ থেকে যেমন অসংখ্য ডালপালার উৎপত্তি হয়, একই নদী যেমন বহু শাখায় বিভক্ত হয়, তেমনি এক অখণ্ড জীবনধারা ক্রমাভিব্যক্তির ফলে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে নানা জীবজন্তুর সৃষ্টি করেছে। মানুষ ও সেই একই জীবনধারা বেয়ে এসেছে। এ কথা পরে আরো বুঝিয়ে বলা হবে।

জীবের শরীরে যে সকল যৌগিক উপাদান (organic Compounds) পাওয়া যায় তাকে বলা হয় 'জৈব' পদার্থ। জৈব পদার্থের বিশ্লেষণ মানুষ অনেক করেছে এবং এখনো আরো করছে। এক সময়ে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে জৈব পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করতে পারা যায় না। কিন্তু এখনকার লেবরেটরীতে জৈব পদার্থ তৈরি হচ্ছে। তা সত্ত্বেও মানুষ এখনো 'জীব' তৈরি করতে পারে নি। কোন দৈব উপায়ে যদি পৃথিবীতে জীবের সৃষ্টি না হয়ে থাকে, তবে একথা মানতেই হবে যে জীবনবিকাশের সমস্ত সরঞ্জাম সূর্য হতে বিক্ষিপ্ত অগ্নিপিণ্ডের ভিতরেই ছিল, এবং অক্লান্ত চেষ্টার

ফলে জড় উপাদান থেকেই মানুষ একদিন না একদিন হয়ত জীব সৃষ্টি করতে পারবে। কেউ কেউ বলেন পৃথিবী যখন খুব উত্তপ্ত ছিল তখনকার কোন অদ্ভুত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই প্রথম জীবের উদ্ভব হয়েছিল, এবং লেবরেটরীতে খুব উচ্চতাপে পরীক্ষা করতে করতে জীব-সৃষ্টির রহস্য বেরিয়ে পড়বে। 'তথাস্তু' বলে এই অধ্যায় শেষ করা যাক।

ভূমণ্ডল

পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত এবং বয়সের কথা অতি সংক্ষেপে আগেকার অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এবারে আমরা পৃথিবীর পরিচয় একটু বিশদ-ভাবে দেবার চেষ্টা করব। ভূমণ্ডলকে মোটামুটি চারভাগে বিভক্ত করা যায় ; যথা—বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, অশ্মমণ্ডল ও কেন্দ্রীয়মণ্ডল।

(১) বায়ুমণ্ডল

বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে একটা হালকা মোলায়েম আবেস্টনে ঘিরে রেখেছে। শ্বাস-প্রশ্বাস ও ত্বকের সাহায্যে আমরা এর অস্তিত্ব অনুভব করি। ভূপৃষ্ঠ থেকে কতদূর পর্যন্ত এই বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত তার ঠিক ঠিক পরিমাপ এখনো হয় নি। উষা ও সূর্যাস্তের আলোকরশ্মি, উল্কার গতি, এবং মেরুপ্রদেশের অরোরার সাহায্যে হিসাব করে ৪০ থেকে ৩০০ মাইল পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন অঙ্ক পাওয়া গিয়েছে। ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন বায়ুস্তর ঘন এবং এর চাপ বেশী। যত উপরে যাওয়া যায় ততই হাওয়া পাতলা ও চাপ কম। পঞ্চাশ মাইলের উর্ধ্বে বায়ুর চাপ এত অল্প যে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বিশুদ্ধ বায়ু কতকগুলি গ্যাসের সমষ্টি। এর শতকরা ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন, ২১ ভাগ অক্সিজেন, বাকী একভাগে আছে আর্গন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড নামক দুটি গ্যাস। নীচের স্তরের বায়ু প্রায়ই বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে না। ওখানে জলীয় বাষ্প, ধূলিকণা, ধোঁয়া, কয়লার গুঁড়া, নানা পচনশীল বস্তুর গ্যাস

প্রভৃতি কত কিছু অনবরত উঠানামা করছে। এগুলি কখনো বায়ু-মণ্ডলের স্থায়ী অংশরূপে পরিণত হয় না। অপেক্ষাকৃত ভারী কণা-গুলি থিতিয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে, বাকী সব ময়লা বৃষ্টি ও শিশির-বিন্দুর সঙ্গে মিশে মাটিতে পড়ে। এরকম ভাবে বায়ু পরিষ্কৃত হয়।* যে সকল স্থান ঘন-বসতিপূর্ণ কিংবা কল-কারখানায় ভর্তি সেখানকার বায়ু প্রায় কখনই পরিষ্কার থাকে না। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ধূলাবালি বিশ্ববিধানের কাজে লাগে। এগুলোর সাহায্যে বৃষ্টি ও কুয়াসার উদ্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ বাতাসের ধূলি ও বাষ্পকণা রোদের তেজ অনেকটা নরম করে দেয়।

বায়ুমণ্ডল না থাকলে আমাদের বর্তমান জীবন-প্রণালী অসম্ভব হত। প্রথমতঃ বাতাসের অক্সিজেন না হলে ত আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াই বন্ধ। দ্বিতীয়তঃ বায়ুমণ্ডল না থাকলে মেঘ উঠত না, বৃষ্টি হত না, পৃথিবীতে বিশুদ্ধ জলের অস্তিত্ব থাকত না। তৃতীয়তঃ বায়ুমণ্ডলের অভাবে ভূপৃষ্ঠে উত্তাপের তারতম্য হত অতি দারুণ রকমের। বায়ুমণ্ডল পার হয়ে আসতে আসতে সূর্যের তেজ অনেকটা মন্দীভূত হয়। অপরদিকে মাটির উত্তাপ বায়ুমণ্ডলের দরুন ধাঁ করে বেরিয়ে যেতে পারে না। বায়ুমণ্ডল না থাকলে আমাদের মাটি গ্রীষ্ম-কালে দিনের বেলায় হত আগুনের মত গরম এবং রাত্রিতে হত বরফের মত ঠাণ্ডা।

বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরের কথা জানবার জন্যে মানুষ পাহাড়ের চূড়া বেয়ে যত উঁচুতে সম্ভব উঠেছে। ভূপৃষ্ঠে সব চেয়ে উঁচু পাহাড়—হিমালয়ের এভারেস্ট শৃঙ্গ (২৯, ১৪১ ফুট)। কয়েকবার দুঃসাহসিক

অভিযান চালিয়েও মানুষ এখনো পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এভারেস্ট শীর্ষে পৌঁছতে পারে নি। সেখানকার পাহাড় অত্যন্ত খাড়া, বাতাস বরফের চেয়েও অনেক বেশী ঠাণ্ডা, এবং এত হালকা যে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কায ওতে কুলোয় না। তা ছাড়া সেখানে বরফের স্তূপ একবার গড়ে উঠছে, একবার ভেঙ্গে পড়ছে, এবং যখন খুশী শুরু হয় ঝড়-তুফানের তাণ্ডব। এত সব বাধাবিপত্তি লঙ্ঘন করেও ১৯২৪ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে নর্টন ও সোমারভেল (E. F. Norton, T. H. Somervell.) নামক দুজন ব্রিটিশ অভিযানকারী ২৮,১৩০ ফুট পর্যন্ত উঠেছিলেন। আরো ১০১১ ফুট চড়তে পারলেই এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় হত; কিন্তু আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব দেখে সেখান থেকেই তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হন। মানুষের পক্ষে পায়ে হেঁটে উপরে চড়ার ইহাই সর্বোচ্চ রেকর্ড। এরোপ্লেনে চড়ে মানুষ আরো অনেক উপরে চড়েছে এবং বেলুনে চড়ে তার চেয়েও ঊর্ধ্বে অভিযান করেছে।

১৯৩১ খৃস্টাব্দের ২৭ মে প্রত্যুষে সুইজর্লণ্ডের বৈজ্ঞানিক অগাস্ত পিকার্ড ও তাঁর একজন সহকর্মী ছিদ্রহীন এলুমিনিয়মের গোলকের ভিতর ঢুকে জুরিক্ শহর থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন অজানা ঊর্ধ্বে। প্রত্যেক বেলুনে থাকে হালকা গ্যাসের থলি। থলিতে আবদ্ধ হালকা গ্যাসের ঠেলাতেই বায়ুসমুদ্রে বেলুন উপরে উঠতে থাকে,—যেমন একটা বাতাস-ভরা ফুটবলকে পুকুরের তলায় নিয়ে ছেড়ে দিলে সেটা সবেগে জল ঠেলে উপরে ভেসে উঠে। বেলুন উপরে যাবার পর গ্যাসের থলির মুখ খুলে গ্যাস ছাড়লে বেলুন আবার নীচে নামতে থাকে।

আধ ঘণ্টারও কম সময়ে পিকার্ডের বেলুন বায়ুমণ্ডল ভেদ করে উঠে ৫৩১৫৩ ফুট অর্থাৎ ১০ মাইলেরও অধিক উঁচুতে। তারপর তারা যখন নীচে নামতে চাইলেন তখন দেখতে পেলেম গ্যাসের থলির ছিপির মুখ যে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল তা অন্যান্য দড়ির সঙ্গে এমনভাবে জট পাকিয়ে গিয়েছে যে আর খুলবার যো নাই। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তাপে এলুমিনিয়মের গোলক গেল বেজায় তেতে। সারাদিন সেই অবস্থায়ই তাঁরা রইলেন অন্তরীক্ষে বন্দী হয়ে। অবশেষে রাত্রিতে যখন বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত শীতল হল তখন তাপহ্রাসের দরুন বেলুনের আবদ্ধ গ্যাস ঘন হল এবং বেলুন আপনা থেকেই ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল। সতেরো ঘণ্টাকাল সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যে কাটিয়ে পিকার্ড ও তাঁর সঙ্গী নির্বিঘ্নে নেমে এলেন ইটালীতে। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে আমেরিকা থেকে কাপ্তেন ষ্টিভেন্‌সন্ ও কাপ্তেন এণ্ডার্সন বেলুনে ৭২০০০ ফুট (১৩$\frac{1}{2}$ মাইল) উপরে যেতে পেরেছিলেন। স্বয়ং-স্বাক্ষরকারী (self-recording) যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করে চালক-বিহীন বেলুনকে ২৪ মাইলেরও উপরে পাঠানো হয়েছে।

ভূপৃষ্ঠ থেকে যতই উপরে যাওয়া যায় বাতাস ততই শীতল। স্থল-ভাগের উপরে বাতাসের উত্তাপ ঠিক সমান হারে কমে না; পাহাড় পর্বত ইত্যাদির দরুন স্থানে স্থানে কমতির হার বেশী কিংবা অল্প হয়। কিন্তু মহাসমুদ্রের কিংবা মহাপ্রান্তরের উপরে বাতাস যেখানে একেবারে মুক্ত সেখানে দেখা গিয়েছে যে ঊর্ধ্বদিকে বাতাসের তাপ প্রায় সমান হারে কমতে থাকে। শীতকালে এই কমতির হার প্রতি ১০০০ ফুটে ৩°F, এবং গ্রীষ্মকালে প্রতি ৯০০ ফুটে ৩°F। এই হারে

কমতে কমতে একটা জায়গায় গিয়ে কমতি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০১ খৃস্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক তিস্যারোক্ দ্যা বর্ত L. Teissereuc de Bort) ও জার্মান বৈজ্ঞানিক রিচার্ড আস্ম্যান্ (Richard Assmann) প্রায় একই সময়ে আবিষ্কার করেন যে একটা তল বায়ুমণ্ডলকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রয়েছে। এই তলের নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্রপোপজ্' (Tropo-pause)। বিষুবরেখার উপরে এই তলের উচ্চতা প্রায় ১১ মাইল ; সেখান থেকে উভয় মেরুর দিকে উহা ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গিয়েছে। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির উপরে এর উচ্চতা ৭ মাইলেরও কম এবং দুই মেরুপ্রদেশের উপরে এর উচ্চতা মাত্র ৪ মাইল। ঋতুভেদে এবং আবহাওয়া-ভেদে ট্রপোপজের উচ্চতার সামান্য তারতম্য ঘটে। এই তলের উপরের স্তরের নাম দেওয়া হয়েছে স্ট্রেটোস্ফিয়ার (Stratosphere) এবং নীচের স্তরের নাম দেওয়া হয়েছে ট্রপোস্ফিয়ার (Tropo-sphere)। ঊর্ধ্বস্তরের উত্তাপ —১১৭°F (অথবা—৮৩°C) ; উহা এক নিথর, নিশ্চল, অতিশীতল রাজ্য। ঝড়তুফান, মেঘের খেলা প্রভৃতি নিম্নস্তরেই সীমাবদ্ধ এজন্য একে বাংলায় বলা যেতে পারে ক্ষুব্ধস্তর। ঊর্ধ্বস্তরকে বলা যেতে পারে শান্তস্তর। ঊর্ধ্বস্তরে বায়ুর চাপ এত কম যে নীচ থেকে গরম হাওয়া ওখানে পৌঁছতে না পৌঁছতে একেবারে হালকা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং উহার তাপ তৎক্ষণাৎ চারদিকের অতিশীতল বাতাসের তাপের সঙ্গে সমান হয়ে যায়। এই অতিশীতল রাজ্যই যে বায়ুমণ্ডলের শেষসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত তা নয়। শব্দতরঙ্গ, আলোকতরঙ্গ, প্রভৃতির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে অতিশীতল শান্ত-

স্রাজ্যের পরে একটা ওজোন-মণ্ডল আছে ; সেখানে ঠাণ্ডার মুলুক শেষ হয়ে আবার উত্তাপ শুরু হয়েছে।

এরোপ্লেনের যাতায়াত সাধারণতঃ বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু উর্ধ্বস্তরে (স্ট্রেটোস্ফিয়ার) বিচরণ করবার বিমানও নির্মিত হয়েছে এবং দু'নম্বর বিশ্বসংগ্রামের হত্যাকাণ্ডে এর ব্যবহার উভয় পক্ষেই হয়েছে। এই বিমানবিহারের অভিজ্ঞতা কিরূপ তিক্ত ও বিপজ্জনক তা বুঝাবার জন্যে একজন অভিজ্ঞ বৈমানিকের বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করা হল। "সেখানে ঠাণ্ডা এত বেশী যে ফুটন্ত তেল কয়েক মিনিটের মধ্যে জমে শক্ত হয়ে যায়। হুঁসবুদ্ধি বজায় রাখার জন্য বেজায় চেষ্টার দরকার হয়, আর যদি দৈবাৎ অক্সিজেনের যন্ত্র বিগড়ে যায়, তবে ত প্রাণ নিয়েই টানাটানি। মহাজাগতিক তীক্ষ্ণরশ্মি (Cosmic Rays) সেখানে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, এবং চোখের সামনে নানা ভোজবাজী দেখতে পাওয়া যায়। কখনো মনে হয় যেন এরোপ্লেনের বিরাট ডানাগুলো অদৃশ্য হয়ে উড়ে গিয়েছে, আবার পরমুহূর্তেই মনে হয় যেন সেগুলো ফিরে এসেছে। নভোমণ্ডলের চেহারাও সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। স্ট্রেটোস্ফিয়ারে উঠলে আর নীলাকাশের অস্তিত্ব থাকে না। সূর্যকে মনে হয় যেন মিশকালো অন্ধকারের ভিতরে একটি তীব্র সন্ধানী-আলো। উঠানাবা না করে সোজাভাবে খুব বেগে চলতে থাকলেও চলছি বলে মোটেই মনে হয় না। পৃথিবীর বর্তুলাকার রূপ চাক্ষুষ দেখতে পাওয়া যায়। পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে শত শত মাইল পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠের গোল চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠে। আমরা ভূপৃষ্ঠে যেরূপ বায়ুচাপে অভ্যস্ত তার

তুলনায় স্ট্রেটোস্ফিয়ারের বায়ুচাপ অতি নগণ্য। সেইজন্য স্ট্রেটোস্ফিয়ারে ঘুরে বেড়ান দেহের পক্ষে বড়ই অস্বস্তিকর। হাত পা বিকল হয়ে আসে। পেট দারুণভাবে ফেঁপে উঠে, কারণ উদরাভ্যন্তরের গ্যাসের চাপ বাইরের বায়ুচাপের তুলনায় অনেক বেশী। তা ছাড়া অস্থিসন্ধি এবং পেশীগুলিও যেন কাঠ হয়ে আসে। তখন যেরূপ অস্বস্তি বোধ হয় তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কাউকে বুঝানো যায় না।"

নিম্নস্তরে (ট্রপোস্ফিয়ারে) প্রায় সব সময়েই তোলপাড় কাণ্ড চলছে। পৃথিবীর ঘূর্ণায়মান গতি, জল-স্থলের ইতস্ততঃ অবস্থান, ভূপৃষ্ঠের উচ্চাবচতা, বিভিন্ন অক্ষরেখায় বিভিন্ন পরিমাণে সূর্যরশ্মির বিকিরণ—প্রভৃতি নানা কারণে উহা ঘটে। যেহেতু বাতাস একটা গ্যাস, অতএব উত্তাপ ও চাপের তারতম্যে এর কণিকাসমূহে উপস্থিত হয় চাঞ্চল্য ; তা থেকে শুরু হয় বায়ুপ্রবাহ। কোন কোন প্রবাহ একটানা-ভাবে অনেক দিন ধরে চলে, যেমন আমাদের দেশের শীতকালের উত্তুরে হাওয়া এবং বর্ষাকালের দক্ষিণে হাওয়া। আবার কোন কোন বায়ুপ্রবাহ স্বল্পকালস্থায়ী কিন্তু প্রলয়ংকর ; যেমন কালবৈশাখী ও ঘূর্ণীবাত্যা। মানুষ এগুলো লক্ষ্য করে আসছে পুরাকাল থেকে। আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করবার জন্যে দেশে-দেশেই খনা ও ডাকের বচন রচিত হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তথ্যসংগ্রহ আরম্ভ হয়েছে সম্পূর্ণ আধুনিক কালে, মাত্র শতেক বছর ধরে। এখনো এ-সকল বিষয়ে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার খুব সমৃদ্ধ হয় নি।

বায়ু ভূপৃষ্ঠে অনবরত পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। চলন্ত বায়ু রাশি রাশি ধূলিবালি উড়িয়ে নিয়ে যায়। বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে উহা বালুকার

পাহাড় সৃষ্টি করে। আবার বাত্যাবাহিত ধূলিকণার নীচে কত গ্রাম-নগর তিলে তিলে সমাহিত হয়। অনেক প্রাচীন পরিত্যক্ত জনপদ এ-ভাবেই মাটীর নীচে গিয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কতকগুলোকে খুঁড়ে বের করেছেন। সারনাথ ও তক্ষশিলা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বায়ুর চপলক্রীড়াতে কত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে তার একটি দৃষ্টান্ত সম্বর হ্রদের লবণ। প্রাচীনকালে সমুদ্রের জল আটকা পড়ে সম্বর হ্রদ সৃষ্ট হয় নি। সম্বরের তলায় কিংবা চারদিকে কোন লবণের আকরও নাই যার ফলে সম্বরের জল লোণা হতে পারত। কারণ খুঁজতে গিয়ে এই ব্যাপারের মূলে পাওয়া গিয়েছে চিরচঞ্চল বায়ু। সারা গ্রীষ্মকাল ধরে রাজ-পুতানার মরুভূমির উপর দিয়ে চলে আরব সাগর থেকে উত্থিত ঝড়ো হাওয়া। সমুদ্রের বেলাভূমিতে লবণের কণা বালুকণার সঙ্গে মিশে থাকে। ঝড়ো হাওয়া সেই লবণ-কণা শত শত মাইল উড়িয়ে নিয়ে ছড়িয়ে দেয় মরুভূমির বুকে। তার পরে যখন বর্ষাকালে মরুভূমিতে দু'এক পশলা বৃষ্টি হয় তখন সেই লবণকণাগুলি গলে ছোট ছোট নদী-নালার জলের সঙ্গে মিশে এসে পড়ে সম্বর হ্রদে। বহুকাল ধরে এরকম হওয়াতে সম্বর হ্রদের জল এত লোণা হয়েছে।

হাওয়া এবং বালুর মাতামাতিকে মানুষ সাহায্য করতে কিংবা বাধা দিতেও পারে। রুশিয়াতে জার সম্রাটের আমলে পরিণাম চিন্তা না করে সাময়িক লাভের জন্য অনেক অরণ্যানী বিনষ্ট করা হয়েছিল। জমিদারেরা একদিকে থেকে জঙ্গলের সমস্ত গাছ কাটিয়ে কাঠ বিক্রি করেছিলেন। তা'র ফল এই হয় যে সাইবিরিয়ার মরুভূমির বায়ু-তাড়িত বালুকারাশি বাধা না পেয়ে ক্রমশঃ দূরদূরান্তে উড়ে যেতে

থাকে এবং মরুভূমির সীমানা ক্রমেই বাড়তে থাকে। জার সম্রাটের রাজত্বের অবসানের পর সোভিয়েট গবর্নমেন্ট এই ব্যাপার শুধু বন্ধ করেন নি, নূতন গাছপালা লাগিয়ে মরুভূমিকে সঙ্কুচিত এবং উর্বর ভূমিতে পরিণত করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। এই চেষ্টাতে তারা সাফল্য লাভ করেছেন যথেষ্ট।

বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কারবনিক এসিড প্রভৃতি গ্যাস ও জলীয় বাষ্প ভূপৃষ্ঠের মাটি ও নানা ধাতব পদার্থের সংস্পর্শে আসাতে অনুক্ষণ কত বিচিত্র রাসায়নিক কাণ্ডকারখানা ঘটছে। এই সকল রাসায়নিক ক্রিয়া আবার গাছপালার জন্ম ও বৃদ্ধির কাজে নানা-রকমভাবে এবং প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। উদ্ভিদের একটি প্রধান খাদ্য নাইট্রোজেন। জমিতে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এবং জীবাণুর সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন উদ্ভিদের আহার্যে পরিণত হয়। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী শ্বাসের সঙ্গে ভিতরে নেয় অক্সিজেন, এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে বের করে দেয় কার্বনিক এসিড গ্যাস। এই গ্যাস একটি বিষাক্ত যৌগিক পদার্থ; এতে আছে কার্বন এবং অক্সিজেন। সমস্ত প্রাণীর শ্বাসনিঃসৃত কার্বনিক এসিড বায়ুমণ্ডলে ক্রমাগত জমা হতে থাকলে বাতাস এতদূর বিষিয়ে উঠত যে আমাদের পক্ষে জীবনধারণ হত অসম্ভব। কিন্তু উদ্ভিদ সেই বিপদ নিবারণ করে। আমাদের পক্ষে কার্বনিক এসিড বিষ হলেও উদ্ভিদের নিকট উহা খাদ্য। উদ্ভিদ উহাকে পাতার ভিতর দিয়ে গ্রহণ করে কার্বনটুকু রেখে দেয় নিজের পুষ্টির জন্য, এবং অক্সিজেনটুকু ছেড়ে দেয় বাতাসে।

বায়ুমণ্ডল যে শুধু একটা আলগা চাদরের ন্যায় পৃথিবীকে জড়িয়ে

রেখেছে তা নয়—পৃথিবীর জলস্থলের সঙ্গে এবং উদ্ভিদ ও জীবজগতের সঙ্গে বায়ুমণ্ডল লক্ষডোরে বাঁধা। তাদের পরস্পরের যোগাযোগ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তালিকা এখানে দেওয়া অসম্ভব। মৃত্তিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, পত্রপল্লবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিদ্রে প্রবেশ করে বায়ু উদ্ভিদরাজ্যে অনুক্ষণ প্রাণসিঞ্চন করছে ; আবার বায়ুই ফুসফুস ও রোমকূপের ভিতর সঞ্চারিত হয়ে মানুষ ও ইতর প্রাণীর দেহে প্রাণনক্রিয়াকে চালু রেখেছে। চিরচঞ্চল বায়ু জল ও স্থল, উদ্ভিদ ও প্রাণী—সকলের সঙ্গে অবিরাম খেলায় মত্ত। আর সেই খেলার সঙ্গে অসংখ্য সূত্রে জড়িয়ে আছে পৃথিবীর বুকে সৃষ্টিস্থিতি, ভাঙ্গাগড়া ও জীবনমৃত্যুর বিচিত্র লীলা।

(২) বারিমণ্ডল

জল ভূমণ্ডলের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। ভূগোলকের কিংবা মানচিত্রের দিকে তাকালেই আমাদের চোখে পড়ে বড় বড় মহাসমুদ্র। কিন্তু সমুদ্র ছাড়াও আছে নদনদী, খালবিল, নালা-ডোবা, পুকুর, হ্রদ ইত্যাদি। আবার মাটীর নীচেও জলের অস্তিত্ব এবং চলাচল নিতান্ত কম নয়। পাতালপুরীর জলই কূপ, নলকূপ ও ফোয়ারার যোগানদারি করে।

মহাসমুদ্রের জলরাশি ভূপৃষ্ঠের শতকরা ৭০·৮ অংশ জুড়ে আছে। সমুদ্রের গড়পড়তা গভীরতা হিসাব করা হয়েছে ১৩০০০ ফুট। সমুদ্রের যে সকল অংশের গভীরতা ১৮০০০ ফুটেরও বেশী সেগুলিকে ইংরেজীতে বলা হয় 'Deeps', বাংলাতে বলতে পারি 'দহ'। এগুলোর

সংখ্যা প্রায় ষাট্। প্রশান্ত মহাসাগরে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পূর্বদিকে অবস্থিত 'সোয়ার-দহ'ই (Swire Deep) এযাবৎ গভীরতম সমুদ্র বলে জানা গিয়েছে। ওখানকার গভীরতা ৩৫৪৩৩ ফুট। উপকূলের নিকট সমুদ্র অধিকাংশ স্থলেই গভীর নয়; তীর থেকে নেমেই ঘাটের সিঁড়ির মত চটান জায়গা খানিকদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এই ধাপের গভীরতা সাধারণতঃ ৫।৬শ' ফুট। তার পরেই সমুদ্রের তলদেশ অকস্মাৎ নেমে গিয়েছে। গভীর দহ এবং জলমগ্ন শৈল ও মালভূমি প্রভৃতি বাদ দিলে মহাসমুদ্রের অবশিষ্ট তলদেশ খুবই সমান, অর্থাৎ তাতে উঁচুনীচু নেই। সমুদ্রপৃষ্ঠের জল যেমন সুডৌল বর্তুলাকার, সমুদ্রতলের কঠিন মৃত্তিকাও ঠিক তার সমান্তরালভাবে বিস্তৃত।

জলের নীচে ডুবুরিরা সাধারণতঃ ২০০।২৫০ ফুট গিয়ে থাকে। অভিযানকারীরা এ পর্যন্ত ২২০০০ ফুটের বেশী জলের নীচে যেতে পারেন নি। উইলিয়ম বীব্ (William Beebe) এবং ওরিস্ বার্টন (Oris Burton) নামক দুজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক একটি ইস্পাতের গোলকের ভিতর ঢুকে বারমুডা দ্বীপের কাছে ২২০০০ ফুট নীচে নেমেছিলেন (২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ ইং)। মানুষ নিজে না নামতে পারলেও যন্ত্রপাতির সাহায্যে আরো গভীরতর প্রদেশের তথ্যাদি সংগ্রহ করেছে।

পৃথিবীর জলরাশি কখনো স্থির হয়ে নাই, তারা যেন হরদম একটা নাগরদোলায় চক্কর খাচ্ছে। সমুদ্র, নদীনালা, খালবিল পুকুর প্রভৃতির জল রোদের তাপে বাষ্প হয়ে উপরে উঠছে, তারপর মেঘ হয়ে বায়ুর পাখায় ভর করে দেশ দেশান্তরে পাড়ি দিচ্ছে। মেঘ আবার বৃষ্টি ও

শিশির হয়ে পৃথিবীর বুকে গলে পড়ছে,—কিংবা শীতের দেশে ও উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় বরফের আকারে ঝরে পড়ছে। বৃষ্টির জল, বরফ-গলা জল সব কিছু নদীনালা বেয়ে ছুটে চলে সমুদ্রের পানে। সেখান থেকে আবার মেঘ হয়ে উপরে উঠে, আবার শুরু হয় বায়ুর রথে দেশান্তরের পাড়ি। এই চক্রাকার গতির বিরাম নেই; আর এর ফলে অনেক কিছু কাণ্ড ঘটছে। বারিপাত হিমপাত সব জায়গায় সমানভাবে হয় না। কোথাও বা বছরে ৫০০ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি হয় (যেমন চেরা-পুঞ্জীতে),—কোথাও বা ২।৪ ইঞ্চি মাত্র। বৃষ্টি কোথাও পড়ে খাড়া পাহাড়ের গায়, কোথাও বা সমভূমিতে কিংবা গর্তে; কোথাও বা পড়ে পাথরের উপরে, কোথাও গভীর ঘাস-জঙ্গলে, কোথাও বালুকা-ভূমিতে, কোথাও বা এঁটেল মাটীতে। সুতরাং বারিপাতের ফল সর্বত্র সমান হয় না। মোটামুটি এরূপ বলা যায় যে বৃষ্টির জলের এক-তৃতীয়াংশ অবিলম্বে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, একতৃতীয়াংশ নদীনালা দিয়ে বয়ে যায় এবং বাকী একতৃতীয়াংশ মাটিতে শোষে।

মাটীতে-শোষা জল যে বরাবর শুধু নীচের দিকেই যেতে থাকে তা নয়। মাটীতে স্তর বিন্যাস আছে; সেই অনুযায়ী জলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন স্তর নরম ও ছিদ্রময়, তার ভিতর দিয়ে জল অনায়াসেই ঝিরঝিরিয়ে চলে যেতে পারে; কোন স্তর কঠিন এবং ছিদ্রবিহীন—জল সেখানে বাধা পায়, তখন মোড় ফিরে অন্যদিকে যাবার চেষ্টা করে। স্তরগুলি যে ভূপৃষ্ঠের একেবারে সমান্তরাল তাও নয়, হয় ত একদিকে ঢালু, কিংবা ঢেউ-খেলানো—কোন স্তর যেতে যেতে হয় ত গিয়ে ঠেকেছে

মিশেছে নদীগর্ভে কিংবা হ্রদের তলায়। এই সকল কারণে ভূগর্ভের জল যে যথাসম্ভব নীচে নেমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তা নয়। জল সেখানেও স্রোতের প্রায় চলতে থাকে, যদিও সেই চলার বেগ খুব মন্থর। পৃথিবীর ভিতরে যতই যাওয়া যায় ততই গরম। অতএব মাটীর খুব নীচে গেলে জল তরল অবস্থায় থাকতে পারে না, বাষ্পে পরিণত হয়। নলকূপে কতকস্থানে ৬০০০ ফুটেরও নীচে জল পাওয়া গিয়েছে; কিন্তু সাধারণতঃ ২০০০ ফুটের নীচে জল অল্পই পাওয়া যায়। পাতালপুরীতে যে জলপ্রবাহ চলে তাতে অসম চাপ ও উত্তাপে এবং নানাবিধ লবণ ও ধাতব পদার্থের সংযোগে অনেক রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং খনিজ দ্রব্য তৈরি হয়।

ভূপৃষ্ঠের উপরে মোটামুটি হিসাবে দু' রকমের জল দেখা যায়— এক মিঠে জল, দ্বিতীয় লোনা জল। পুকুর, হ্রদ, নদী, ঝরনা প্রভৃতির জল সাধারণতঃ মিঠে জল। ফোয়ারার জলে কখনো কখনো গন্ধক এবং অন্যান্য খনিজদ্রব্য মিশানো থাকে। কূয়ার জল মিঠে এবং লোনা দু' রকমই দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের জল খুব লোনা; কিন্তু সেই লবণ গোড়া থেকেই সমুদ্রে সঞ্চিত ছিল না। নদীর জল যে সকল ক্ষার ধুয়ে আনে তাতে খুব অল্প পরিমাণ লবণ থাকে; সেই লবণই আস্তে আস্তে সঞ্চিত হয়ে সমুদ্রের জল এত লোনা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা কিরূপ বুদ্ধি খাটিয়ে হিসাব করেন তার একটা নমুনা এখানে দেওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত নদী বয়ে বছরে যত জল সমুদ্রে গড়িয়ে পড়ে তার একটা মোটামুটি হিসাব করা হয়েছে। তাতে লবণের অনুপাত কষে দেখা যায় যে সমস্ত নদ-নদী মিলে মোট প্রায়

৯৫ কোটি মণ লবণ প্রতি বৎসর সমুদ্রকে উপহার দিচ্ছে। সমুদ্রের আয়তন, গড়পড়তা গভীরতা এবং সমুদ্রজলে লবণের ভাগ এই ক'টি থেকে জানা যায় যে বর্তমানে সমগ্র সাগরজলে লবণের মোট পরিমাণ ৩৪০২ কোটি-কোটি মণ। এখনকার বার্ষিক হারে দেখা যায় যে এই পরিমাণ লবণ সঞ্চিত হতে ৩৬ কোটি বছর লেগেছে। অতএব অন্ততঃ ৩৬ কোটি বৎসর যাবৎ পৃথিবীতে স্থল, পর্বত, সমুদ্র ও নদ-নদী রয়েছে। তাদের অবস্থান যে চিরকাল এখনকার মত ছিল তা অবশ্য নয়।

লবণের চেয়ে অনেক অধিক পরিমাণে চূণ নদীর জলে ধুয়ে নিয়ে যায়; কিন্তু সমুদ্রের জলে তার অস্তিত্ব দেখা যায় না। কারণ এই যে সামুদ্রিক গাছপালা এবং জীবজন্তু তা আত্মসাৎ করে ফেলে। সমুদ্রের শামুক, ঝিনুক, প্রবাল প্রভৃতির দেহে চূণের ভাগ খুব বেশী।

মহাসমুদ্রের অনন্ত জলরাশি মানুষের মনকে আদিকাল থেকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। প্রাচীন কালের মানব সমুদ্রদেবতার উদ্দেশ্যে পূজোপহার দিয়েছে। ক্ষুব্ধ সমুদ্রের গর্জন ও আস্ফালনকে দেবতার রোষ মনে করে মানুষ তাকে শান্ত করবার জন্যে কত স্তবস্তুতি করেছে। সেগুলি লেখা আছে প্রাচীন গাঁথায়। কিন্তু বিস্ময় এবং ভয় মানুষের কৌতূহল ও স্বার্থবুদ্ধিকে দমিয়ে রাখতে পারে নি। বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ শুরু করেছিল সমুদ্রে যাতায়াত। বাণিজ্যের জন্যে, মৎস্যশিকারে, কখনো বা ডাকাতির উদ্দেশ্যে মানুষ সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে। আবার মণিমুক্তার খোঁজে ডুবুরিরা সমুদ্রের তলদেশে হানা দিয়েছে। খুব বেশী দিন হয় নি কলের জাহাজ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং মহাসমুদ্রের বুকে চলাচল করছে। তার আগে পালের নৌকায়

কিংবা জাহাজে করে পৃথিবীর সমস্ত জলভাগের সঙ্গে পরিচিত হওয়া নিশ্চয়ই খুব সহজ কাজ ছিল না। তাই মহাসাগরের বিশদ পরিচয় জানতে মানুষের অনেক শতাব্দী লেগেছে। এই দুঃসাহসিক আবিষ্কারের কাজে কত নাবিক যে প্রাণ দিয়েছেন তার সংখ্যা কে বলতে পারবে? যারা সাফল্য লাভ করেছেন তাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হয়ে রয়েছে; আবার সুপ্রাচীনকালের কত শত আবিষ্কারকের নাম বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়েও গিয়েছে।

সাগর উপসাগরের ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করতে পারলেই এগুলির সম্পর্কে সব কিছু জানা হয় না। গভীরতা, তলদেশের পরিচয়, স্রোতোবেগ, ঋতুভেদে আবহাওয়ার পরিবর্তন, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণি-বর্গের পরিচয়—প্রভৃতি অনেক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এবং ব্যাপকভাবে এ সমস্ত তথ্যসংগ্রহ শুরু হয়েছে মাত্র শতেক বছর ধরে। এখনো আরো অনেক কাজই বাকী রয়েছে।

প্রাচীনকালে ভারতের উপকূলবর্তী স্থানের লোকেরা সমুদ্র-চলাচলে অভ্যস্ত ছিল। ভারত মহাসাগরের পূবে পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত তাদের যাতায়াত ছিল। ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নীতি ও ধর্ম, ভারতীয় সভ্যতার ধারা তারা বয়ে নিয়েছিল পারস্যে, আরবে, লোহিত-সাগরের উপকূলে পূর্ব-আফ্রিকায়, ব্রহ্মদেশে, মালয়ে, যবদ্বীপে, সুমাত্রায়, বলিদ্বীপে, শ্যামে, আনামে, কম্বোজে, চীনে ও জাপানে। তার পরে খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে দেখা দিল এক দারুণ বিপর্যয়,—যার ফলে এই আত্মপ্রসারণ বন্ধ হয়ে গেল, শুরু হল

আত্মসঙ্কোচন। তখন থেকে সমুদ্রযাত্রা একেবারে বন্ধ না হলেও বহু পরিমাণে হ্রাস পেয়ে গেল।

এখনো ভারতীয় মাঝিমাল্লা পালের জাহাজে অনেক দূর পর্যন্ত যাতায়াত করে। আমাদের সমুদ্রোপকূলের ধীবর ও ডুবুরিরা খুবই সাহসী। উপযুক্ত শিক্ষা ও উৎসাহ পেলে এরা শ্রেষ্ঠ নাবিক ও নৌ-সৈন্য হতে পারত। কিন্তু সারা মধ্য যুগে একমাত্র শিবাজী ছাড়া অপর কোন হিন্দু অথবা মুসলমান নৃপতি নৌশক্তির দিকে মোটেই মনোযোগ দেন নি; দিলে খুব সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য রকম হত। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে ষোড়শ শতক থেকেই ইউরোপে পালের জাহাজের অনেক উন্নতি হয়, তারপর কলের জাহাজ নির্মিত হয়। কিন্তু ভারতীয়েরা এবিষয়ে যথাসময়ে মনোযোগ না দেওয়াতে নৌবিদ্যায় আমরা বহুদূর পিছিয়ে পড়েছি। জানতে-না-চাওয়ার এবং নিষ্ক্রিয়তার এটাই শোচনীয় পরিণাম।

(৩) অশ্মমণ্ডল

পৃথিবীর কঠিন আবরণের নাম দেওয়া হয়েছে অশ্মমণ্ডল বা পৃষ্ঠশৈল। ভূগোলকের বায়বীয় ও জলীয় আবরণের নীচে এই অশ্মমণ্ডল অবস্থিত। ভূপৃষ্ঠের কঠিন আবরণ সর্বত্র সমান পুরু নয়। বিভিন্ন প্রণালীতে পরীক্ষা করে এরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে উহা গড়ে প্রায় ৪০ মাইল পুরু। পৃষ্ঠশৈলের অভ্যন্তরে ভূগোলক অর্ধতরল এবং তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। এই তরলরাজ্য অথবা কেন্দ্রীয়মণ্ডলের কথা পরে বলা হবে। কিন্তু অশ্মমণ্ডলে যে সকল তোলপাড় কাণ্ড মাঝে মাঝে

ঘটে তা বুঝবার জন্যে একথা সর্বদাই মনে রাখা দরকার যে আমাদের এই বসুন্ধরার শক্ত মাটির নীচে রয়েছে তরল আস্তরণ।

পৃথিবীর কোন রিলিফ মানচিত্র অথবা গোলকের দিকে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে অশ্মমণ্ডলের উচ্চাবচতা অর্থাৎ উঁচুনীচু অবয়ব। মহাসমুদ্রের তলদেশগুলি গর্ত হয়ে পৃথিবীর গায়ে ঢুকেছে। অপরদিকে মহাদেশগুলি যেন মঞ্চের মত উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার উপরে চড়াও হয়ে আছে মালভূমি ও পাহাড়পর্বত।

ভূপৃষ্ঠের সব উপরিভাগে সাধারণতঃ দেখা যায় একটি নাতিগভীর সারমাটির আবরণ (soil)—যাতে গাছপালা জন্মে। বাংলাদেশ পলিমাটিতে গড়া এবং ভূতত্ত্বের হিসাবে এর বয়স কম। এজন্য এখানে মাটির স্তর বেশী পুরু। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে সারমাটির আবরণের কয়েক ফুট নীচেই রয়েছে পাথর, এবং সারমাটির সঙ্গেও মিশে আছে যথেষ্ট কঙ্কর। ভূগর্ভের অনেক স্থানে বিবিধ ধাতু, তেল, কয়লা, চূণাপাথর, লবণ প্রভৃতির খনি আবিষ্কৃত হয়েছে ; আরো অনেক এখনো অনাবিষ্কৃত রয়েছে। অতএব বায়ুমণ্ডল কিংবা বারিমণ্ডলের ন্যায় অশ্মমণ্ডল শুধু একজাতীয় পদার্থে তৈরি নয়। অশ্মমণ্ডলে আছে পাথর, মাটি এবং নানা খনিজ দ্রব্য। পাথর এবং মাটি আবার এক ধরনের নয় ; উভয়েরই বহুবিধ রকমারি আছে।

অশ্মমণ্ডল যে চিরকাল ধরে একই রকম রয়েছে তা নয়। এতে অহরহ পরিবর্তন চলেছে। বারিমণ্ডলে যেমন আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর জলরাশি অনবরত নাগরদোলায় ঘুরপাক খাচ্ছে—একবার বাষ্প হয়ে উপরে উঠছে, আবার বৃষ্টি কিংবা তুষার হয়ে নীচে নামছে

এবং নদীনালা দিয়ে গড়িয়ে সমুদ্রে পড়ছে ; সেই রকম অশ্মমণ্ডলেও নাগরদোলার চক্করবাজি পুরামাত্রায় চলছে। গিরিশৃঙ্গের প্রস্তররাজিই চূর্ণীকৃত হয়ে বালু এবং কাদামাটির আকারে সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে জমা হয়—আবার সেই তলানি থেকেই কালক্রমে গড়ে উঠে নূতন প্রস্তর ও নূতন পর্বতমালা। কি রকম করে এই ব্যাপার ঘটে তার একটু আভাস দেওয়া হচ্ছে।

পর্বতশীর্ষ থেকে আমরা প্রথমে শুরু করি। জলের একটি ধর্ম এই যে জল জমে যখন বরফ হয় তখন উহা আয়তনে বাড়ে। উঁচু পাহাড়ে পাথরের ফাটলে কিংবা গুহাতে আট্‌কা-পড়া বৃষ্টিজল যখন ঠাণ্ডা লেগে বরফে পরিণত হয়, তখন আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা নিজের পাষাণ-প্রাচীরকে ভেঙ্গে চূরমার করে,—চারদিকে ধসে পড়ে বড় বড় পাথর। এইরূপে এক একটা সমগ্র চূড়া ক্রমশঃ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। শীতকালে তুষারপাতের ফলে এগুলি বরফের নীচে চাপা পড়ে। গ্রীষ্মকালে তুষার-রাজ্যের বরফ যখন গল্‌তে আরম্ভ হয় তখন সবটাই যে একসঙ্গে জল হয়ে গড়িয়ে পড়ে তা নয়। অতিরিক্ত চাপের দরুন সর্বপ্রথমে গলে নীচেকার স্তর। তখন বড় বড় তুষারস্তূপ মন্থর-গতিতে চলতে আরম্ভ করে এবং সেই সঙ্গে ঠেলে নিয়ে চলে অসংখ্য ছোট বড় পাথর। যত চলে, ঘর্ষণের ফলে উত্তাপ ততই বাড়ে, এবং বরফ আরো বেশী পরিমাণে গলতে থাকে—উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে অবশেষে নামতে থাকে উদ্দাম জলধারা। নির্ঝরের সেই স্রোতোবেগ প্রকাণ্ড বড় বড় পাথরকেও ঠেলে নিয়ে যায় নীচে ; পাহাড়ের গায়ে লেগে এবং পরস্পর ঠোকাঠুকিতে সেগুলি ক্রমশঃ ভেঙে হয় টুক্‌রো

টুকরো। নদী যখন পাহাড় থেকে বেরিয়ে অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে পৌঁছে তখন তার গতিবেগ তত প্রচণ্ড থাকে না। যে সকল পাথর অপেক্ষাকৃত ভারী সেগুলির চলা তখন বন্ধ হয়ে যায়—বন্যার পর বন্যায় তারা ক্রমশঃ আরো খণ্ডবিখণ্ড হয়। নদী ঢালু সমভূমিতে পৌঁছবার পরেও অসংখ্য ছোট ছোট পাথর স্রোতোবেগে চলতেই থাকে, কারণ নদীর গোড়ার দিকে স্রোতোবেগ ঝরনা-ধারার মত উদ্দাম না হলেও যথেষ্ট প্রবল। নদীর তলদেশ বেয়ে খটাখট ঠুকাঠুক করতে করতে চলে রাশি রাশি শিলা—বাঁকের পর বাঁক, ক্রোশের পর ক্রোশ তারা এভাবে চলতেই থাকে। এই একটানা চলা ও অনবরত ঘর্ষণের ফলে শিলারাশি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দানা দানা বালু ও মৃৎ-কণিকা তাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। খরস্রোতা নদীর তলদেশে এই সংঘট্টনক্রিয়া অবিরামগতিতে চলছে—পাথর কুটে সেখানে বালি ও মাটি তৈরি হচ্ছে। নদীর জল এতেই শুধু যে ঘোলা হয়ে উঠে তা নয়। বৃষ্টির জল চারদিক থেকে বহু পরিমাণ মাটি এবং অন্যান্য আবর্জনা নদীগর্ভে এনে ফেলছে। এর মধ্যে যেগুলি ক্ষার ও দ্রবণীয় পদার্থ সেগুলি দ্রব হয়ে জলের সঙ্গে মিশে যায়। বালুকণা, মাটি এবং অন্যান্য যে সকল জিনিষ দ্রবণীয় নয়, সেগুলি নদীর জলে মিশে জলকে ঘোলাটে করে এবং স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। যেগুলি অপেক্ষাকৃত ভারী জিনিষ, যেমন নুড়ি কিংবা টুকরো পাথর—সেগুলি নদীর তলদেশ বেয়ে আস্তে আস্তে গড়িয়ে যেতে থাকে। নদীর স্রোত যতক্ষণ প্রবল, ততক্ষণ সকলকেই সে সঙ্গে করে নিয়ে যায়, কিন্তু সম্মুখে এগুতে এগুতে নদী যতই সমুদ্রের নিকটবর্তী হয় ততই তার

বেগ কমতে থাকে—বোঝা বয়ে নেবার ক্ষমতাও হ্রাস পায়। বোঝা হালকা করবার জন্যে অপেক্ষাকৃত ভারী জিনিষগুলোকে নদী একে একে বিসর্জন দেয়—মন্দীভূত স্রোতের তলদেশে এবং তটভূমির পাশে পাশে সেগুলি জমা হতে থাকে।

নদী যখন এগুতে এগুতে একেবারে চেপটা সমভূমিতে এসে পড়ে তখন তার গতিবেগ হয় আরো মন্থর, তার গতিপথ হয় আরো আঁকা-বাঁকা। হেমন্তে জলধারা যখন বিশীর্ণ হয়ে পড়ে তখন বালু এবং সূক্ষ্ম মৃৎকণিকাও নদী আর বয়ে নিয়ে যেতে পারে না—কূলের পাশে পাশে জমা করতে থাকে। আমাদের দেশের প্রায় সকল নদীতেই তখন বিস্তর চর পড়ে। হেমন্তের দিনে নদী এভাবে বালুকাদা সব ঝেড়ে ফেলে বেশ পরিপাটি হয়ে সাগরসঙ্গমে উপস্থিত হয়। কিন্তু বর্ষায় আসে প্রবল বন্যা। তখন আর পরিপাটি রূপ নেই—পাহাড়ের চূড়াভাঙ্গা প্রস্তরকণা, সমভূমির তটভাঙা মৃত্তিকা—সব কিছু তখন আকুল আবর্তে ও ভীমগর্জনে সমুদ্রের দিকে ধাবমান। নদীর যেখানে মোহানা সেখানে উজানমুখী জোয়ার জল নদীজলের পথ রোধ করে দাঁড়ায় ;—নদীজল তখন অপেক্ষাকৃত ভারী বালুকণাগুলি সেখানেই জমা করে দেয়। এমনি করে নদীর মোহানায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠে ব-দ্বীপ। নদী-বাহিত সমস্ত পলিমাটিই কিন্তু নদীমুখে সঞ্চিত হয় না। যখন ভাঁটা আসে তখন ভাঁটার টানে নদীর ঘোলাজল সমুদ্রের অনেকটা ভিতরে প্রবেশ করে। সূক্ষ্ম মৃৎকণিকাগুলি নদীর মোহানা থেকে কয়েক মাইল দূরে গিয়ে তবে হয় ত সমুদ্রের তলদেশে আশ্রয়লাভ করে। মোহানার সব চেয়ে কাছে জমা হয় ছোট ছোট নুড়ি

পাথর এবং মোটাদানার বালু, তারপর সঞ্চিত হয় মিহিদানার বালু, সর্বশেষ কাদামাটি। এক একবারের বন্যায় যে পরিমাণ পলিমাটি এভাবে সঞ্চিত হয়, তাতে গড়ে উঠে একটি করে স্তর। পর পর বন্যায় এভাবে একের পর এক মাটির স্তর সমুদ্রের জলের নীচে গড়ে উঠে। বালু কিংবা কাদামাটির স্তর যে নির্ভাঁজ থাকে তা অবশ্য নয়। গাছপালার টুক্‌রা ও মৃত জীবজন্তুর বহু কঙ্কাল নদীর জলে ভেসে আসে এবং পলিমাটির স্তরে স্তরে ঠাঁই নেয়। কালক্রমে এগুলি অশ্মীভূত হয়। (পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। শুধু স্থলচর এবং নদীচর নয়, মৃত সামুদ্রিক জীবের কঙ্কালও একই সঙ্গে আশ্রয় নেয় এই পঙ্কসমাধিতে। সমসাময়িক নানাবিধ স্থলচর, নদীচর এবং সামুদ্রিক জীবজন্তু—সকলেরই অস্থি এভাবে সমুদ্রগর্ভে একই ভূস্তরে এসে শেষ শয্যা গ্রহণ করে। স্তরে স্তরে রচিত এবং নবসৃষ্ট এই মৃত্তিকা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে হয় ত জলের উপরে জেগে উঠে। ভাগীরথী ও মেঘনার মোহানায় এরূপ অনেক দ্বীপ ও চর্ আমরা দেখতে পাই। এক একটা বিস্তীর্ণ ভূভাগ এভাবে গড়ে উঠতে পারে। সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ এরূপ প্রণালীতে গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই নির্ঝঞ্ঝাট ধীরগতি সব সময়ে বজায় থাকে না। দুচার লাখ, দশ-বিশ লাখ, কিংবা হয়ত কোটি বছর পরে আসে মহাবিপর্যয়। তার কথা একটু পরেই হবে।

উপরে যা বলা হল তা থেকে বুঝা যাবে যে নদীর একটা প্রধান কাজ হচ্ছে পাহাড়পর্বত এবং সমস্ত উঁচু জায়গা ক্রমশঃ ক্ষয় করে নিয়ে অপেক্ষাকৃত নীচু জায়গাগুলি এবং সমুদ্রগর্ভ ভর্তি করা।

ওদিকে সমুদ্র নিজেও বেলাভূমিতে তরঙ্গাঘাতের দ্বারা অনবরত চেষ্টা করছে স্থলভাগকে ক্রমশঃ গ্রাস করে নিতে। এই কাজ অনেক লক্ষ কিংবা কোটি বছর ধরে অব্যাহতগতিতে চলতে থাকলে সমস্ত জলস্থল একাকার হয়ে যাবে—পাহাড়-পর্বত, মালভূমি প্রভৃতি পরিণামে কিছুই থাকবে না, ভূপৃষ্ঠ সর্বত্র নাতিগভীর জলে ঢেকে যাবে,—পৃথিবী হবে জলে জলময় এবং বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু বস্তুতঃ এরকম হবার সম্ভাবনা নাই। এরকম অবস্থায় পৌঁছবার উপক্রম ঘটলেই বিপর্যয়ের কারণও সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে পৃষ্ঠশৈলের অভ্যন্তরে ভূগোলক তরল কিংবা অর্ধতরল পদার্থে পরিপূর্ণ। পৃষ্ঠশৈল যতক্ষণ ভূগর্ভের সব দিক থেকে সমানভাবে চাপ দেয় ততক্ষণ কোন বিপত্তি ঘটে না। কিন্তু পৃথিবীর স্থলভাগ ক্রমশঃ ক্ষয় হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পড়তে অবশেষে এমন এক মুহূর্ত উপস্থিত হয় যখন ভূপৃষ্ঠের ভারসাম্য আর বজায় থাকে না। তখন ভূগর্ভের তরলরাজ্যে শুরু হয় মহা-কম্পন। সেই মহাকম্পনের বেগ পৃথিবীর পৃষ্ঠশৈলকে নানাদিকে বিপর্যস্ত করে তুলে। প্রবল ভূমিকম্পে পৃথিবী মুহুর্মুহু কম্পিত হয়; কোন মহাদেশ হয় ত অতল সলিলে ডুবে যায়, অপর কোন স্থানে হয় ত সমুদ্রের তলদেশ মাথাঝাড়া দিয়ে উঠে এবং উত্তুঙ্গ পর্বতমালার সৃষ্টি করে। সেই মহাপ্রলয়ের সময়ে এত বেশী উত্তাপ ভূগর্ভ থেকে পৃষ্ঠশৈলের ফাটল দিয়ে বের হয় যে নদীর মোহানায় ও সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত পলিমাটি সেই প্রচণ্ড উত্তাপ ও প্রবল চাপে পাষাণে রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর বড় বড় পর্বতমালা ও

মহাদেশগুলির এইরকমভাবেই উৎপত্তি-বিনাশ হয়েছে; ভূপৃষ্ঠের বৈচিত্র্যও এই কারণে চিরকাল ধরে বজায় রয়েছে। একথা যে শুধু অনুমান তা নয়,—পৃথিবীর শৈলমালার গায়ে গায়ে জাজ্বল্যমান হয়ে আছে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিমালয় পর্বতের কথা বলা যেতে পারে। ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে এই পর্বতমালাতে পরিষ্কার স্তরবিন্যাস রয়েছে। সমুদ্রের তলদেশে পলিমাটি ও কঙ্করের আস্তরণ যেমনভাবে পড়ে ও যেভাবে স্তর-বিন্যস্ত হয়, হিমালয়ের গায়ে আমরা ঠিক তেমনি ধারা দেখতে পাই। আর শুধু কি তাই,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট, শামুক প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে বড় বড় সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল হিমালয়ের পাষাণস্তরে নিহিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। আগাগোড়া ভাল করে লক্ষ্য করলে এবিষয়ে কারো মনে সন্দেহ থাকতে পারে না যে সমুদ্রের তলানি মাথাঝাড়া দিয়ে ঊর্ধ্বে উঠেছে এবং পর্বতশ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। পর্বতের ঢেউ-খেলানো রূপও এই সিদ্ধান্তের পোষকতা করে। ঢেউয়ের উঁচুনীচু সকল অংশের ভিতর দিয়েই দেখা যায় যে স্তরগুলি ঠিক একই রকম ভাবে সাজানো রয়েছে। কতকগুলি টিনের পাত উপর্যুপরি সাজিয়ে সবগুলিকে যদি বলপ্রয়োগের দ্বারা একসঙ্গে ঢেউ-খেলানোভাবে বেঁকিয়ে দেওয়া যায় তা হলে সেই অবস্থায়ও পাতগুলিকে দেখা যাবে—একের উপর এক ঠিক পূর্ব্ববৎ সাজানো রয়েছে। পর্বতমালাতেও দেখা যায় যে উহার ঢেউখেলানো রূপ সত্ত্বেও স্তরবিন্যাস আগাগোড়া—অর্থাৎ উঁচুনীচু সর্বত্র—বজায় রয়েছে। প্রবল ভূকম্পনে কোথাও হয় ত কিছু কিছু ছিন্নভিন্ন হয়েছে;

কিন্তু কল্পনানেত্রে সেই ছিন্নসূত্র অনায়াসেই জোড়া লাগানো যায়।

পৃথিবীর পৃষ্ঠশৈলকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১)আগ্নেয়শিলা [igneous rocks] ও (২) পাললিক শিলা [sedimentary rocks]

আগ্নেয়শিলা আগ্নেয়গিরির মুখে উত্তপ্ত গলিত অবস্থায় নিঃসৃত হয়েছিল। লাভা (Lava) ও ব্যাসাল্ট্ (Basalt) এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বৈশিষ্ট্য এই যে এগুলো ওজনে খুব ভারী এবং এদের রং কালো। এগুলোতে কোন স্তরবিন্যাস দেখতে পাওয়া যায় না। আগ্নেয়শিলার নীচেকার অংশ কখনো কখনো কেলাসিত অর্থাৎ দানা-দার হয়ে থাকে, কিন্তু উপরিভাগ সাধারণতঃ মসৃণ। সমুদ্রের তলদেশে যে শিলা আছে তা প্রায়শঃ এই শ্রেণীর। পৃথিবীর স্থলভাগেও স্থানে স্থানে আগ্নেয়শিলার আবরণ আছে বটে, কিন্তু খুব বেশী নয়।

আগ্নেয়শিলাকে বলতে পারি আমাদের 'মাটির পৃথিবী'র আদিম উপাদান। পৃথিবী শীতল হয়ে তার গায়ে যখন প্রথম কঠিন আবরণ পড়েছিল তখন সেই আবরণের সবটাই ছিল আগ্নেয়শিলা। কালক্রমে ভূপৃষ্ঠে বারিপাত আরম্ভ হল। তখন আগ্নেয়শিলা বৃষ্টির জলে ধুয়ে ধুয়ে সমুদ্রের তলানিরূপে সঞ্চিত হল। সেই তলানি আবার কালক্রমে পাললিক শিলাতে (Sedimentary Rocks) রূপান্তরিত হ'ল। পাললিক শিলা থেকে আবার পলল, তা থেকে আবার শিলাময় পাহাড়-পর্বত,—এই চক্রের বর্ণনা একটু আগে দেওয়া হয়েছে। পাললিক শিলার প্রধান বৈশিষ্ট্য—স্তরবিন্যাস। স্তরের হিসাব করে

এর পৌর্বাপর্য এবং বয়স নির্ণয় করা যায়। এজন্য ভূবিদ্যা ও প্রাণি-বিদ্যার তথ্যানুসন্ধানে এবং সম্বন্ধ-বিচারে পাললিক শিলার মূল্য খুব বেশী।

আগ্নেয় এবং পাললিক ছাড়া আরেকশ্রেণীর শিলা আছে; তার নাম 'পরিবর্তিত' শিলা (Metamorphic Rocks)। সুদূর অতীতে ধরিত্রী মুহুর্মুহু কম্পিত হয়ে যখন পর্বত সৃজন করেছিলেন তখন সেই তোলপাড় কাণ্ডের বিষম চাপে ও উত্তাপে কোন কোন স্থলে পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর প্রস্তরের রকম ও গঠন একেবারে বদলে গিয়েছিল। তা থেকেই নাম হয়েছে 'পরিবর্তিত' শিলা। চূণাপাথর এই প্রণালীতে রূপান্তরিত হয়েছিল মার্বেল অথবা মর্মরপ্রস্তরে। এই প্রণালীতেই বেলেপাথর থেকে তৈরি হয়েছিল স্ফটিক-প্রস্তর (Quartzite)।

(৪) কেন্দ্রীয়মণ্ডল

অশ্মমণ্ডলের নীচে থেকে শুরু করে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত যে গোলক তাকে বলা হয় কেন্দ্রীয়মণ্ডল। এর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পুরাপুরি অনুমানলব্ধ, প্রত্যক্ষ মোটেই নয়। পুরাণে ও রূপকথায় যদিও পাতালপুরীর বর্ণনা আছে, এবং জুল্‌স্‌ ভার্ণে যদিচ 'পাতাল ভ্রমণের বৃত্তান্ত' লিখেছেন, তবুও এটা সত্য যে আজ পর্যন্ত মানুষ মাটির নীচে বেশীদূর যেতে সমর্থ হয় নি। বিবিধ প্রকারের খনির মধ্যে সোণার খনিই সব চেয়ে গভীর; কিন্তু তার ভিতরেও মানুষ মাইল দুয়ের বেশী গভীরতর প্রদেশে যায় নি। মাটির নীচে যতই যাওয়া যায় ততই গরম বাড়তে থাকে। মোটামুটি হিসাবে পৃষ্ঠশৈলের প্রতি

৬০ ফুটে ১°F করে উত্তাপ বাড়ে। যদি কেন্দ্রীয়মণ্ডলেও এই হারে উত্তাপ বাড়ে, তবে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের উত্তাপ দাঁড়াবে ৩৫০,০০০°F। কিন্তু কেন্দ্রের উত্তাপ বস্তুতঃ এত বেশী হতে পারে না, যেহেতু পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের তরল ও অর্ধতরল পদার্থ সর্বত্র প্রায় সমতাপবিশিষ্ট বলে অনুমান করবার যথেষ্ট হেতু আছে।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ভূকম্পন মাপবার যন্ত্র "সিজ্‌মোগ্রাফ" Seismograph আবিষ্কৃত হয়। তখন থেকে কেন্দ্রীয়মণ্ডলের উপাদান, ঘনত্ব, স্থিতিস্থাপকত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য ক্রমে ক্রমে সংগৃহীত হচ্ছে। ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে ভূকম্পনের বেগ যে গতিতে ও প্রণালীতে চলে তার হিসাব করে এ-সকল তথ্য নির্ণীত হয়। কেন্দ্রীয়-মণ্ডলের গঠনসম্পর্কে যা জানা গিয়েছে তার একটা আভাস এই অধ্যায়ের শেষে নক্সাতে দেওয়া হল।

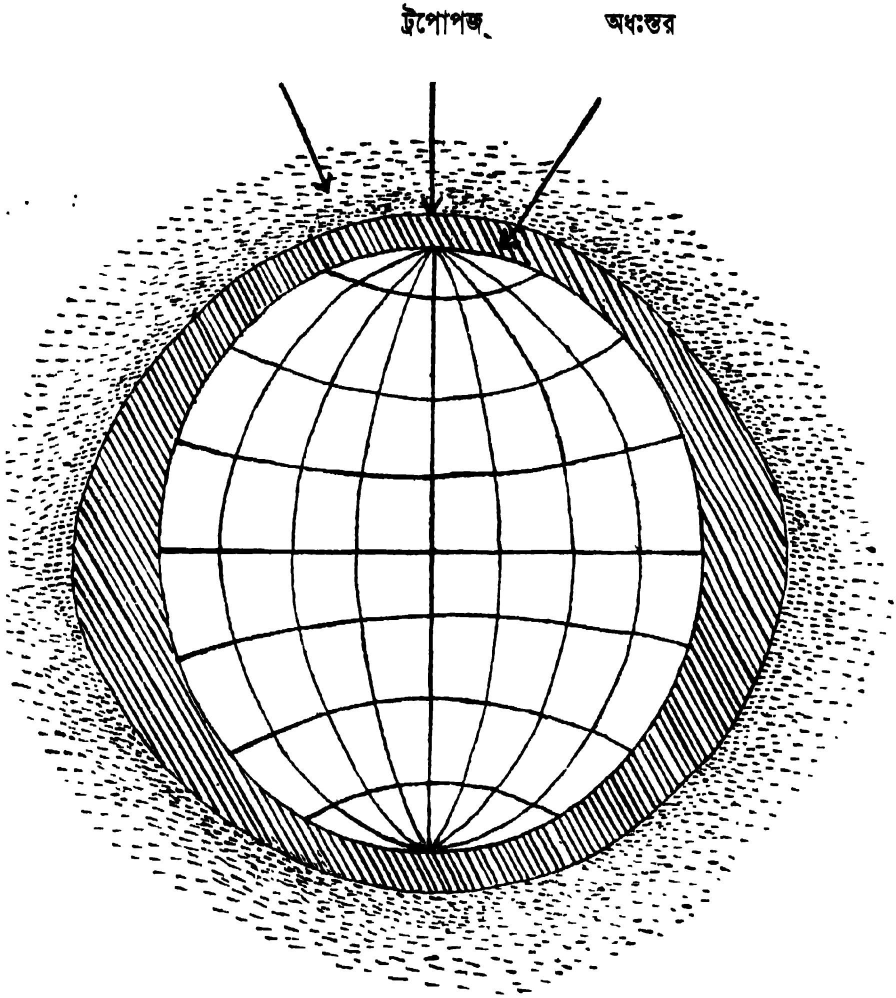
শস্যশ্যামলা, কাননকুন্তলা, পুষ্পপল্লবে পরিশোভিতা, মলয়ানিল-সেবিতা মা ধরিত্রীর বুকের উপর বাস করে আমরা ভুলে যাই মায়ের বুকের ভিতর কি আগুন অহর্নিশ জ্বলছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং ভূমিকম্প আমাদিগকে মাঝে মাঝে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভারতবর্ষে বর্তমানে কোন আগ্নেয়গিরি নাই; কিন্তু বহু পূর্বে অবশ্য ছিল। দাক্ষিণাত্যের কতক স্থান আগ্নেয়গিরির মুখনিঃসৃত গলিত পাষাণে তৈরি। বেরার প্রদেশে এখন যেটা লোণার হ্রদ, সেটা বস্তুতঃ একটা নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির মুখ-গহ্বর।

ভূতাত্ত্বিকদের মতে পৃথিবীর বড় বড় পর্বতশ্রেণীর মধ্যে হিমালয় পর্বতমালা বয়সে সব চেয়ে নবীন। হিমালয় এখনো পূর্ণবয়স্কের উচ্চতা

প্রাপ্ত হয় নি; তাই মাঝে মাঝে মাথা ঝাড়া দিয়ে আরো উঁচু হবার চেষ্টা করে। তার ফলে উত্তরভারতে ঘটে প্রবল ভূমিকম্প। আধুনিক কালে ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও আসামে প্রবল ভূমিকম্প হয়ে অনেক ধন-প্রাণ বিনষ্ট হয়েছিল। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দের বিহার ভূমিকম্পে লক্ষাধিক এবং ১৯৩৬ খৃস্টাব্দের কোয়েটা ভূমিকম্পে হাজার হাজার লোক মারা গিয়েছিল। ধন-সম্পত্তির যে কত ক্ষতি হয়েছিল তার ত ঠিকঠিকানাই নাই।

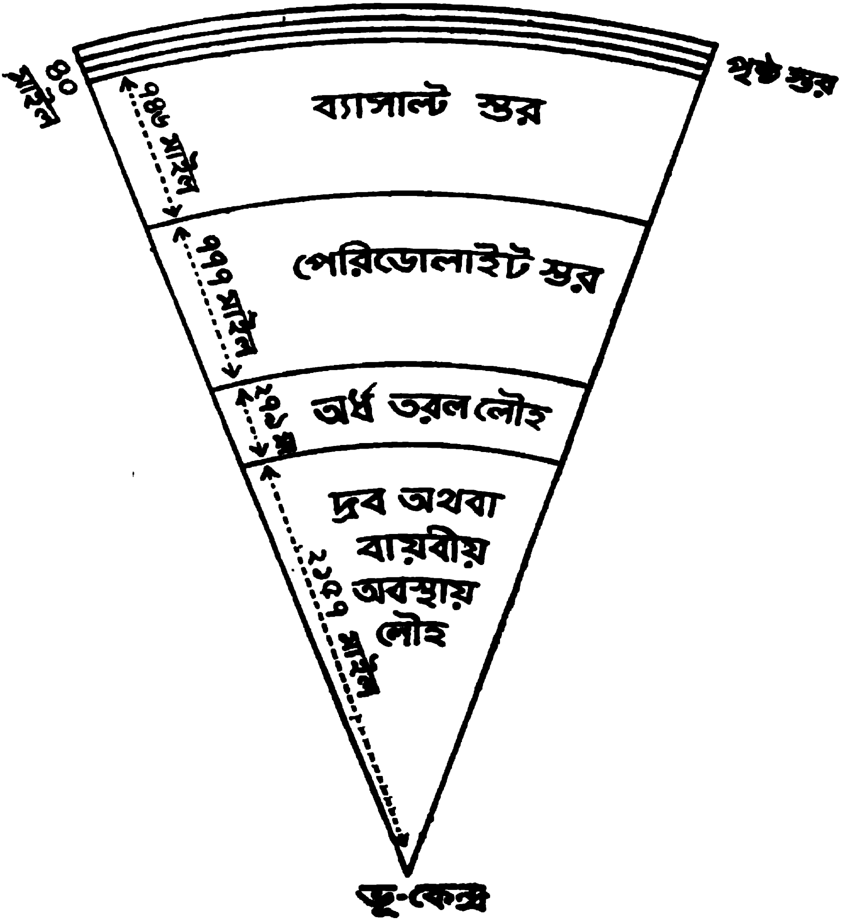
চারদিকে মহাশূন্য, অন্তরে মহাবহ্নি—এই ত পৃথিবী যার পিঠে আমাদের বাস। আমাদের পায়ের নীচে যে মাটি,—যার উপর কত অক্ষয় সৌধ গড়বার চেষ্টা মানুষ করেছে ও করছে—তাও নিত্যপরিবর্তনশীল, দোলায়মান, এবং কখনো বা টলায়মান। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের বহু পরিবর্তন হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এক মহাদেশ জলের নীচে ডুবে যাবে, আরেক নূতন মহাদেশ মাথা তুলবে। কিন্তু মানুষ এ সকল দেখে শুনে এবং জেনে বুঝেও ভয় পাবার পাত্র নয়। 'আমি' যে অজর এবং অমর, এ জ্ঞান তার স্বতঃসিদ্ধ। তাই সে এই বিরাট বিশ্বের এক কোণে বসে উহার রহস্য-নির্ণয়ে ব্যাপৃত, উহার ভাঙ্গাগড়ার খেলাতেও সে মশগুল।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল

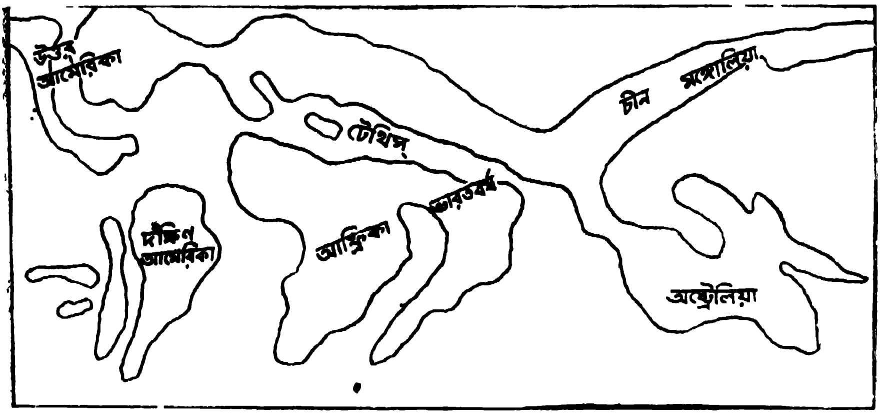


উর্ধ্বস্তর ও অধঃস্তর—এই দুটি স্তরে বায়ুমণ্ডল বিভক্ত। ট্রপোপজ্ নামক কল্পিত তল এই দুই স্তরকে পৃথক্ করেছে। পৃথিবীর তুলনায় অধঃস্তরের প্রকৃত আয়তনকে ছবিতে অনেকগুণ বড় করে দেখানো হয়েছে।

পৃথিবীর আভ্যন্তরিক গঠন



১০ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর আনুমানিক রূপ

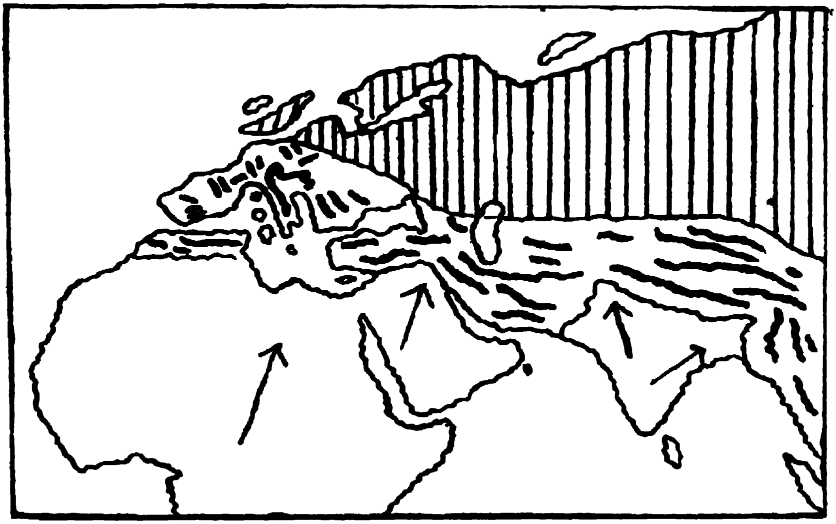


মানচিত্রে ইউরেশিয়া ও আফ্রিকা-ভারতবর্ষের মাঝখানে 'টেথিস্' নামে এক সমুদ্রের খাড়ি দেখা যাচ্ছে। এরি কতকস্থান এখন আল্পস্-হিমালয় পর্বতমালা, অপর কতক অংশ ভূমধ্য-মহাসাগর।

এখন যেখানে ভারতীয় উপদ্বীপ তার দক্ষিণ-পশ্চিমে এক বিরাট ভূভাগ ছিল। পরে উহা ভারত মহাসাগরের জলে ডুবে গিয়েছে। এই ডুবে-যাওয়া ভূভাগের নাম দেওয়া হয়েছে 'গণ্ডোয়ানা'। এক সময়ে উহা সম্ভবতঃ দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

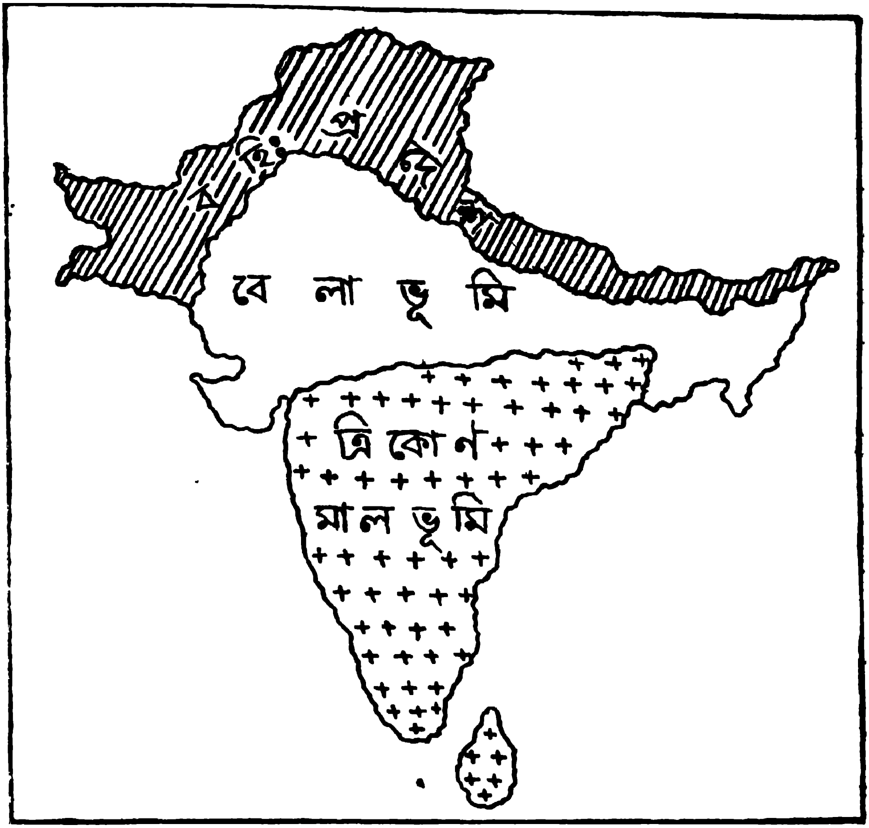
ইউরোপ ও উত্তর-আমেরিকার সংযোগকারী আরেক ভূভাগ আটলাণ্টিকের গর্ভে বিলীন হয়েছে, বর্তমান আয়র্লণ্ড তারি অবশেষ। এই জলমগ্ন ভূখণ্ড 'আটলাণ্টিস্' নামে খ্যাত।

আল্‌স্‌-হিমালয় পর্বতমালার জন্ম



প্রলয়ঙ্কর ভূকম্পনে উত্তর ও দক্ষিণ দিক্‌ থেকে দুই বিরাট ভূভাগ পরস্পরের নিকটবর্তী হতে থাকে। সেই তোলপাড়কাণ্ডের ফলে তাদের মধ্যবর্তী কতক স্থলভাগ বসে গিয়ে সমুদ্রের নীচে চলে যায়,—অপর অনেক নিম্ন অথবা জলমগ্ন স্থান ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উত্তুঙ্গ পর্বতমালার সৃষ্টি করে। ইহাই দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত আল্‌স্‌-হিমালয় পর্বতমালার জন্মকথা। ভারতীয় উপদ্বীপের বেলাভূমি ঐ সময়েই বসে গিয়েছিল।

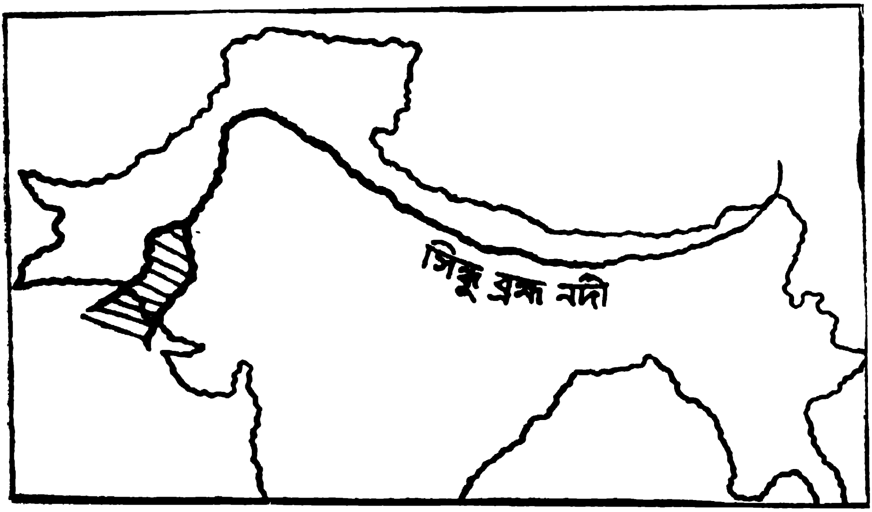
ভারতবর্ষের মাটি



ভূতাত্ত্বিক বিচারে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত ;—যথা ত্রিকোণ মালভূমি, বেলাভূমি, ও বহিঃপ্রদেশ। দাক্ষিণাত্যের ত্রিকোণাকার মালভূমিই ভারতবর্ষের সব চেয়ে প্রাচীন মাটি। উহা বস্তুতঃ এক বৃহত্তর ভূখণ্ডের মগ্নাবশেষ। 'বেলাভূমি' ছিল ত্রিকোণাকার মালভূমির তটদেশ, তার উত্তরে ছিল 'টেথিস'। 'বেলাভূমি' একবার বসে গিয়ে পুনরায় ভরট হয়েছে। 'বহিঃপ্রদেশ' পর্বতময়, উহা ভারতীয় উপদ্বীপের বাইরের এলাকা।

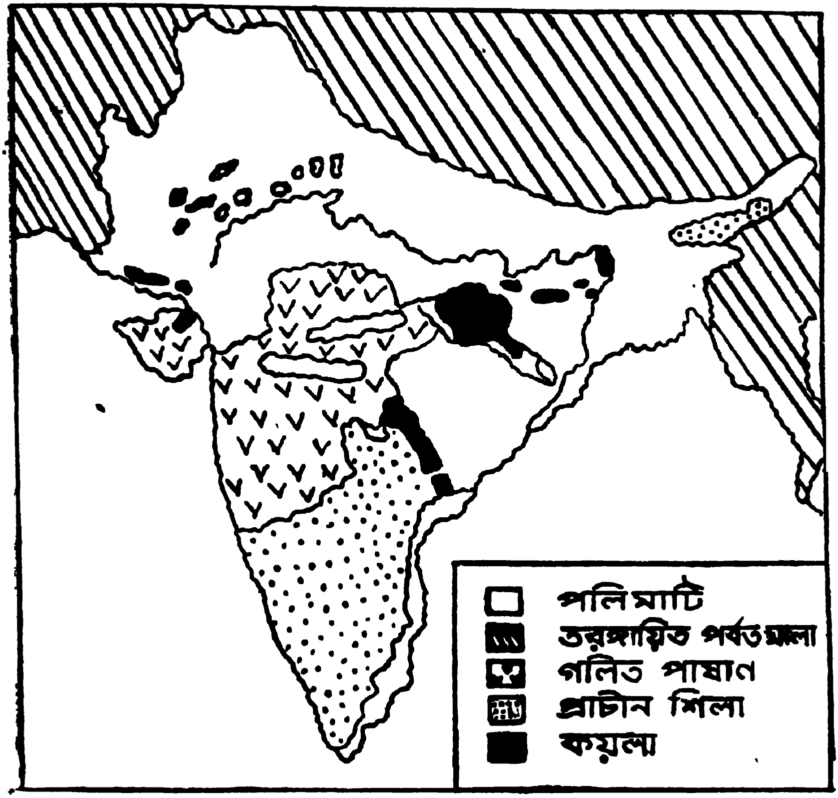
সিন্ধু-ব্রহ্ম নদীর গতিপথ

পাস্কোর (Pascoe) নির্ধারণ অনুযায়ী



বিশাল সিন্ধু-ব্রহ্ম নদী হিমালয়ের পাদদেশ দিয়ে ভারতবর্ষের পূব থেকে পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহার পলিমাটি দিয়েই ডুবে-যাওয়া বেলাভূমি ক্রমশঃ ভরাট হয়েছে এবং উত্তর-ভারতের সমভূমি গড়ে উঠেছে। এই বিরাট নদী কালক্রমে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে সিন্ধু, গঙ্গা-যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র—এই তিন বিভিন্ন নদীমালায় পরিণত হয়েছে।

ভারতবর্ষের ভূতাত্ত্বিক গঠন



বহিঃপ্রদেশের সবটাই পাললিক-শিলায় গঠিত এবং তরঙ্গায়িত পর্বত-মালা। উত্তর-ভারতের সমভূমি নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে তৈরি। দাক্ষিণাত্যের কতক অংশ আগ্নেয়গিরির গলিত পাষাণ, অপর কতক অংশ প্রাচীন শিলায় গঠিত।

জীবজগতের অভিব্যক্তি

জড় ও জীবের তুলনা করলে আমরা জীবজগতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। জীবের জন্ম, বৃদ্ধি, ও মৃত্যু আছে। বীজ থেকে অঙ্কুর জন্মে; মাটির রস ও বাতাস থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে অঙ্কুর ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু এই বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। প্রত্যেক চারা-গাছ তার স্বজাতির জন্য নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে আর বেশী বড় হতে পারে না। একটা ধানগাছ একটা তালগাছের মত প্রকাণ্ড কখনো হয় না। প্রাণিজগতেও ঠিক তাই। একটা বিড়াল কখনো সিংহের মত বড় হয় না। গাছপালা হোক কিংবা জীবজন্তু হোক,—তা নিজের পূর্ণ পরিণতি লাভ করবার পরেই ক্রমশঃ জরাগ্রস্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু মরবার আগে বীজ অথবা সন্তানসন্ততি উৎপাদনের দ্বারা বংশরক্ষার ব্যবস্থা করে। অতএব জীবজগতে আমরা দেখতে পাই যে জন্ম, খাদ্যসংগ্রহ, খাদ্যের আত্তীকরণ, দেহের পোষণ, বংশ-বিস্তার ও অবশেষে মৃত্যু—এই কটি ব্যাপার বিশেষভাবে বিদ্যমান।

খাদ্যের আত্তীকরণ ব্যাপারটা আরেকটু বুঝিয়ে বলা দরকার। নড়া-চড়া ও পরিশ্রমের ফলে আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এরূপ ক্ষয় পূরণ করবার জন্য এবং দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণী খাদ্যসংগ্রহ করে। সমস্ত ভুক্ত বস্তুকে হজম করে তারা যতটুকু সম্ভব নিজের দেহের সামিল করে ফেলে; যেটুকু ভোক্তার দেহের সামিল

হয় না, সেটুকু মলমূত্র প্রভৃতি রূপে বেরিয়ে যায়। বিভিন্ন গাছপালার এবং বিভিন্ন প্রাণীর দেহকোষের মধ্যে পার্থক্য আছে। পেঁয়াজের দেহকোষ এবং আলুর দেহকোষ এক রকম নয়। একই জমি থেকে পেঁয়াজের ও আলুর গাছ নিজেদের পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করলেও সেই উপাদানকে প্রত্যেকে নিজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথক ধরণের কোষে রূপান্তরিত করে। মানুষে শাকসব্জী খায়, গরুতেও খায়,—মানুষে মাছ মাংস খায়, কুকুর বিড়ালেও খায়;—কিন্তু এই একই প্রকার খাদ্য থেকে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশিষ্ট ধরণের দেহকোষ তৈরী করে নেয়। প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণী ভুক্তদ্রব্যগুলিকে ভেঙ্গেচুরে নিজ নিজ দেহের উপযোগী করে নূতন করে গড়ে নেয়। 'প্রোটিন' মানবশরীরের একটি উপাদান; কিন্তু উদ্ভিদের প্রোটিন এবং অন্যান্য প্রাণিদেহের প্রোটিন এক রকম নয় এবং কোনটিই আবার ঠিক মানবদেহের প্রোটিনের মত নয়। আমরা যখন ভাত, রুটি, শাকসব্জী, এবং মাছ মাংস ইত্যাদি খাই তখন সেগুলির অন্তর্গত বিভিন্ন রকম প্রোটিনকে ভেঙ্গে চুরে আমাদের দেহের বিভিন্ন রকম কোষের উপযোগী করে নূতন ভাবে গড়ে নিই। এরি নাম আত্তীকরণ। ইহা প্রাণশক্তিরই একটা খেলা। আমরা দেখতে পেলাম যে আত্তীকরণের দুটি দিক আছে। প্রথমতঃ একই রকম খাদ্যবস্তু বিভিন্ন উদ্ভিদ কিংবা বিভিন্ন জীবের দেহে ভিন্ন ভিন্ন রকমের দেহকোষে পরিণত হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ ভিন্ন ভিন্ন ভুক্তদ্রব্য থেকে প্রাণিবিশেষের দেহে একই রকম দেহকোষ তৈরি হচ্ছে।

জড়জগতে আত্তীকরণের অস্তিত্ব নেই। কাঠে কাঠে, কাঠে চামড়ায়,

কাঠে কাগজে—জোড়া লাগানো যায় বটে ; কিন্তু তাতে আত্তীকরণের ব্যাপার ঘটে না। কতক জিনিষ একত্র করলে রাসায়নিক ক্রিয়া হয়—যেমন জলে-লবণে কিংবা চূণে-হলুদে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই না যে একটি দ্রব্য অপরটিকে ঠিক ঠিক আত্মসাৎ করে ফেলেছে। লবণ যদি জলেতে গলে অদৃশ্য হয়ে যায়, তবুও জলকে সে নোনতা করে ছাড়ে। জল লবণকে ঠিক আত্মসাৎ করতে পারে না,—লবণ দ্রব হলেও লবণের ঠিক জলীকরণ হয় না।

উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের মধ্যে আত্তীকরণ ব্যাপারে সামান্য একটু তফাৎ আছে। অঙ্গারের (Carbon) পরমাণুর মিলন-মিশ্রণে যে সকল জটিল অথবা মিশ্রদ্রব্যের (Complex Substance) সৃষ্টি হয়, তাদের বলা হয় 'জৈব' পদার্থ। এটা একটা পারিভাষিক শব্দ। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ প্রায় ষোল আনা এই শ্রেণীর পদার্থে নির্মিত এবং এই কারণেই এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'জৈব' পদার্থ। মানুষ এবং ইতর প্রাণী অজৈব পদার্থ থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ পুষ্টিসাধন করতে পারে না ; কিন্তু উদ্ভিদ তা পারে। মাটির রসে গলিত নানা-বিধ লবণ এবং বাতাসের গ্যাস প্রভৃতি অজৈব পদার্থ থেকে উদ্ভিদ নিজের পুষ্টিসাধন করে, এবং আপন শরীরে সেগুলিকে জৈব পদার্থে পরিণত করে। তাই নানাবিধ শাকসব্জী, ফলমূল, ও ঘাসপাতা খেয়ে মানুষ ও অপর সমস্ত জীবজন্তু প্রাণধারণ করতে পারে। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি শুধু মাংসাশী জীবেরাও এমন সব প্রাণীকে আহার করে যারা তৃণভোজী, যেমন হরিণ, ভেড়া, মোষ, গরু প্রভৃতি। অতএব মূলতঃ উদ্ভিদ-জগতের উপর নির্ভর করেই

প্রাণিজগৎ টিকে রয়েছে। একথা জলচর প্রাণিবর্গের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। জলচর প্রাণিবর্গের খাদ্য-সম্ভাররূপে জলে অসংখ্য উদ্ভিদ জন্মে। মহাসমুদ্রের সুনীল জলরাশিতে সূক্ষ্ম উদ্ভিদাণু (Protophyta) অহরহ উৎপন্ন হচ্ছে, খালি চোখে যদিচ এদের প্রায়শঃ দেখা যায় না। অতিক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণিবর্গ সেগুলিকে আহার করে। তারা আবার নানাবিধ জলৌকা ও মাছের পেটে যায়। ছোট ছোট মাছ আবার অপেক্ষাকৃত বড় মাছগুলির আহার্য। এইভাবে ভক্ষ্য ভক্ষক সারি বেঁধে চলেছে। কিন্তু নগণ্য জেলিফিশ থেকে অতিকায় তিমিমাছ পর্যন্ত সমস্ত জলচর জীবকে বেঁচে থাকবার জন্যে মূলতঃ নির্ভর করতে হচ্ছে জলে জায়মান অসংখ্য উদ্ভিদাণুর উপর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উদ্ভিদ না থাকলে কি স্থলচর, কি জলচর কোনপ্রকার প্রাণীই জীবনধারণ করতে পারে না। উলটা দৃষ্টান্ত দু'একটা আছে। এমন গাছপালাও আছে যারা কীটপতঙ্গ প্রভৃতি আহার করে। এগুলি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে আরেকটা পার্থক্য সাধারণতঃ এই যে উদ্ভিদ নিজের চেষ্টায় ও নিজের ইচ্ছায় নড়াচড়া করতে পারে না; প্রাণীরা তা পারে। কিন্তু এই পার্থক্য সব ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে সামুদ্রিক প্রবাল ও স্পঞ্জ। এরা বস্তুতঃ প্রাণী; কিন্তু গাছপালার মতই এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকে, চলে বেড়াবার ক্ষমতা এদের নাই। সমুদ্রের জল নিজ দেহের ভিতর দিয়ে স্রোতের মত চালিয়ে দেবার এক বিস্ময়কর ক্ষমতা এদের আছে। সেই স্রোতে যে সকল খাদ্যকণা বয়ে আসে, তা দিয়ে এরা

জীবনধারণ করে। সমুদ্রের একটি অদ্ভুত জীব হচ্ছে 'আডামসিয়া প্যালিয়েটা' Adamsia palliata (sea-anemone)। কখনো কখনো মড়া শামুকের খোলের ভিতরে কাঁকড়া বাসা বাঁধে। শামুকের খোল কাঁকড়ার গায়ের উপরে একটা আবরণের মত একেবারে জুড়ে যায়। কাঁকড়া যখন চলাফেরা করে শামুকের খোলটিও তখন সঙ্গে সঙ্গে চলে। আডামসিয়া জীবটি এরূপ কুলীরক-বাহনযুক্ত শামুকের খোল দেখতে পেলে তার উপর বেশ করে চেপে বসে—সিন্দবাদ নাবিকের ঘাড়ে যেমন দৈত্য বসেছিল। কাঁকড়ার সাধ্য নাই যে তাকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। কাঁকড়ার পিঠে চড়ে আডামসিয়া ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় এবং সুবিধামত খাদ্যসংগ্রহ করে। প্রচলিত ভাষায় এই পরের-বোঝা-বহন-কারী কাঁকড়াটিকে বলা হয় 'সাধু বাবাজী' (Hermit Crab)। আডামসিয়া প্রাণী হলেও তার নিজের চলচ্ছক্তি নাই; কিন্তু পরের কাঁধে চড়ে ঘুরে বেড়াবার কৌশলটুকু তার খুবই জানা আছে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্যের বিষয় মোটামুটি বলা হল। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যতই থাকুক উভয়েই প্রাণবন্ত; এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী এ দুজগতেই বৈচিত্র্যের সীমা নাই। সাধারণতঃ আমরা ধরে নিই যে এই বৈচিত্র্য গোড়া থেকেই ছিল,—অর্থাৎ কোন সৃষ্টিকর্তা যদি কোন একটা বিশেষ সন তারিখে এই জগৎ-সংসার সৃষ্টি করে থাকেন, তবে নিশ্চয় সেই সময়েই তিনি রকমারি গাছপালা ও জীবজন্তু বানিয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশের ও ধর্মের পুরাণে এই ধরণের কথাই লিখা আছে। স্রষ্টার নামধাম এবং সৃষ্টির সনতারিখ সম্পর্কে মতভেদ

থাকলেও সমস্ত পৌরাণিক বিবরণেই মোটামুটি এ কথা দেখতে পাওয়া যায় যে সৃষ্টিকর্তা গোড়াতেই ভিন্ন ভিন্ন রকমের গাছপালা, ভিন্ন ভিন্ন জীবজন্তু, এমন কি ভিন্ন ভিন্ন জাতিবর্ণের মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন *।

বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের ফলে এই বিশ্বাসের ভিত্তি টলে গিয়েছে। জীববিজ্ঞানের এটাই এখন স্থির সিদ্ধান্ত যে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে যে বৈচিত্র্য আমরা দেখতে পাই তা ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়েছে; সৃষ্টির আদিতে এই বৈচিত্র্য ছিল না, এবং অকস্মাৎ উহা ঘটে নি।

জীবজগতে যেমন বৈচিত্র্য আছে, সাদৃশ্য ও তেমনি অনেক আছে। বৈজ্ঞানিকদের একটা প্রধান কাজ হচ্ছে বস্তুর শ্রেণী-বিভাগ করা;— আর শ্রেণী-বিভাগ করতে গেলেই বৈচিত্র্যের মধ্যে সাদৃশ্যকে খুঁজে বেড়াতে হয়। যে সকল বস্তু কিংবা প্রাণীর মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, শুধু তারাই এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য। উদ্ভিদ ও প্রাণি-জগতের শ্রেণী-বিভাগ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে যিনি প্রথম সুরু করেন তাঁর নাম কার্ল লিনিয়স্ (Carl Linnaeus—১৭০৭—৭৮)। ইনি ছিলেন সুইডেনের অধিবাসী। শ্রেণী-বিভাগ করতে গিয়ে প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর শারীরিক গঠন, জীবন-ধারণ-প্রণালী, ইত্যাদির খুঁটি-নাটি বিচার করতে হয়েছে। আর এই বিচারের ফলে এমন অনেক সাদৃশ্য ধরা পড়েছে যার কথা আগে কেউ কখনো ভাবতেও পারে নি। এই সকল সাদৃশ্যের বিচার ও আলোচনার

* সাধারণ্যে প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্বের কথাই এখানে বলা হচ্ছে, উচ্চাঙ্গের দার্শনিক সৃষ্টিতত্ত্বসমূহের কথা নয়।

ফলেই আবার অভিব্যক্তির সন্ধানও পাওয়া গিয়েছে। বুঝবার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ বলে প্রাণিজগতের অভিব্যক্তির কথাই এখানে বলা হবে। উদ্ভিদ-জগতেও অভিব্যক্তি হয়েছে এবং তার নিদর্শন ভূরি ভূরি রয়েছে; কিন্তু সেখানকার কারিগরি অধিকতর সূক্ষ্ম, অতএব বুঝবার পক্ষে তেমন সহজ নয়।

জীবজগতে আমরা নানারকমের সাদৃশ্য দেখতে পাই। ইঁদুর-ছুঁচো, চামচিকা-বাদুড়, বিড়াল-বাঘ-সিংহ, কুকুর-শেয়াল-নেকড়েবাঘ—প্রভৃতির দিকে তাকালেই একটা সাদৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে। গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া—এই চারটি জন্তুকে তুলনা করলে আমরা দেখি যে এই সব কটি জন্তু চতুষ্পদ, তৃণভোজী ও স্তন্যপায়ী। সবগুলিরই পায়ে ক্ষুর আছে, এবং সেই ক্ষুর দুভাগে খণ্ডিত। এদের শিং, কাণ, চোখ প্রভৃতি অবয়বের মধ্যেও সাদৃশ্য অনেক আছে,—আবার পার্থক্যও কিছু কিছু আছে। সবগুলিরই গায়ে লোম আছে, যদিও পশমের তারতম্য যথেষ্ট। এ সকল আংশিক মিল ও গরমিল দেখে একটা ধারণা আমাদের মনে সহজেই জন্মে যে হয় ত এদের আদিপুরুষ একই জানোয়ার ছিল; বিভিন্ন অবস্থায় পড়ে সেই আদি পুরুষের সন্তান-সন্ততি কালক্রমে পৃথক পৃথক রূপ ধারণ করেছে। এই চিন্তাপ্রণালীর সূত্র ধরে চার্লস ডারুইন নামক ইংরেজ বৈজ্ঞানিক (১৮০৯—১৮৮২) বহু গবেষণা ও তথ্যসংগ্রহ করেন। ডারুইনের আগেও অবশ্যি বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে একথা উঠেছিল যে হয় ত জীবজগতের (উদ্ভিদ + প্রাণী) নানা বৈচিত্র্য সহসা উৎপন্ন হয় নি, বহু যুগ ধরে ক্রম-পরিবর্তনের ফলে হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর আদিম যুগে এত রকমারি

গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী প্রভৃতি ছিল না—ক্রমে ক্রমে তাদের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু 'হয় ত' কথার উপর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত দাঁড় করানো যায় না। ডারুইনের কীর্তি এই যে ক্রমবিকাশ অথবা অভিব্যক্তির সুসম্বদ্ধ প্রমাণ তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন। ক্রমবিকাশ কিরূপে হয়েছে এবং হচ্ছে—তার একটা ব্যাখ্যাও ডারুইন দিয়েছিলেন। এই ব্যাখ্যার বিচার পরে করা হবে। জীবজগতের ক্রমবিকাশ যে একটা সত্যিকার ব্যাপার—তার প্রমাণের কথাই আমরা প্রথমে আলোচনা করব।

ডারুইনের সিদ্ধান্ত "অভিব্যক্তিবাদ" নামে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৮৫৯ খৃঃ) উহা প্রথম প্রচারিত হয়। তখন থেকে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাজগতে উহা অসীম প্রভাব বিস্তার করে আসছে। কেপলার, গ্যালিলিও, এবং নিউটনের আবিষ্কারের ফলে যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রচনা ও গঠন সম্পর্কে মানুষের ধারণা আমূল পরিবর্তিত হয়েছিল—তেমনি ডারুইনের আবিষ্কার ও মতবাদের ফলে জীবজগৎ ও মনুষ্যসমাজের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পরিবর্তন ও পরিণতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে।

ডারুইনের সময়ে ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতির তত উন্নতি হয় নি ; অতএব তখন তাঁর দেওয়া দৃষ্টান্তগুলিতে কিছু সন্দেহের অবকাশ হয় ত ছিল। কিন্তু ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ প্রথম ঘোষণা হবার পর থেকে বহু বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন, এবং ক্রমাভিব্যক্তির এত সব প্রমাণ এখন নানাদিক থেকে সংগৃহীত হয়েছে যে এর সত্যতা সম্পর্কে যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তির মনে আর কোন সংশয় থাকতে

পারে না। 'অভিব্যক্তিবাদ নিয়ে অনেক তর্কাতর্কি, অনেক বিতণ্ডা এমন কি আদালতে মামলা পর্যন্ত হয়েছে। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বকে বাঁচাতে গিয়ে গোঁড়া পাদ্রীরা এই মতবাদের উপর খড়গহস্ত। বাইবেলে ঈশ্বর নিজের ইচ্ছাক্রমে সমস্ত গাছপালা ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন। যদি বলা হয় প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা হতেই বিভিন্ন গাছপালা ও জীবজন্তুর অভিব্যক্তি হয়েছে তবে গোঁড়া পাদ্রীদের মতে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ভেসে যায়। এমন অনাসৃষ্টি কথা প্রচার করেছেন বলে অভিব্যক্তিবাদীদের উপর তারা হাড়ে হাড়ে চটা। কিন্তু এই উপায়ে বৈজ্ঞানিক সত্যকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে অভিব্যক্তি যে হয়েছে এবং হচ্ছে—এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিদের মধ্যে মতভেদ নাই। অভিব্যক্তির কারণ কি এবং প্রণালীই বা কি—এই নিয়ে এখনো যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে বটে; কিন্তু নিরপেক্ষ জ্ঞানী ব্যক্তিরা অভিব্যক্তির সত্যতা সম্পর্কে এখন আর মনে কোন সন্দেহ পোষণ করেন না।

অভিব্যক্তির বিভিন্ন প্রমাণ এখন সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে। বিষয়টি মনোযোগের সহিত অনুধাবন করতে হবে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ।—ভূস্তরের সাক্ষ্য ঃ—

পৃথিবীর কঠিন আবরণে পাললিক শিলার স্তরবিন্যাসের কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখমাত্র করেছি। এখানে এবিষয়ে আরেকটু বিশদভাবে বলতে হবে। স্তরে স্তরে বিন্যস্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠশৈল যেন একটি বিরাট গ্রন্থ, তার পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে জীবজগতের ইতিহাস। আরবী-ফার্সী বইগুলির ন্যায় এও যেন উলটা দিকে লেখা।

আরবী-ফার্সী কিতাব সোজা দিকে হাতে নিলে সব উপরে থাকে বইয়ের শেষ পৃষ্ঠা। তেমনি ভূপৃষ্ঠের সব উপরের স্তর হচ্ছে ধরিত্রী-গ্রন্থের সব চেয়ে নূতন পৃষ্ঠা। যতই নীচের স্তরে আমরা যাই ততই প্রাচীনতর লেখার সন্ধান পাই। সাধারণতঃ বইয়ের পাতাগুলি যেমন একের পর দুই, দুয়ের পর তিন—এরূপ ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকে,—বলা বাহুল্য ধরিত্রীগ্রন্থের পাতাগুলি সর্বত্র সেরূপ নিখুঁতভাবে সাজানো পাওয়া যায় না। অনেক পাতা হয় ত ছেঁড়া, কোন কোন পাতা হয় ত একেবারে নষ্ট কিংবা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কোন কোন জায়গায় পাতাগুলি উলট পালট হয়ে গিয়েছে, ক্রমিকভাবে সাজানো নেই। কোন কোন পাতা আবার কুঁচকে ভাঁজ হয়ে রয়েছে। এসকল অসুবিধা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকেরা ভূপৃষ্ঠের স্তরবিভাগ ও কাল-বিভাগ মোটামুটি নির্ণয় করতে পেরেছেন। তুলনামূলক বিচার ও অনুমানের সাহায্যে উহা সম্ভবপর হয়েছে।

ভূবিদ্যা অনুযায়ী পৃথিবীর পৃষ্ঠশৈলের বিভিন্ন স্তরের উৎপত্তি ও স্থিতিকাল বিচার করে এক প্রকার কাল-বিভাগ করা হয়েছে। বড় বড় বিভাগের নাম দেওয়া হয়েছে 'মহাযুগ' (Era)। প্রত্যেক 'মহাযুগ' আবার বিভিন্ন 'যুগে' (Epoch) বিভক্ত। প্রত্যেক 'যুগ' আবার কয়েকটি 'খণ্ডযুগে' (Sub-period) বিভক্ত। এক এক যুগে যে শৈলস্তর-সমূহ গঠিত হয়েছে তাকে বলা হয় 'মহাস্তর' (System)। যেমন ক্রিটেশিয়াস্ যুগে যে সকল শৈলস্তর গড়ে উঠেছিল সেগুলিকে একসঙ্গে বলা হয় 'ক্রিটেশিয়াস মহাস্তর' (Cretaceous System) প্রত্যেক মহাস্তরকে নানা স্তরে (Formations) বিভক্ত করা

হয়েছে। এরকমভাবে বিভাগ ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হয়ে গিয়েছে। সাধারণ বইয়ের যেমন খণ্ড, পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ, পৃষ্ঠা, প্যারাগ্রাফ প্রভৃতি বিভাগ আছে, তেমনি ধরিত্রীগ্রন্থও যেন ছোট বড় নানা ভাগে বিভক্ত। ভূবিদ্যা অনুযায়ী পৃথিবীর কালবিভাগের পরিচায়ক একটা তালিকা এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠশৈলের স্তরবিভাগ এবং বিভিন্ন স্তরের কালবিভাগ অথবা পৌর্বাপর্য জানবার পর যে বিষয়ে আমাদিগকে মনোযোগ দিতে হবে তা হচ্ছে এই যে বিভিন্ন স্তরগুলিতে অতীতকালের নানা জীবজন্তুর অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। মৃত জীবজন্তু কেমন করে এবং কি অবস্থায় রক্ষিত হয় তারও একটু আভাস এখানে দেওয়া দরকার। সাধারণভাবে দেখতে গেলে চক্রাকারে ঘুরপাক খাওয়াই হচ্ছে প্রকৃতির খেলা। মাটি, জল ও বাতাস থেকে আহার্য সংগ্রহ করে গাছপালা অর্থাৎ নানাবিধ ঘাস, শাকসব্জী, শস্য, ফলমূল প্রভৃতি জন্মাচ্ছে। সেগুলি খেয়ে মানুষ ও অন্যান্য ইতরপ্রাণী জীবনধারণ করছে। প্রাণিজগতে আবার পরস্পরকে খাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। জীবের আহার পরিপাক হয়ে কতক মলমূত্ররূপে মাটিতে ফিরে যায়, কতক জীবদেহে পরিণত হয়। জীবের মৃত্যুর পর তার শবদেহ গলে, পচে কিংবা ভস্মীভূত হয়ে আবার পঞ্চভূতে লয় পায়। অর্থাৎ বিশ্বপ্রাণের কোন রহস্যময় লুকোচুরি খেলায় জড়পদার্থ উদ্ভিদ দেহ ও প্রাণিদেহের ভিতর দিয়ে চক্কর খেয়ে পুনরায় জড়ে পরিণত হচ্ছে। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের জড় উপাদান এইভাবে বারংবার চক্কর খাচ্ছে; এই খেলার বিরাম নাই। অতএব স্বাভাবিক নিয়মে মৃত জীবজন্তু কিংবা উদ্ভিদের কোন চিহ্ন

থাকবার কথা নয়। কিন্তু কচিৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। বাতাসে, জলে, কিংবা মাটিতে যে সকল অসংখ্য জীবাণু রয়েছে তাদের সংস্পর্শে এলেই শবদেহ গলতে ও পচতে আরম্ভ করে। কোন কীটপতঙ্গ অথবা অন্য প্রাণীর দেহ যদি এমন ভাবে কোথাও প্রোথিত হয়ে পড়ে যে ধ্বংসের বীজাণুগুলি আর তার নাগাল না পায় তবে তা অবিকৃত অবস্থায়ই থেকে যায়। রজনের ভিতর রক্ষিত এরূপ কীটপতঙ্গ পাওয়া গিয়েছে। সাইবিরিয়াতে হাজার হাজার বছর আগেকার ম্যামথ এবং লোমশ গণ্ডারের শবদেহ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। অকস্মাৎ পাহাড় ধ্বসে গিয়ে কিংবা অপর কোন বিপর্যয়ে সেগুলি বরফ ও কাদামাটির মধ্যে ভয়ানক ভাবে চাপা পড়েছিল। জীবাণুর সংস্পর্শে না আসাতে শবদেহ বিন্দুমাত্র পচে নি, কিংবা গলে নি। কিন্তু মৃত প্রাণীর শবদেহ এরূপ অবিকৃত অবস্থায় দীর্ঘকাল রক্ষিত হবার দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল।

অতীতকালের জীবের আরেকটি পরিচয়-চিহ্ন হল মাটি কিংবা নরম পাথরের উপর অঙ্কিত ছাপ। কোন পশু-পক্ষীর মৃতদেহ কিংবা কঙ্কাল নরম জায়গায় পড়লে তার ছাপ সেখানে অঙ্কিত হয়। পরে একদিকে হয় ত নানা কীট ও জীবাণু শবদেহটিকে খেয়ে নিঃশেষ করে ফেললে, অপরদিকে মৃত্তিকা শুকিয়ে কঠিন হয়ে গেল। এই রকম করে খুব পরিষ্কার একটি ছাপ মাটির উপর তৈরি হল। যদি খনি, গুহাভ্যন্তর প্রভৃতি স্থানে এই ব্যাপার ঘটে তবে বহু সহস্র বৎসর পর্যন্ত ঐ ছাপ বৃষ্টিবাদলের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে টিকে থাকা সম্ভবপর। কিন্তু এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্তও খুব বেশী নয়।

মৃত জীবজন্তুর পরিচয় আমরা সাধারণতঃ এবং সবচেয়ে অধিক পরিমাণে পাই জীবাশ্ম, অর্থাৎ অশ্মীভূত কঙ্কাল থেকে। মৃত জীবের অস্থি (কিংবা দেহের অপর কোন কঠিন অংশ) ভূগর্ভে প্রোথিত থাকাকালে কণা কণা করে গলে বেরিয়ে যায়, এবং অনুকূল অবস্থানে থাকলে প্রত্যেক বেরিয়ে-যাওয়া অস্থিকণার স্থান পূরণ করে এক একটি অশ্মকণা (Mineral Substance)। এইরূপে ধীরে ধীরে একটি সমগ্র অস্থি কিংবা কঙ্কাল শিলীভূত হয়ে জীবাশ্মে পরিণত হয়। অতএব জীবাশ্ম জীবের আসল অস্থি নয়,—প্রস্তরনির্মিত নকল। আসলের একেবারে হুবহু নকল সকল ক্ষেত্রে না হলেও এই নকলের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকের কাজ খুবই চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই নকল কিন্তু আসলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখাটি পর্যন্ত বজায় রেখেছে দেখতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে যত জীব জন্মেছে এবং মরেছে তার অতি নগণ্য সংখ্যার কঙ্কালই অশ্মীভূত হয়েছে,—আর যেগুলি হয়েছে সেগুলিও সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মাটির নীচে বিভিন্ন স্তরে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। অতএব জীবাশ্ম খুঁজে বার করা খুব সহজ কাজ নয়। সাধারণতঃ খনি খুঁড়বার সময়েই এগুলি পাওয়া যায়। তা ছাড়া দৈবাৎ অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যেতে পারে। কোন কোন স্থানে রাশি-রাশি কঙ্কাল একসঙ্গে পাওয়া গিয়েছে। সুদূর অতীতে জীবজগতে যে সকল মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটেছিল তারই দুএকটির সাক্ষ্য আমরা পাই এ সকল কঙ্কালস্তূপের মধ্যে।

বহু বহু বৎসর পূর্বে মধ্য এশিয়ার কোন এক প্রকাণ্ড হ্রদের চারধারে ছিল নল-খাগড়া প্রভৃতিতে ঢাকা জলাভূমি। 'ম্যাস্টডন'

নামক লোমশ হাতী দলে দলে তার কিনারায় চরে বেড়াত। কালক্রমে জল শুকিয়ে হ্রদের পরিসর আস্তে আস্তে কমতে লাগল। তার ফলে কিনারার ঘাস পাতা শুকিয়ে যাওয়াতে হাতীর দলকে আহার্যের সন্ধানে ঢুকতে হল জলাভূমির আরো ভিতরে। কিন্তু সেখানে ছিল গভীর কাদামাটি। তৃণাচ্ছাদিত সেই মহাপঙ্কে একবার পা দিলে আর উঠবার যো ছিল না। এরকমভাবে শত শত, এমন কি হাজার হাজার ম্যাস্টডন বিনষ্ট হয়ে থাকবে। তাদের পুঞ্জীভূত কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে এযুগে।

কালিফোর্ণিয়ার 'লা ব্রিয়া' (La Brea) নামক স্থান এখন তৈলোৎপাদনের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। আজকাল সেখানে কত কলকারখানা ও আফিস বসেছে, এবং কত লোকজন বসবাস করছে। কিন্তু সুদূর অতীতে ওখানে জীবরাজ্যের এক অতি ভয়াবহ কাণ্ড ঘটেছিল। আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত আলকাতরা ছিল ওখানকার মাটির উপর ছড়িয়ে। আলকাতরার উপরিভাগে সরের ন্যায় স্তর পড়াতে বোধ হত যেন সমস্তটাই কঠিন ; কিন্তু বস্তুতঃ তা ছিল না। শুধু উপরকার পাতলা স্তরটি ছিল সামান্য পরিমাণে শক্ত, তার নীচেই ছিল নরম আলকাতরা। কোন প্রাণী একবার ওখানে পা দিলে আর রক্ষা ছিল না, নিজের দেহের চাপেই তাকে ক্রমশঃ তলিয়ে যেতে হত। আলকাতরার উপরে স্থানে স্থানে গর্তের মধ্যে বৃষ্টির জল জমে আবার টলমল করছিল। ঠিক সেই সময়ে চারদিকের প্রান্তরে অনাবৃষ্টির ফলে উপস্থিত হয় দারুণ জলকষ্ট। তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে অনেক জীবজন্তু ছুটে এল আলকাতরার উপরে সঞ্চিত সেই জলের লোভে। হাতী, ঘোড়া, বাইসন, হরিণ, শূওর, খরগোস, ছুঁচো প্রভৃতি নানারকমের তৃষ্ণার্ত জানোয়ার

জলের লোভে যেমন পা বাড়াল অমনি আটকা পড়ল মৃত্যুর ফাঁদে। কি রকম ভয়াকুল আর্তনাদে আকাশবাতাস মুখরিত করে তারা তিলে তিলে ডুবে গিয়েছিল সেই আলকাতরার হ্রদে—তা কল্পনা করতেও আমাদের গা শিউরে উঠে। সেই নিদারুণ দুর্ঘটনার ফলে এখন একত্র পাওয়া গিয়েছে তাদের রাশীকৃত কঙ্কাল।

ধৈর্যের সহিত সংগৃহীত হয়ে অনেক জীবাশ্ম এখন প্রত্যেক সভ্যদেশের মিউজিয়াম ও প্রাণিবিদ্যার লেবরেটরীতে স্থান পেয়েছে। সংগ্রহের পরিমাণ দিনদিনই বাড়ছে। প্রাচীন যুগের জীব-জন্তু ও গাছপালার পরিচয় যেখানে যেটুকু পাওয়া যায়—মানুষ চেষ্টা করছে সযত্নে সেটুকুকে ধরে রাখতে। বৈজ্ঞানিকের নিকট জীবাশ্মের বড়ই আদর। আগে আমরা যে ধরিত্রী-গ্রন্থের উল্লেখ করেছি, প্রাণিবিদ্যার ব্যাপারে এই জীবাশ্মগুলিই হল তার বিভিন্ন পৃষ্ঠার উপর অঙ্কিত লিপি কিংবা চিত্র। এথেকেই আমরা অতীতের ইতিহাস অনুমানে জানতে পারি। এই লিপির পাঠোদ্ধারের জন্য বহু মনীষী প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন এবং করছেন। ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে যে সমস্ত জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে তাদের তুলনা-মূলক বিচার করে যে কথা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয়েছে তা এই যে পৃথিবীর বিভিন্ন পর্যায়ে ও যুগে একই রকম গাছ-পালা এবং জীবজন্তুর অস্তিত্ব ছিল না। জীবজগতের ধারার মধ্যে পরিবর্তন ও প্রবাহ দেখা যায়। সব নীচের স্তর থেকে আমরা যতই উপরের দিকে আসতে থাকি, অর্থাৎ সুদূর অতীত থেকে যতই বর্তমানের দিকে এগুতে থাকি ততই দেখতে পাই যে রকমারি খুব বাড়ছে এবং প্রাণিদেহের গঠনেও ক্রমশঃ অধিকতর জটিলতা

প্রকাশ পাচ্ছে। অর্থাৎ জীবজগৎ সুদূর অতীতকাল থেকে এক অবস্থায় স্থির হয়ে নেই—উহার ক্রমপরিবর্তন বা অভিব্যক্তি হয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসের কোন পর্যায়ে এবং ঠিক কবে যে ধরাপৃষ্ঠে জীবের আবির্ভাব হয়েছিল তা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি না। জীবের অস্তিত্বের সর্বপ্রথম নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায় প্রোটারোজয়িক যুগে। ঐ যুগের ভূস্তরগুলিতে পাওয়া গিয়েছে প্রটোজোয়া, স্পঞ্জ, সিলিন্টেরেট, শামুক প্রভৃতি জীবের দেহাবশেষ, কিংবা দেহের ছাপ ; কিন্তু মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট জীবের চিহ্নমাত্র তাতে নাই। আরো পূর্বতন যুগে সর্বপ্রথম যে সকল জীবের উৎপত্তি হয়েছিল তারা এত ক্ষুদ্র এবং তাদের দেহ এত নরম ছিল যে নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ তারা বিশেষ রেখে যেতে পারে নি ; যেটুকু রেখে গিয়েছে সেটুকুও প্রায়শঃ আমাদের নাগালের বাইরে. কারণ প্রাচীনতম শৈলমালা ভূপৃষ্ঠের এত নিম্নস্তরে অবস্থিত যে মানুষ সেখানে পৌঁছতে পারে না। অর্ডোভিসিয়ান যুগে, কিংবা অধিকতর নিঃসন্দেহরূপে সিলুরিয়ান যুগেই, সর্বপ্রথম মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট জীবের চিহ্ন পাওয়া যায়,—তাও শুধু জলচারী মৎস্য। তার পর ক্রমে ক্রমে উভচর, স্থলচর, সরীসৃপ, চতুষ্পদ, পক্ষী, বানর, বনমানুষ ও মানুষ প্রভৃতি নানা জীবের আবির্ভাব ঘটেছে। যুগ যুগ ধরে কত রকম জীবের যে উদ্ভব হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। অনেক ক্ষুদ্র, অনেক বৃহৎ এবং অনেক অতিকায় জন্তু কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে,—তাদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিবার জন্য রেখে গিয়েছে শুধু অশ্মীভূত কঙ্কাল।

ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত জীবনধারাকে মহীরুহের সঙ্গে তুলনা করা যেতে

পারে। 'উদ্ভিদ' এবং 'প্রাণী'—এই দুই ভাগে এর কাণ্ড দ্বিধা বিভক্ত। কালের গতিতে এই দুই মহাশাখা থেকে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এক একটি প্রশাখা যেন এক এক প্রজাতি। কোন কোন প্রশাখা হয় ত ভেঙ্গে-চূরে গিয়েছে, এমন কি পত্র-পল্লব সমেত কোন কোন বৃহৎ শাখাও হয় ত বিপর্যয়ের ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে ;—কিন্তু মহীরুহ এখনো সজীব ও বর্ধনশীল। উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয় রাজ্যেই সৃষ্টির ধারা অবিশ্রান্তভাবে বয়ে চলেছে। প্রাণের বিকাশ কোন এক বিশেষ সৃষ্টির মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। এই বিকাশ অথবা সৃষ্টি চিরন্তন ; এর বৈচিত্র্যের শেষ নাই।

যুগে যুগে জীব-জন্তু ও গাছ-পালার কিরূপ ক্রমবিকাশ হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হল। বহু রকম পর্যবেক্ষণ, তুলনা ও পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকেরা এই তালিকা প্রস্তুত করেছেন। পৃথিবীর নানাস্থানে যে সকল জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে সেগুলোকে ভূস্তরের কালবিভাগ অনুযায়ী পর পর সাজালে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জীবজগতে ক্রমপরিবর্তন অথবা অভিব্যক্তি হয়েছে এবং জীবদেহের গঠন ক্রমশঃ জটিলতা প্রাপ্ত হয়েছে। সমগ্র জীবজগৎকে গোটাভাবে পূর্বাপর বিচার করলে এই চিত্রই আমাদের চোখের সামনে পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠে।

জীবরাজ্যের এক একটি প্রজাতিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করে তার মধ্যে অভিব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় কি না সেই চেষ্টাও বৈজ্ঞানিকেরা করেছেন এবং তাতে সফলকাম হয়েছেন। আগেই বলা হয়েছে যে পৃথিবীতে যত জীব জন্মে ও মরে তার অতি নগণ্য

সংখ্যারই কঙ্কাল অশ্মীভূত হয়। যেগুলি অশ্মীভূত হয় তারও অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র মানুষের হাতে পড়ে। এথেকেই বুঝা যাবে যে মানুষের সংগৃহীত জীবাশ্মগুলির সাহায্যে প্রাণী-বিশেষের অভিব্যক্তির ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া কত কঠিন। কিন্তু তবুও এরকম প্রমাণ অনেকগুলি পাওয়া গিয়েছে। ঘোড়া, টিটানোথেরাস্ (বিলুপ্ত), উট, গণ্ডার, টাপির, হাতী প্রভৃতি কয়েকটি প্রাণীর পূর্ব-পুরুষদের যে সকল কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে তাদের অভিব্যক্তির প্রমাণ সম্পূর্ণ এবং প্রকৃষ্টভাবেই পাওয়া যায়। ঘোড়ার আদিপুরুষ ছিল ছাগল-ভেড়ার মত একটা ক্ষুদ্র প্রাণী ; তার পায়ের ক্ষুর ছিল তিনভাগে বিভক্ত। উহাই বহু কোটি বৎসরে তিল তিল পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে এখনকার এক-ক্ষুর-ওয়ালা দ্রুতগামী অশ্বে পরিণত হয়েছে। রাশি রাশি অশ্মীভূত কঙ্কাল আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হয়েছে যার সাহায্যে এই ক্রমপরিবর্তনের ইতিহাস ধারাবাহিক ও সুস্পষ্ট-রূপে দেখতে পাওয়া যায়।

অভিব্যক্তির অপরোক্ষ প্রমাণ

(১) জীবদেহের গঠন-প্রণালী। নিম্নতম হতে উচ্চতম পর্যন্ত সকল শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন অস্থি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংখ্যা, অবস্থান প্রভৃতি,—এবং বিভিন্ন দেহযন্ত্রের ক্রিয়াসম্পর্কে আশ্চর্য সাদৃশ্য ও ক্রমোন্নতি দেখা যায়। একেবারে নিম্নবর্গ বাদ দিলে প্রত্যেক জীবের দেহেই এই কটি অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র দেখা যায় ;—যথা—হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, মলমূত্রাপসারণের যন্ত্র, স্নায়ু, মস্তিষ্ক। সকল প্রাণীর দেহেই এ-সকল যন্ত্রের কার্যপ্রণালী মোটামুটি অভিন্ন। আবার এটাও

দেখতে পাওয়া যায় যে, মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট প্রাণিসমূহের মধ্যে শরীরের অস্থিসংস্থান প্রায় একই ধরণের। ব্যাঙের অস্থিসংস্থানের সঙ্গে মানুষের অস্থিসংস্থান তুলনা করলে উভয়ের সাদৃশ্য দেখে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। ভগবান যদি নিজের হাতে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন জীব সৃষ্টি করে থাকেন, তবে বলতে হয় যে জীব-দেহের একটা ভিন্ন দুটো গঠনপ্রণালী তাঁর বুদ্ধিতে কুলোয় নি। কিন্তু অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করে নিলে এই সাদৃশ্যের কারণ সহজেই বুঝা যায়।

এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এক একটি অস্থি, এক একটি দৈহিক যন্ত্র (যেমন ফুসফুস, কিংবা পাকস্থলী)—ইত্যাদি কি রকম করে বিভিন্ন বর্গ ও শ্রেণীর জীবসমূহের দেহের ভিতর দিয়ে পরিণতি লাভ করেছে —বৈজ্ঞানিকেরা তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে দেখেছেন যে কোথাও কোন আকস্মিক পরিবর্তন অথবা খাপছাড়া ভাব নাই;— তিলে তিলে এবং ধাপে ধাপে পরিবর্তন সাধিত হয়ে বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটেছে। মাছের ফুসফুস নাই; তার বদলে আছে কানখোর ভিতরে অবস্থিত ফুলকা (gill)। ফুলকার ভিতর দিয়ে জল চালিয়ে মাছ তার শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ সম্পন্ন করে। প্রায় সকল মাছের ফুলকাই এমন ভাবে তৈরি যে তা দিয়ে বাতাসে শ্বাস নেওয়া চলে না। কিন্তু কৈ, মাগুর, নিউট প্রভৃতি মাছের ফুলকা একটু উন্নত ধরণের; তা দিয়ে তারা বাতাসেও শ্বাস নিতে পারে। এজন্য এ সকল মাছ ডাঙাতেও জীবিত থাকে। ব্যাঙাচি যখন জলে থাকে তখন তার থাকে ফুলকা, পরে ফুলকা দূরীভূত হয়ে তার পরিবর্তে গজায় ফুসফুস।

অতএব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ফুসফুস ফুলকারই রূপান্তর। জলচর থেকে আরম্ভ করে উভচর, সরীসৃপ, পাখী, স্তন্যপায়ী প্রভৃতি উচ্চ-বর্গের প্রাণীর দিকে যতই এগুতে থাকি ততই দেখতে পাই যে ফুস-ফুসের গঠন ক্রমশঃ অধিকতর জটিল। এতে সন্দেহ থাকে না যে মূলতঃ একই যন্ত্র বিভিন্ন প্রাণিদেহে অবস্থাবৈচিত্র্যের দরুণ বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে, এবং ক্রমপরিবর্তনের ভিতর দিয়েই এই বৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে।

(২) রক্তের যোগ—উচ্চতর প্রাণিবর্গের পরস্পরের মধ্যে রক্তের যোগ দেখতে পাওয়া যায়। টাটকা রক্ত একটা মিশ্র পদার্থ। অসংখ্য অতিসূক্ষ্ম লোহিত ও শ্বেত কণিকা একটা জলীয় পদার্থের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে ; এ-গুলির সমষ্টিকেই আমরা খালি চোখে একটা খাঁটি লাল রঙের তরল পদার্থ বলে দেখি এবং 'রক্ত' নামে অভিহিত করি। রক্তের জলীয় উপাদানের নাম 'সিরাম' (Serum)। এক প্রাণিদেহের সিরাম অপর প্রাণিদেহের সিরামের সঙ্গে মিশিয়ে নানারকম পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে একটা অপরটাকে ধ্বংস করে ফেলে, অপর কোন কোন ক্ষেত্রে তা করে না। বহু পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গিয়েছে যে দুটি প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ তাদের রক্তমিশ্রণের ফল ততই কম ধ্বংসাত্মক। এই প্রণালী ধরে দেখা যায় যে মানুষ ও বনমানুষের (লাঙ্গুলহীন বানরের) সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। 'প্রাচীন' মহাদেশগুলির বানর,—'নূতন' মহাদেশগুলির বানর—এবং 'লেমুর' জাতীয় বানর—এরা মানুষের ক্রমশঃ দূরবর্তী জ্ঞাতি।

রক্ত নিয়ে নানা জটিল পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে সমশ্রেণীর প্রাণিবর্গের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান। সমগ্র জীবজগৎ জুড়ে যে একই জীবনধারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে—এটা তারই আভাস।

(৩) 'অকেজো'র সাক্ষ্য—মানুষ এবং অন্যান্য উচ্চবর্গের জীবের দেহে এমন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে যেগুলি নিতান্তই অকেজো। আমরা মানবদেহ থেকে একটা সহজ দৃষ্টান্ত নিচ্ছি। ধরা যাক মানুষের কাণ। কাণের (অর্থাৎ কর্ণচ্ছিদ্রের বহিরাবরণের) আকৃতি কতকটা ঝিনুকের আধখানার মত। দেখলে মনে হয় যেন অবয়বের মূল আকৃতি কুঞ্চিত হয়ে রয়েছে। নরম পাতলা হাড়ের উপর চামড়ার আবরণ দিয়ে উহা তৈরি। চামড়ার নীচে সাতটি পেশী রয়েছে। গরু ঘোড়া প্রভৃতি ইতর প্রাণীর ন্যায় মানুষও যাতে তার কাণ চার-দিকে ঘুরাতে ফিরাতে এবং শব্দ শুনতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই অবশ্যি এই পেশীগুলি রচিত হয়েছিল। কিন্তু এই পেশীগুলি আমাদের কোন কাজে লাগে না এবং ইচ্ছামত এ গুলিকে চালনা করবার ক্ষমতাও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের কাণ এখন বস্তুতঃ একটি অকেজো, আলংকারিক অবয়ব। কারো কাণ কাটা গেলে লোকে তাকে কাণ-কাটা বলে ঠাট্টা করতে পারে, কিন্তু কাণ না থাকলেও শ্রুতি-শক্তির কিছুমাত্র হানি হয় না। আমাদের আসল যে শ্রবণেন্দ্রিয় তা কাণের ছিদ্রের ভিতরে অবস্থিত। সকল জাতির মানুষ, এমন কি বনমানুষের পক্ষেও ঠিক তাই। অর্থাৎ বনমানুষের পর্যায়ের আরো

আগে থেকেই কাণ একটি অকেজো অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গায়ের লোম আমাদের আরেকটি অকেজো জিনিষ। এতে শীত নিবারণ হয় না, কিংবা দেহের আচ্ছাদনের কাজ চলে না। দেহাভ্যন্তরে এরূপ অনেক পেশী, অস্থি ও যন্ত্র আছে যেগুলি আমাদের কোনই কাজে লাগে না, তবুও রয়েছে। সুবিখ্যাত রুশীয় বৈজ্ঞানিক মেশনিকফ মানবদেহে এরূপ প্রায় একশটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ দিয়েছেন।

মানব ও মানবেতর প্রাণীর দেহে এরূপ 'অকেজো' অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যাখ্যা একমাত্র অভিব্যক্তিবাদের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই। অপর কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এযাবৎ বেরোয় নি। অভিব্যক্তি-বাদ অনুযায়ী এসব অকেজো অঙ্গ হল প্রাণীর ক্রমপরিবর্তনের পরিচয়-চিহ্ন। অভিব্যক্তির ফলে এক প্রাণী থেকে আরেক প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে; নূতন অবস্থায় কোন কোন অঙ্গ হয় ত অকেজো হয়ে গিয়েছে, কিন্তু বিলুপ্ত হয় নি। অকেজো অঙ্গগুলি অতীতের সাক্ষ্য বৈ আর কিছুই নয়। মানুষের সামাজিক ইতিহাসে অনুরূপ ব্যাপার আমরা দেখতে পাই। প্রয়োজনের তাগিদে মানবসমাজে অনেক আচার-ব্যবহারের সৃষ্টি হয়। যতদিন প্রয়োজন বর্তমান থাকে ততদিন সেই আচার সার্থক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ দেখা যায় যে প্রয়োজনের অবসান ঘটলেও আচার পূর্ববৎ চলতে থাকে, যদিও তখন উহা নিরর্থক। এই নিরর্থক আচারের সূত্র ধরে আমরা অনেক সময় অতীত ইতিহাসের সন্ধান পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত বর্তমান কালের উপনয়ন ও সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কথা বলা যেতে পারে। প্রাচীনকালে ছেলেদের গুরুগৃহে পাঠাবার প্রথা ছিল; তাই উপনয়ন (গুরুসকাশে

গমন) ও সমাবর্তন (গুরু-গৃহ থেকে প্রত্যাবর্তন) ছিল সত্যিকার ব্যাপার। এখন আর সেই প্রথা প্রচলিত নাই ; সুতরাং এখনকার উপনয়ন ও সমাবর্তন আর সত্যিকার ব্যাপার নয়, এগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন সেই প্রাচীন প্রথার স্মারক অনুষ্ঠান মাত্র। বিভিন্ন প্রাণিদেহের অকেজো অঙ্গসমূহ ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলেও মনে হয় সেগুলি যেন তাদের পূর্বতন অবস্থার স্মারক ও পরিচায়ক চিহ্ন।

(৪) ভ্রূণের সাক্ষ্য—মানুষ, বানর, হাতী, শূওর, মুর্গী, সাপ প্রভৃতি জীবকে একটি তিন বছরের শিশুও অনায়াসে পৃথক পৃথক ভাবে চিনতে পারে। কিন্তু এ সকল জীবজন্তু যখন তাদের জীবনযাত্রার প্রারম্ভে মাতৃগর্ভে অথবা ডিমের চোকলার ভিতরে থাকে—তখন তাদিগকে পৃথকভাবে চিনতে পারা সহজ নয়। ভ্রূণ অবস্থায় এগুলিকে, সাধারণ লোক দূরের কথা, সাধারণ বৈজ্ঞানিকেরাও চিনতে পারেন না ;—এমন কি যাঁরা ভ্রূণবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ তাঁরাও ভুল করলে একটা খুব লজ্জার বিষয় বলে গণ্য করা হয় না।

ভ্রূণসম্পর্কে দুটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। প্রথমটি এই যে জীবনের প্রারম্ভে ভ্রূণের আকৃতি তার পিতামাতার পূর্ণাবয়ব আকৃতির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের থাকে। দ্বিতীয়তঃ,—বিভিন্ন জীবজন্তুর ভ্রূণের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য এত বেশী যে সেগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে চিনতে পারা খুবই কঠিন। পূর্ণাবয়ব অবস্থায় যা এক বর্গের জীব, ভ্রূণাবস্থায় তার আকৃতি সম্পূর্ণ আরেক বর্গের জীবের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। মানুষ, বিড়াল, মুর্গী ও সাপের ভ্রূণের মধ্যে একটা পারস্পরিক সাদৃশ্য ত আছেই ;—তা ছাড়া আরেকটি

আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাদের প্রত্যেকেরই হৃৎপিণ্ড এবং ঘাড়ের দিকটার নির্মাণকৌশল ঠিক মাছের মত। এই ব্যাপারটি যতই অদ্ভুত ও বেখাপ্পা বলে প্রথমে মনে হোক না কেন, অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করে নিলে এর একটা সংগতি সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। অভিব্যক্তিবাদ অনুযায়ী সর্বপ্রথম মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট জীবের জন্ম হয়েছিল জলে। সেই জলচর জীবই ক্রমে ক্রমে স্থলচর জীবে পরিণত হয়েছে এবং বাতাসে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শিখেছে। এখনো যখন কোন স্থলচর জীব জীবনের যাত্রাপথে বেরোয়, তখন তার সেই আদিম জলচর স্বভাব নিয়েই শুরু করে। কিন্তু বহু পুরুষের (Generations) ব্যবধানের ফলে জলচর-স্বভাব এখন অত্যন্ত ক্ষীণ ; অতএব সহজেই উহাকে ঝেড়ে ফেলে স্থলচর জীবের পথ ধরে চলতে চলতে অবশেষে নিজ পিতামাতার অবয়ব প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক উচ্চবর্গের জীবের ভ্রূণাবস্থায় তার প্রজাতির অভিব্যক্তির আগাগোড়া ইতিহাস যেন খুব সংক্ষেপে একবার অভিনীত হয়ে যায়।

(৫) চাক্ষুষ প্রজাতি গঠন—উপরে যে সকল প্রমাণের কথা বলা হল তাদের সম্পর্কে তর্ক উঠতে পারে যে এ সব গুলিই নিছক অনুমান ও যুক্তিতর্কের উপর স্থাপিত ;—এক রকম জীব থেকে আরেক রকম জীবের অভিব্যক্তি যে সত্যি সত্যি হয়েছে কিংবা হতে পারে তার কোন চাক্ষুষ প্রমাণ ত আমাদের নিকট নাই। উত্তরে একথা বলা চলে যে —যে সকল পরিবর্তন ঘটতে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ও কোটি-কোটি বছর লেগেছে,—তাদের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা হওয়া কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়,—মানবের মধ্যে তেমন ভূষণ্ডি কেউ বেঁচে নাই।

আর থাকলেও ধরাপৃষ্ঠে মানবের আবির্ভাবের পূর্বে যে সকল ব্যাপার ঘটেছে,—সেই ভূষণ্ডির পক্ষে তার দ্রষ্টা হওয়া সম্ভবপর হত না। প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ করেছে মাত্র সেদিন। অতএব মানবসভ্যতার জন্মের পরেও যে সকল বিচিত্র পরিবর্তন জীবজগতে ঘটেছে, তারও কোন লিখিত বিবরণ আমাদের হাতে নাই। অনুমান এবং যুক্তিই এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র সম্বল।

কিন্তু অভিব্যক্তির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোনই চাক্ষুষ প্রমাণ যে আমাদের হাতে নাই তা বলা যায় না। গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে যে সকল পরিবর্তন আপনা-আপনি কিংবা মানুষের চেষ্টায় হয়েছে—তার বিস্তর নিদর্শন আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। বিভিন্ন জাতির কুকুর কিংবা পায়রা যে মূলতঃ এক প্রজাতি কিংবা গণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে তার কোন সন্দেহ নাই। অথচ তাদের আকৃতি-প্রকৃতিতে কত পার্থক্য! অতএব জীবের আকারপ্রকার যে বদলাতে পারে এবং বদলায় তার দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনেই অনেক রয়েছে। আবাদী গাছপালা এবং গৃহপালিত জীবজন্তুদের মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষ সেগুলিকে নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধির পক্ষে ক্রমশঃ অধিকতর উপযোগী করে তুলেছে। হাজার-হাজার, কিংবা লক্ষ-লক্ষ বৎসরে এই সকল পরিবর্তন ক্রমশঃ গভীরতর হয়ে নূতন নূতন প্রজাতির সৃষ্টি হওয়া মোটেই অসম্ভব বলে মনে হয় না।

(৬) ভৌগোলিক প্রমাণ—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের গাছপালা ও

পশুপক্ষীর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। আটলান্টিক মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপের জীবজন্তু লক্ষ্য করে যেতে যেতে ডারুইন দেখতে পান যে তারা হুবহু একই রকমের নয়;—দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে একই প্রজাতির জীব একটু একটু করে রূপান্তরিত হয়েছে। এ থেকেই ডারুইনের মনে ধারণা জন্মে যে একই প্রজাতির জীব পৃথক পৃথক পরিবেশের মধ্যে পড়ে অভিব্যক্তির ফলে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। অতীত কালের অনেক বিলুপ্ত প্রাণীর পরিচয় জীবাশ্ম থেকে পাওয়া গিয়েছে। আবার বর্তমানে যে সকল প্রাণী ধরাপৃষ্ঠে রয়েছে তাদের পূর্বপুরুষদেরও অনেক অশ্মীভূত কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি যেখানে যেখানে পাওয়া গিয়েছে, তার সঙ্গে বর্তমান যুগের জীবকুলের বসতিস্থান তুলনা করে এবং প্রতিবেশের যেরূপ পরিবর্তন কালক্রমে ঘটেছে তারও বিচার করে বৈজ্ঞানিকেরা অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট আভাসই দেখতে পেয়েছেন।

(৭) শ্রেণীবিভাগের অস্পষ্টতা—গাছপালা ও জীবজন্তুর শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে মুশকিলে পড়েন। এরূপ জীব কিংবা উদ্ভিদ প্রায়ই তাঁদের হাতে পড়ে যাকে এ প্রজাতিতে রাখবেন কিংবা ও প্রজাতিতে রাখবেন কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারেন না। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ এবং বিরোধের সৃষ্টি পর্যন্ত হয়। এক গণভুক্ত বিভিন্ন প্রাণী পর পর সাজালে একটির পর একটি এমন-ভাবে মিশে যায় যে অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে স্পষ্ট প্রজাতির বিভাগ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ে। অর্থাৎ প্রজাতির সংজ্ঞানির্দেশ খুবই কঠিন। এথেকে স্বভাবতঃই মনে হয় যেন একই

জীবনধারা বিভিন্ন প্রজাতিতে ক্রমাভিব্যক্ত হয়েছে, কোথাও সম্পূণ ছেদ নাই।

বিভিন্ন গণ কিংবা বর্গের মধ্যে পার্থক্য যদিচ গভীর তবুও তাদের পরস্পরের মধ্যেও সংযোগচিহ্ন বিস্তর পাওয়া গিয়েছে। এমন অনেক জীব আছে যে গুলিকে এ গণে রাখা হবে কিংবা ও গণে রাখা হবে, —এ বর্গে রাখা হবে কিংবা ও বর্গে রাখা হবে—তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। সুতরাং মনে হয় যে গণ এবং বর্গের পার্থক্যও অলঙ্ঘনীয় নয়।

জীবজগতের শ্রেণীবিভাগ

সমগ্র জীবজগৎ দুটি 'সর্গে' বিভক্ত,—যথা উদ্ভিদসর্গ ও প্রাণিসর্গ। সর্গের ক্ষুদ্রতর বিভাগের নাম 'পর্ব'। এ রকম ভাবে পর্ব হতে 'শ্রেণী,' শ্রেণী থেকে 'বর্গ,' বর্গ থেকে 'গোত্র,' গোত্র থেকে 'গণ,' গণ থেকে 'প্রজাতি,' প্রজাতি থেকে 'প্রকার'—প্রভৃতি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর বিভাগের উৎপত্তি হয়েছে। এ সকল বাংলা শব্দ, ও তাদের ইংরেজী প্রতিশব্দগুলি শিখে রাখলে প্রাণিবিজ্ঞান পড়বার পক্ষে খুব সুবিধা হবে। নীচে এর একটা তালিকা করে দেওয়া হল।

সর্গ—Kingdom.
পর্ব—Phylum.
শ্রেণী—Class. উপশ্রেণী—Sub-class.
বর্গ—Order. উপবর্গ—Sub-order.
গোত্র—Family.
গণ—Genus.
প্রজাতি—Species.
প্রকার—Variety.

ধরা যাক আমরা জীবজগতে গৃহপালিত মার্জারের স্থান নির্দেশ করতে যাচ্ছি। তা হলে আমাদিগকে এভাবে অগ্রসর হতে হবে।

সর্গ (Kingdom)—প্রাণী (Animalia).
পর্ব (Phylum)—মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণী (Chordata).
শ্রেণী (Class)—স্তন্যপায়ী (Mammalia).
বর্গ (Order)—মাংসাশী (Carnivora).
গোত্র (Family)—Felidae. (বিড়ালাস্য)
গণ (Genus)—Felis. (বিড়াল)
প্রজাতি (Species)—Felis domestica (গৃহপালিত বিড়াল)

ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা অনুযায়ী পৃথিবীর কালবিভাগ

মহাযুগ		স্থিতিপরিমাণ	যুগ
ইংরাজী নাম	গ্রীক নাম		
4. Quaternary (চতুর্থ মহাযুগ)	6. Pleistocene (Pleistos=most +Kainos=new)	চলতি	
3. Tertiary (তৃতীয় মহাযুগ)	5. Cainozoic (Kainos=new +zoon=animal +ic)	[বিভিন্ন মতানুযায়ী] ৫০ লক্ষ থেকে ৪ কোটি বৎসর	Pliocene. Miocene. Oligocene. Eocene.
2. Secondary (দ্বিতীয় মহাযুগ)	4. Mesozoic (Mesos=middle +zoon=animal +ic)	১॥-১৪ কোটি বৎসর	Cretaceous Jurassic. Triassic.
1. Primary (প্রথম মহাযুগ)	3. Palaeozoic. (Palaios=ancient)	৬॥-৬২ কোটি বৎসর	Permian. Carboniferous. Devonian. Silurian. Ordovician. Cambrian.
	2. Proterozoic (Proteros=former)	৬-৬০ কোটি বৎসর	
↑	1. Azoic [a (=not) +zoe(=life)+ic] Lifeless বা Archaeozoic [arkhaios (=ancient) +zoe (=life)+ic]	৮-৮০ কোটি বৎসর	

একবার কষ্ট করে এই নামগুলি শিখে রাখলে বিজ্ঞান পড়বার অনেক সুবিধা হবে। নীচ থেকে উপরের দিকে পড়ে গেলে ক্রমশঃ ভূপৃষ্ঠের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরের দিকে, ও প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককালের দিকে যাওয়া হবে।

প্রাণিসর্গের পর্ববিভাগ

সমগ্র প্রাণিসর্গকে ১২টি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। এ গুলির নাম নীচে দেওয়া হল।

(১) প্রটোজোয়া (Protozoa) অর্থাৎ এককোষ জীব। এই পর্বে অন্যূন ১০০০০ প্রজাতি আছে; প্রায় সবগুলিই জলে থাকে। কতকগুলি আবার মানবদেহে এবং প্রাণীর দেহে বাসা বাঁধে। এই পর্বের মধ্যে মানুষের অনেক বড় বড় শত্রু রয়েছে—যথা, আমাশয়ের জীবাণু (Amoeba), কালাজ্বরের জীবাণু (Leishmania), মহা-নিদ্রারোগের জীবাণু (Trypanosome) ম্যালেরিয়ার জীবাণু (Plasmodium).।

(২) পরিফেরা (Porifera), অর্থাৎ ছিদ্রময় দেহযুক্ত প্রাণী। দৃষ্টান্ত—স্পঞ্জ।

(৩) সিলিন্টারেটা (Coelenterata)—বা একনালী জীব। খাদ্যবহা নালী ব্যতীত এদের দেহে আর কোন নালী নাই। দৃষ্টান্ত—জেলিফিশ, প্রবাল।

(৪) প্ল্যাটিহেলমিনথেস (Platyhelminthes) বা চেপ্টাকৃমি। দৃষ্টান্ত—ফিতাকৃমি, যকৃতের কৃমি।

(৫) নিমেথেলমিনথেস (Nemathelminthes)—বা গোল কৃমি। দৃষ্টান্ত—অন্ত্রের গোল কৃমি, হুকওয়ার্ম, গোঁদের জীবাণু।

(৬) ট্রকহেলমিনথেস—(Trochelminthes)

(৭) মলাস্কয়ডা (Molluscoida)

(৮) একাইনোডার্মেটা (Echinodermata)। এই পর্বের প্রাণীদের শরীর কণ্টকাকীর্ণ। দৃষ্টান্ত—সামুদ্রিক তারামাছ, শশা-মাছ।

(৯) আনেলিডা (Annelida)। কতকগুলি আংটি সারিবদ্ধ-ভাবে সাজালে যেরূপ হয়, এদের দেহের গঠনও সেইরূপ। দৃষ্টান্ত—কেঁচো, জোঁক।

(১০) আর্থ্রপোডা (Arthropoda)। চিংড়িমাছ, কাঁকড়া, মাকড়সা এবং সব রকম কীটপতঙ্গ এই পর্বের অন্তর্গত।

(১১) মলাস্কা (Mollusca)। ঝিনুক, শামুক, শঙ্খ, কড়ি, অক্টোপাস প্রভৃতি এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত।

(১২) কর্ডেটা (Chordata) অর্থাৎ মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট জীব। এই পর্বে আছে মাছ থেকে শুরু করে সমস্ত উচ্চতর প্রাণী—যথা, সরীসৃপ, পক্ষী, চতুষ্পদ, বানর, বনমানুষ, মানুষ।

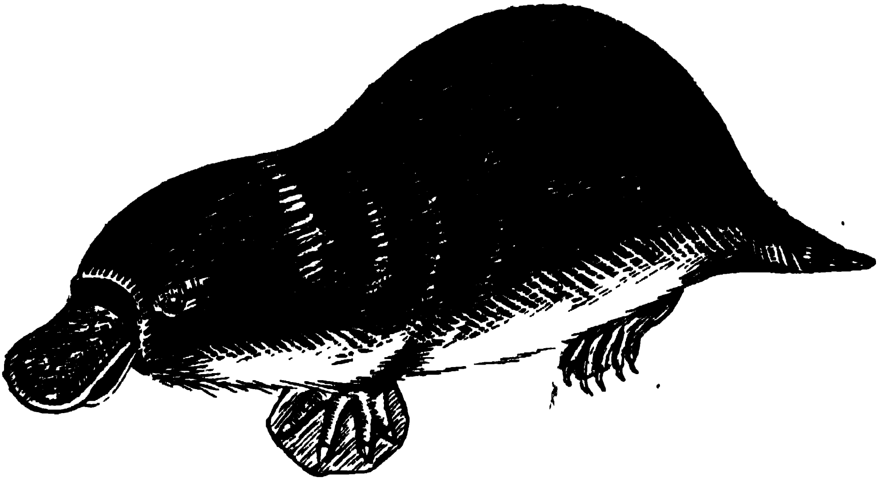
প্রথম থেকে একাদশ পর্বের অন্তর্গত সমস্ত জীবই মেরুদণ্ডবিহীন। এরা সংখ্যায় বহুল; কিন্তু মেরুদণ্ডীদের তুলনায় এদের দেহযন্ত্র অনেক হীন পর্যায়ের। মেরুদণ্ডীদের ভিতরেই দেহের অস্থিসংস্থান, যন্ত্রপাতি, স্নায়ুতন্ত্র এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম ক্রমশঃ অধিকতর মাত্রায় পূর্ণতালাভ করেছে। এককোষ জীবের জন্মকাল থেকে কোটি কোটি বৎসর অতিবাহিত হবার পর প্রথম মেরুদণ্ডীর আবির্ভাবচিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় সিলুরিয়ান যুগে। জীবজগতের অভিব্যক্তির ইতিহাসে মেরু-দণ্ডীর আবির্ভাব একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যতদূর জানা যায়, সর্বপ্রথম মেরুদণ্ডী ছিল একপ্রকারের জলচারী মৎস্য।

আর্কিয়প-টেরিক্স বা আদিম পাখী



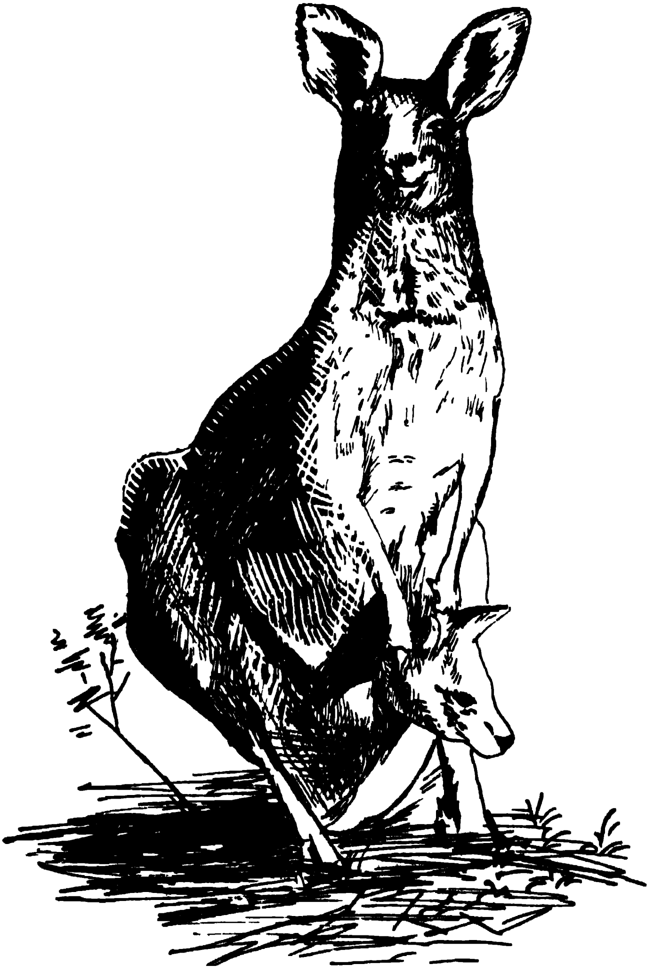
ইহা একটি বিলুপ্ত জীবের প্রতিকৃতি। ব্যাভেরিয়ার কোন শ্লেটপাথরের খনিতে এর গায়ের ছাপ অবিকল অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে সরীসৃপ থেকে অভিব্যক্তির ফলে পাখীর উদ্ভব হয়েছে। আর্কিয়প-টেরিক্সে আমরা দেখতে পাই—বিহঙ্গম ও সরীসৃপের একটি সংযোগস্থল। গায়ের পালক থেকে সন্দেহ থাকে না যে উহা পক্ষিশ্রেণীভুক্ত। পা দুটির গঠনও ঠিক পাখীর মত, অর্থাৎ আঙুলের হাড়গুলি এমন ভাবে সাজানো যাতে সহজেই গাছের ডালে বসতে পারে। কিন্তু লেজ ছিল মেরুদণ্ডের ন্যায় টুকরো টুকরো হাড় দিয়ে তৈরী;—অর্থাৎ সরীসৃপের মত, পাখীর মত নয়। মুখে দাঁত ছিল, যা পাখীদের থাকে না। ডানা দুটির অস্থিসংস্থান পাখীদের মত নয়, বরঞ্চ সরীসৃপের সামনের পা দুটির ন্যায়। [চতুষ্পদের বেলায় যা সামনের দুটি পা, পাখীদের বেলায় সে গুলোই ডানা, এবং প্রাইমেটবর্গের বেলায় হাত।]

অষ্ট্রেলিয়ার অদ্ভুত প্রাণী—হংসচঞ্চু প্ল্যাটিপাস.



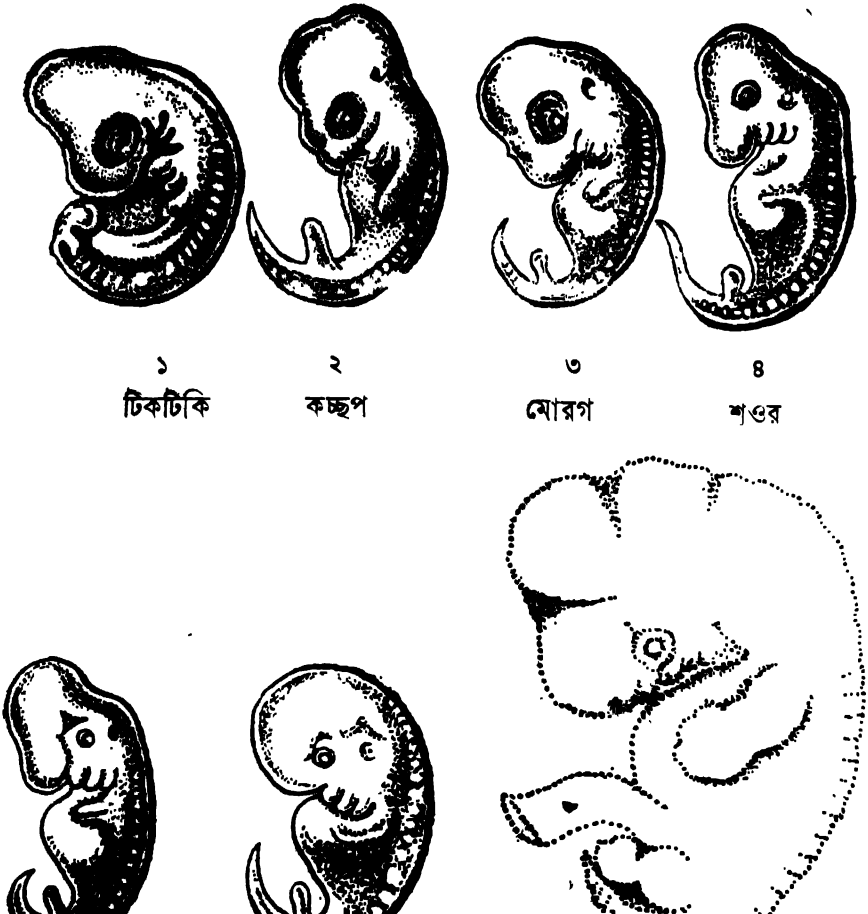
এরা ডিম পাড়ে, কিন্তু ডিম থেকে বাচ্চা বেরুবার পর তাকে স্তনের দুধ খাওয়ায়। স্তনের কিন্তু বোঁটা নাই। মাতা-প্ল্যাটিপাসের পেটের অনেক খানি জায়গা জুড়ে দুধ চুঁইয়ে বেরোয়, বাচ্চারা চুষে চুষে খায়। ইদুরের ন্যায় ধারাল দাঁত দিয়ে এরা মাটি খুঁড়তে খুব মজবুত। চঞ্চু এবং পায়ের পাতাগুলি ঠিক হাঁসের মত। প্ল্যাটিপাস অধিকাংশ সময় জলে থাকে ; কিন্তু মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার ভিতরে বাসা বাঁধে। উহা একাধারে অণ্ডজ,স্তন্যপায়ী, তীক্ষ্ণদন্ত, লিপ্তপাদ জলচর, গর্তবাসী প্রভৃতি অনেক কিছু। জীবনবৃক্ষে প্ল্যাটিপাস এমন একটি সংযোগস্থল সূচিত করে যেখান থেকে এই সকল বিভিন্ন শাখা বেরিয়ে থাকবে।

কাঙ্গারুঃ মাতা ও শাবক



কাঙ্গারু অষ্ট্রেলিয়ার আরেকটি অদ্ভুত প্রাণী। কাঙ্গারু ডিম পাড়ে না বটে, কিন্তু এর বাচ্চা কড়া আঙুলের মত ছোট এবং নিতান্ত অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। মাতা-কাঙ্গারুর পেটের নীচে একটি থলি আছে। শিশু কাঙ্গারু সেই থলির ভিতর দ্বিতীয়বার জঠরবাস করে যখন একটু বড় ও শক্ত হয় তখন বাইরে আসে। কাঙ্গারুতে আমরা দেখতে পাই অণ্ডজ ও স্তন্যপায়ীর মাঝামাঝি জীব।

কয়েকটি বিভিন্ন জীবের ভ্রূণ



কতটুকু পার্থক্য? বৈজ্ঞানিকদের মতে এই সাদৃশ্য অভিব্যক্তির অন্যতম প্রমাণ। ভ্রূণাবস্থায় প্রত্যেক উচ্চবর্গের জীবই যেন নিজেদের অভিব্যক্তির ধারা আগাগোড়া সংক্ষেপে অভিনয় করে নেয়।

জীবনধারার ক্রমবিকাশ

৬। প্লিষ্টোসিন মহাযুগ	মানবের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য। কৃষি ও পশুপালনের দ্বারা উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর অভিব্যক্তির ব্যাপারে মানুষের হস্তক্ষেপ।
৫। কেইনোজয়িক মহাযুগ	আধুনিক গাছপালা ও জীবজন্তুর আবির্ভাব। প্রাণিজগতে স্তন্যপায়ী বর্গের প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠা। উন্নতশ্রেণীর সপুষ্পক গাছপালা এবং বর্তমান কালের তৃণভোজী ও মাংসাশী জীবজন্তুর অধিকাংশ আবির্ভূত এবং ক্রমাভিব্যক্ত হয় এই মহাযুগেই। প্রাইমেটবর্গের আবির্ভাব ও ক্রমাভিব্যক্তি।
৪। মেসোজয়িক মহাযুগ	সরীসৃপের প্রাধান্য। সমগ্র মেসোজয়িক মহাযুগকেই বলা হয় সরীসৃপ-যুগ। কচ্ছপ, কুমীর, সাপ, টিকটিকি, গিরগিটি প্রভৃতি যত রকম সরীসৃপ আমরা এখন দেখতে পাই তারা তখন ছিল সংখ্যায় ও রকমারিতে অগণিত। কতক-গুলির ডানা ছিল এবং সামান্য উড়তে পারত। আর কতক-গুলি ছিল অতিকায়, এমন কি ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা। ক্রিটেশিয়াস যুগে এরা বিলয়প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদরাজ্যে সপুষ্পক বৃক্ষ এবং প্রাণিরাজ্যে পক্ষীর আবির্ভাব।
৩। প্যালিওজয়িক মহাযুগ — পার্মিয়ান যুগ	স্থলে অপুষ্পক গাছপালার বৃদ্ধি ও প্রসার।
কার্বনিফেরাস যুগ	উদ্ভিদ ও প্রাণী কর্তৃক স্থলভাগ আক্রমণ। ডাঙায় পোকা-মাকড়, বিছু প্রভৃতি। উভচর প্রাণীর আবির্ভাব। সমস্ত জলাভূমি জুড়ে থামের মত প্রকাণ্ড বড় বড় গাছ। এসকল বনানী থেকেই কয়লার খনির উৎপত্তি হয়েছে।
ডিভোনিয়ান যুগ	জলে অসংখ্য মাছ। এজন্য এর অপর নাম মৎস্যযুগ। নানাজাতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদ। প্রকাণ্ড বড় বড় শৈবালজাতীয় বৃক্ষ। স্থলভাগ এখনো উদ্ভিদশূন্য ও প্রাণী-বিহীন। কিন্তু উপকূলের ধারে ধারে অসংখ্য বৃক্ষগুল্মলতা যেন সদর্পে চলেছে স্থলভাগ আক্রমণ করতে। সেই ঘন বনানী পোকামাকড়ে ভর্তি।
সিলুরিয়ান যুগ	ট্রাইলোবাইটদের সংখ্যাহ্রাস। 'এরাকনিড' নামক প্রকাণ্ড সামুদ্রিক বিছু এবং নানাবিধ জলচর মাকড়শা। মৎস্যের অর্থাৎ প্রথম মেরুদণ্ডীর আবির্ভাব।
অর্ডোভিশিয়ান যুগ	জলৌকা, শামুক প্রভৃতির সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে।
ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ	বহুবিধ শামুক, দ্বিদল ঝিনুক, একিনোডার্ম, সিলিণ্টারেট প্রভৃতি।
২। প্রোটারোজয়িক মহাযুগ	সমুদ্রজাত ছোট ছোট উদ্ভিদ, স্পঞ্জ, কীট পোকা ও ট্রাইলোবাইট নামক কবচী।
১। এজয়িক মহাযুগ	জীবের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

স্তন্যপায়ী জ[illegible]বর্গ-বিভাগ

Class Mamm[illegible] (স্তন্যপায়ী শ্রেণী)

- **Sub Class I. উপশ্রেণী—১**
  Prototheria (যাদের স্তনে বোঁটা নাই)
  প্ল্যাটিপাস্, শুল্কবিশিষ্ট পিপীলিকাভূক।

- **Sub Class II, উপশ্রেণী—২**
  Theria (যাদের স্তনে বোঁটা আছে)
  - **বিভাগ (ক) Metatheria (Marsupalia)**
    যাদের অঙ্ক-গর্ভ আছে
    - Order I বর্গ—১
      Polyprotodontia
      আপোসাম (opossums)
      ব্যাণ্ডিকুট (Bandicoots)
    - Order II বর্গ—২
      Diprotodontia
      উম্বাট (Wombats),
      কাঙ্গারু
  - **বিভাগ (খ) Eutheria**
    (যাদের অঙ্ক-গর্ভ নাই)
    - বর্গ=১, Edentata
      (দন্তবিহীন)
      শ্লথ, আর্মাডিলো।
    - বর্গ—২, Cetacea
      (সামুদ্রিক)
      তিমি, শুশুক, ডলফিন
    - [illegible]৩, Sirenia
      [illegible]লচর) ডুগং
    - বর্গ—৪, Ungulata
      (ক্ষুরবিশিষ্ট)
      - (ক) Ungulata vera (Digitigrade)
        (যারা ক্ষুরে ভর দিয়া হাঁটে)
        - উপবর্গ (১)
          Perisso-dactyla
          (একক্ষুর বিশিষ্ট)
          ঘোড়া, গাধা, জেব্রা,
          টাপির, গণ্ডার
        - উপবর্গ (২)
          Artiodactyla
          (যুগ্ম-ক্ষুর)
          - রোমন্থক
            উট, গরু, ছাগল,
            ভেড়া, হরিণ, জিরাফ
          - অ-রোমন্থক
            শূকর, হিপোপটেমাস
      - (খ) Sub-ungulata (plantigrade
        (যারা পায়ের পাতায় ভর দিয়া হাঁটে)
        - উপবর্গ (১)
          Hyrocoidea
        - উ[illegible] (২)
          Pro[illegible]idea
          (শুঁড়ও[illegible] হাতী)
    - বর্গ—৫
      Carnivora
      (মাংসাশী)
      - উপবর্গ (১)
        Cornivora Vera
        সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়াল
        (Felidae) ; নেকড়ে
        বাঘ, কুকুর (canidoe) ;
        হায়েনা, ভালুক,
        (ursidoe) ; উইসেল
        (weasels) ; ওটার
        (otters)
      - উপবর্গ (২)
        Pinnipedia
        (জলচর)
        উদবিড়াল, শীল,
        ওয়ালরাস
    - বর্গ—৬, Rodentia
      (তীক্ষ্ণদন্ত)
      ইঁদুর, খরগোস,
      কাঠবিড়াল, জারবোয়া,
      বীভার, সজারু।
    - বর্গ—৭, Insectivora
      (পতঙ্গাশী)
      ছুঁচো, সজারু
    - বর্গ—৮, Chiroptera
      (উড়ুক্কু) বাদুড়,
      Flying Fox.
    - বর্গ—৯
      Primates
      (প্রাইমেট),
      টার্সিয়াস্,
      লেমুর, বানর,
      বনমানুষ,
      মানুষ

অভিব্যক্তিবাদ

গাছপালা ও নিম্নবর্গের প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় যে প্রতি বৎসরেই বহু চারাগাছ ও সন্তানসন্ততি জন্মে। একটি গাছে বহু বীজ হয়। একটি পোকা, সাপ, ব্যাঙ অথবা মাছ অসংখ্য ডিম পাড়ে। যদি কোন এক প্রকার উদ্ভিদ কিংবা জীব অবারিতভাবে বংশবৃদ্ধির সুযোগ পায়, তা হলে উহা অল্পসময়ের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে। ধরা যাক একটা ধানগাছে ৫০টি ধান জন্মে। সেই পঞ্চাশটি ধান থেকে দ্বিতীয় বৎসরে হবে পঞ্চাশটি ধানগাছ। তা থেকে তৃতীয় বৎসর হবে ৫০ × ৫০ অর্থাৎ ৫০^{২} সংখ্যক গাছ, চতুর্থ বৎসরে হবে ৫০^{৩}, পঞ্চম বৎসরে ৫০^{৪}, ইত্যাদি। এই হিসাবে ১৫।২০ বছরের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী ধানের চারায় ভরে যাবে। কোন কোন সাপ বছরে সহস্রাধিক ডিম পাড়ে। সেই হাজার হাজার বাচ্চার প্রত্যেকটি থেকে দ্বিতীয় বৎসরে আরো হাজার হাজার বাচ্চা জন্মাবে। এই হারে বছর দশেকেই সমস্ত পৃথিবী জলে স্থলে সর্ব্বত্র শুধু সাপে কিলবিল করতে থাকবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে বস্তুতঃ এরকম হয় না। না হবার কারণ এই যে জীবজগতে একে অপরের ভক্ষ্য ; —বংশবিস্তারের কাজ অবাধে চলতে পারে না।

প্রত্যেক জীব চেষ্টা করছে নিজ বংশের বিস্তৃতি ঘটাবার জন্যে। এর ফলে সর্বত্র দেখা দিয়েছে—অতি নিদারুণ জীবনসংগ্রাম। একদিকে হরিণ চেষ্টা করছে ক্রমাগত নিজের বংশবৃদ্ধি করতে,—অপরদিকে বাঘ

চেষ্টা করছে হরিণকুলকে নির্মূল করতে। কোন মুক্তস্থানে হয় ত একটি শিমুলগাছ ও একটি শালগাছ পাশাপাশি জন্মেছে। তাদের বীজ চার দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং তা থেকে অসংখ্য চারা গজাবে। এখন শিমুলের চারা ও শালের চারাগুলি পাল্লা দিয়ে বড় হতে থাকবে—কে কাকে হারাতে পারে। যদি শিমুলের চারাগুলি আগে লম্বা হতে পারে, তা হলে শালের চারাগুলিকে তারা সূর্যের আলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করে একেবারে পিষে মারবে। এইজন্যই আমরা দেখতে পাই যে যদিও অসংখ্য রকমের গাছপালার বীজ বাতাসে সর্বত্র নীত হচ্ছে তবুও অরণ্যের কোথাও কেবল শিমুল গাছ কোথাও শুধু শালগাছ ইত্যাদি। জমির পরিমাণ এবং মাটির রস অফুরন্ত নয় , মাটি যে রোদ বাতাস পায় তার পরিমাণও সীমাবদ্ধ। অতএব অগণ্য গাছপালার স্থানসঙ্কুলান এবং জীবিকাসংস্থান পৃথিবীতে হতে পারে না। জীবন-সংগ্রামে বিভিন্ন গাছপালা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। আবার একই রকমের উদ্ভিদও এই ব্যাপারে একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। যদি একহাজার পাটের চারা ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে একখণ্ড জমিতে জন্মে তবে তাদের মধ্যে যেগুলি সতেজ সেগুলি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বলগুলিকে পিষে মারবে। পোকামাকড়, সাপ, ব্যাঙ, মাছ, পশুপক্ষী প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর জীবের মধ্যে এই একই কাণ্ড চলছে।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষির ব্যাপারে দলাদলিও যে না আছে তা নয়। কেউ কারো সাক্ষাৎভাবে শত্রু, কেউ সাক্ষাৎভাবে মিত্র, কেউ বা পরোক্ষভাবে শত্রু কিংবা মিত্র। বাঘ হরিণের সাক্ষাৎ-ভাবে শত্রু ; কারণ হরিণ তার ভক্ষ্য। জঙ্গলের অপরাপর তৃণভোজী

পশু সাক্ষাৎভাবে হরিণের শত্রু নয়, কিন্তু পরোক্ষভাবে শত্রু ; যেহেতু হরিণের ভোজ্য তৃণসম্ভারে তারা ভাগ বসাচ্ছে। এই দৃষ্টান্তেই ঘাসকে বলতে পারি বাঘের অপরোক্ষ মিত্র ; কারণ ঘাস যত বেশী হবে হরিণ, গরু, মোষ প্রভৃতি পশুর সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাবে, অর্থাৎ বাঘের ভক্ষ্য প্রাণীর সেই অনুপাতে প্রাচুর্য হবে। প্রত্যেক গাছপালা ও জীবজন্তু নিজে বাঁচবার জন্য ও নিজের বংশবিস্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে,—এবং সেরূপ চেষ্টা করতে গিয়ে তাকে কখনো মৃদু, কখনো কঠোর জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হয়। এই সংগ্রামে সাফল্যের উপরেই বাঁচা না-বাঁচা নির্ভর করে।

জীবনসংগ্রাম শুধু প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যেই নয়, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গেও। জীবনসংগ্রামে জয়-পরাজয়ের বিচার করতে গেলেই প্রতিবেশের কথা বলতে হয়। কোন উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী যে আবেষ্টন অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকে তাকে বলা হয় 'প্রতিবেশ'। প্রতিবেশের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পারলে কোন প্রাণীই টিঁকে থাকতে পারে না। ধরা যাক তিব্বতের কুকুর ও আমাদের দেশী কুকুর। তিব্বত ভয়ানক ঠাণ্ডা দেশ, প্রায় সারা বছর সেখানে বরফ পড়ে। সেখানকার দারুণ শীতে লম্বা পশম না হলে কোন জানোয়ারের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। লম্বা ও ঘন পশমের জোরেই তিব্বতের কুকুর সেখানকার বরফের রাজ্যে টিঁকে আছে। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ওরূপ লম্বা পশম হবে বেঁচে থাকার অন্তরায়।

প্রত্যেক গাছপালা এবং জীবজন্তুর দেহ ও স্বভাব এমন ভাবের হওয়া চাই যাতে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে, অথবা

আরেকভাবে বলতে গেলে,—প্রতিবেশের সঙ্গে নিজকে মানিয়ে চলতে পারে। গাছপালা ও জীবজন্তুর পক্ষে প্রতিবেশকে ভেঙ্গে গড়ে নিজের উপযোগী করা সম্ভবপর নয়। মানুষ বিজ্ঞানের বলে নিজের প্রতিবেশকে যৎসামান্য আয়ত্তাধীনে এনেছে,—কিন্তু তাও বিশেষ ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ব্যাপক কিংবা গভীরভাবে প্রতিবেশের পরিবর্তন সাধিত করা এখনো মানুষের সাধ্যাতীত। অতএব ইতর প্রাণী কিংবা মানুষ সকলের পক্ষেই বেঁচে থাকবার জন্যে আবশ্যক—প্রতিবেশের সঙ্গে নিজকে মানিয়ে চলা। একে বলা হয় অভিযোজন।

যে কোন উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর পক্ষে অভিযোজনই হল পৃথিবীতে টিকে থাকবার উপায়। যার অভিযোজন যত প্রকৃষ্ট তার পক্ষে জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার সম্ভাবনা তত বেশী। সংগ্রাম কঠোর হলে যারা যোগ্যতম তারাই শুধু টিঁকে থাকে, অপর সকলে ধরাশায়ী হয়। ডারুইন এর নাম দিয়েছেন 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (Survival of the Fittest)। এই মোলায়েম কথাটির অন্তরালে একটি কঠোর নিষ্করুণ সত্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সোজা ভাষায়, ব্যাপারটিকে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' না বলে, বলতে হয় 'দুর্বলের বিতাড়ন'। জীবন-সংগ্রাম যেন প্রকৃতির এক বিরাট ছাঁটাই-কল। যারা প্রতিবেশের সঙ্গে ঠিক ঠিক ভাবে অভিযোজন করতে পারছে না,—এই ছাঁটাই-কলের সাহায্যে প্রকৃতি তাদিগকে নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলে দিচ্ছেন।

অভিযোজন কি করে সাধিত হয় তা বুঝবার জন্যে একটি বিষয় তলিয়ে দেখতে হবে। 'পিতামাতার সঙ্গে সন্তান-সন্ততির সাদৃশ্য

যথেষ্ট থাকে ; কিন্তু তারা হুবহু পিতামাতার মত হয় না। মানুষের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে এক মা-বাপের সন্তান দুই ভাই কিংবা বোন ঠিক একরকম নয়। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর বেলায়ও তাই। সাধারণতঃ আমরা মনে করি সব ধানের গাছ, সব পিঁপড়ে, সব ইঁদুর-ছানা বুঝি কারখানায় তৈরি নিব অথবা পেন্সিলের ন্যায় ঠিক একই রকমের ও একই পরিমাপের,—তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যায় যে একটি সরিষা গাছ ঠিক আরেকটির মত নয়,—একটি চড়ুইপাখী হুবহু আরেকটির মত নয়। পিতামাতা হতে সন্তানের এই যে অল্প-স্বল্প (জীব বিশেষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম) প্রভেদ,—একে জীববিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'প্রকারণ' (Variation)। প্রকারণ যখন সূক্ষ্ম মাত্রার না হয়ে গভীর মাত্রার হয় তখন তাকে বলা হয় পরিব্যক্তি (Mutation)। একই রকম বীজ থেকে উৎপন্ন বেগুন ক্ষেতে দেখা গেল যে নিরানব্বইটি গাছেই বীজ অনুযায়ী বেগুন ফলেছে, কিন্তু বাকী একটি গাছে রাক্ষুসে আকারের কিংবা হয় ত কোনি সম্পূর্ণ নূতন রং কিংবা স্বাদের বেগুন ফলতে আরম্ভ হয়েছে। এই নূতন রকমের বেগুনের বীজ থেকে যখন আবার ফসল উৎপন্ন করা হল তখনো দেখা গেল যে নবাগত বৈশিষ্ট্য অথবা গুণ যথাযথ বজায় রয়েছে। এরূপ স্থায়ী ও গভীর মাত্রার প্রকারণের পারিভাষিক নাম পরিব্যক্তি।

প্রকারণ—জীবনসংগ্রামে জীবের সহায় অথবা অন্তরায় হতে পারে। ধরা যাক একটা টিয়াপাখীর নানা রংয়ের বাচ্চা হল, কোনটা লাল, কোনটা শাদা, কোনটা সবুজ ইত্যাদি। শাদা ও লাল বাচ্চাগুলি

নীড় থেকে বেরোলেই চিল, বাজ প্রভৃতি শিকারী পাখীদের দৃষ্টিতে পড়বে এবং তাদের পেটে যাবে। অপর পক্ষে সবুজ রংয়ের বাচ্চাগুলি সহজেই পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারবে,—পাতার রংয়ের সঙ্গে তাদের গায়ের রং মিশে যাবে, এবং তারা সহজে শিকারী পাখীদের চোখে পড়বে না। এদের সন্তান-সন্ততি প্রায়শঃ সবুজ রংয়ের হবে, অল্প-স্বল্প যে কটি অন্য রংয়ের হবে সেগুলি শত্রুহস্তে বিনষ্ট হবে,—প্রকৃতির ছাঁটাইকল তাদিগকে ছেঁটে ফেলে দিবে। অনেক পুরুষ পরে হয়ত সবুজ রংয়ের টিয়া ছাড়া আর কোন রংয়ের টিয়া থাকবে না। এইভাবেই আমাদের দেশের সবুজ টিয়ার উৎপত্তি হয়ে থাকবে। তারা যে প্রতিবেশে বাস করে তাতে সবুজ রং জীবন-সংগ্রামে সাফল্যলাভের পক্ষে খুব সহায়ক; অতএব অপর সকল রংয়ের টিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারাই টিঁকে গিয়েছে।

আরেকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সুদূর অতীতকাল; হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। আফ্রিকার প্রান্তরে বহুসংখ্যক জেব্রা চরে বেড়াচ্ছে; সবগুলির গায়ের রং যে ডোরা-কাটা তা নয়, পালের মধ্যে নানা রংয়ের জেব্রা রয়েছে। তৃণসম্ভার প্রচুর থাকাতে এবং বহিঃশত্রু বিশেষ না থাকাতে জেব্রাকুল সংখ্যায় বেড়েই চলেছে,—এমন সময়ে সেই প্রান্তরে এসে উপস্থিত হল একদল সিংহ। তারা এসেই মহা উল্লাসে জেব্রা-শিকারে লেগে গেল। দেখতে দেখতে জেব্রাকুল ধ্বংস হতে লাগল। যেগুলি বেশী দ্রুত দৌড়াতে অসমর্থ, সেগুলিই আগে মারা পড়ল। যেগুলির পা অপেক্ষাকৃত লম্বা ও মজবুত, এবং যারা দ্রুত দৌড়াতে সক্ষম, তারা প্রথমে পালিয়ে পালিয়ে বাঁচতে লাগল।

কিন্তু তাতেও কি রক্ষা আছে? সিংহদের মধ্যেও কতকগুলি ছিল দৌড়াতে মজবুত, তারা দ্রুতগামী জেব্রাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে শিকার ধরতে লাগল। তখন জেব্রাদিগকে অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হতে হল আত্মগোপনের উপরে। সিংহ দেখলেই ঝোপে-জঙ্গলে, গাছপালার আড়ালে জেব্রারা লুকোয়। কিন্তু যেগুলির গায়ের রং শাদা, কিংবা হলদে তাদের পক্ষে লুকানো তত সহজ নয়—তাদিগকে অনায়াসেই দেখতে পাওয়া যায়। যেগুলির গায়ের রং ডোরাকাটা তাদের পক্ষে লুকানো অপেক্ষাকৃত সহজ। গাছের ডাল-পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ ঢুকে যে আলোছায়ার সৃষ্টি করে তাতে ডোরা-কাটা জানোয়ার দাঁড়িয়ে থাকলে সহজে দৃষ্টিতে পড়ে না। জীবন-সংগ্রাম-রূপ প্রকৃতির ছাঁটাই-কলে প্রথমে ছাঁটাই হল মন্থরগামী জেব্রাদল,—তারপরে ছাঁটাই হল হলদে, শাদা প্রভৃতি রংয়ের জেব্রা;—টিঁকে রইল শুধু তারা যারা দ্রুতগামী এবং যাদের গায়ের রং ডোরাকাটা।

জেব্রাকুলের সংখ্যাহ্রাসের দরুণ অপরদিকে সিংহদের খাদ্য ক্রমশঃ দুর্লভ হতে লাগল। যে সকল সিংহ অপেক্ষাকৃত অধিক দ্রুতগামী ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি-সম্পন্ন তারাই কিছু কিছু শিকার ধরতে পারল, অন্যান্যগুলি ক্রমে উপবাসে খিন্ন হয়ে মারা পড়ল। প্রকৃতির ছাঁটাইকলে মন্থরগামী সিংহেরা এভাবে ছাঁটাই হয়ে গেল *। ক্রমশঃ সিংহ এবং জেব্রা—এই

* জীবন-সংগ্রাম কিরূপে নূতন 'প্রকার' কিংবা 'প্রজাতি' গঠনে সাহায্য করে তার দুটি সহজ দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল। দৃষ্টান্তগুলোকে সহজবোধ্য করবার জন্যে বাস্তব জীবনের জটিলতা কতক বাদ দিয়ে বলা হয়েছে। সুদূর অতীতে যে এরকম সব ব্যাপার ঘটেছে তা অবশ্যি বৈজ্ঞানিকদের অনুমান। পরীক্ষা দ্বারা এসকল অনুমানের সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। একটা খুব সহজ

উভয় প্রজাতির প্রাণী একটা স্থিতিসাম্যের অবস্থায় পৌছল, কেউ একেবারে নির্মূল হল না। জেব্রাদের বংশবৃদ্ধি এমনি হারে হয় যে প্রত্যহ কতকগুলি সিংহদের দ্বারা নিহত হলেও তাদের মোট সংখ্যার বিশেষ তারতম্য ঘটে না। সিংহেরা জেব্রার তুলনায় অনেক কম সংখ্যায় টিকে রইল। নিজেদের দেহধারণের জন্যে দুটি চারটি জেব্রা তারা যেমন করে হোক শিকার করে; কিন্তু তাদের প্রয়োজন কিংবা শিকারের সামর্থ্য এমন বেশী নয় যে জেব্রাকুল নির্মূল হয়ে যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে প্রত্যেক বিপর্যয়ের পরে এরূপ একটা স্থিতিসাম্যের অবস্থা উৎপন্ন হয় বলেই আমরা দেখতে পাই যে,—যাদের পরস্পরের মধ্যে নিত্যবৈরিতা কিংবা খাদ্য-খাদক সম্পর্ক—এমন অনেক প্রাণী একসঙ্গে বাস করছে, অথচ একে অপরের দ্বারা একেবারে নির্মূল হয়ে যাচ্ছে না।

উপরে বর্ণিত সব কথাগুলি একত্র করে জীবজগতে অভিব্যক্তি সম্পর্কে ডারুইনের ব্যাখ্যা দাঁড়াচ্ছে এরূপ। জীবজগতে আপনা-আপনি নানা বৈচিত্র্যের (প্রকারণের) উদ্ভব হচ্ছে। প্রত্যেক

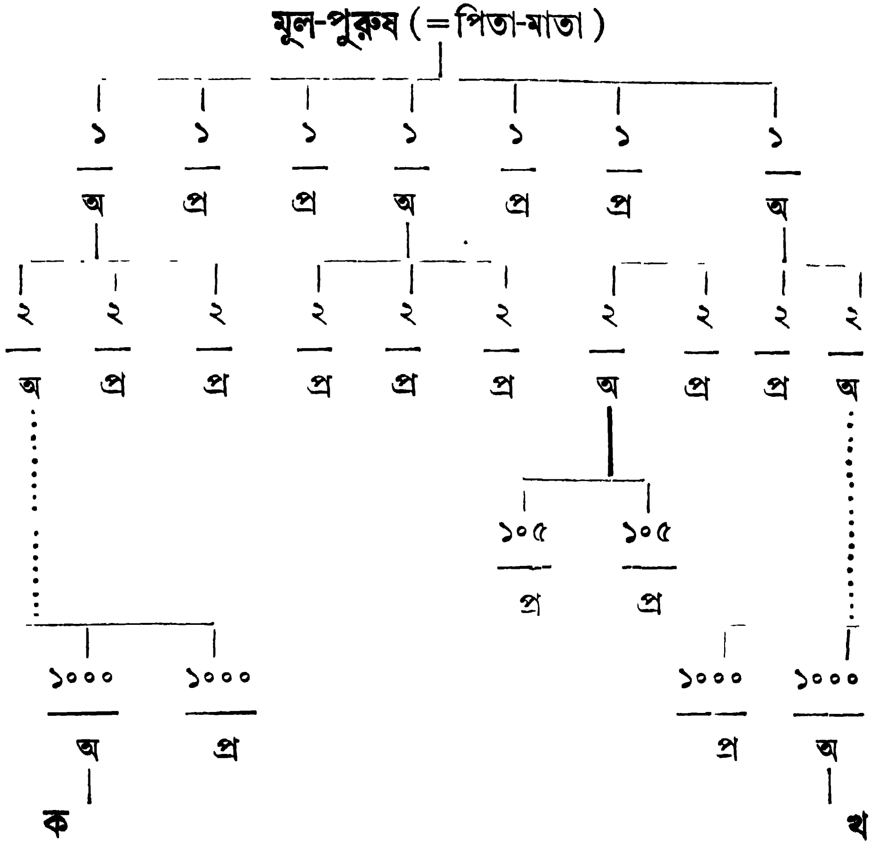
পরীক্ষার উল্লেখ করা হচ্ছে। ডি কেসনলা (Di cesnola) নামক বৈজ্ঞানিক (১৯০৪ খৃষ্টাব্দে) ২০টি সবুজ এবং ৪৫টি কটা রংয়ের গঙ্গাফড়িংকে খুব সরু রেশমী সূতা দিয়ে সবুজ ঘাসের উপর বেঁধে রাখেন। উনিশ দিন পরে কেসনলা দেখতে পান যে ৩৫টি কটা রংয়ের ফড়িং পাখীদের পেটে গিয়েছে; কিন্তু সবুজ রংয়ের ফড়িং তত সহজে পাখীদের নজরে না পড়াতে সবগুলিই বেচে আছে। আরেক জায়গায় শুকনো ঘাসের উপর ২০টি কটা এবং ২৫টি সবুজ রংয়ের ফড়িংকে বেধে রাখা হয়েছিল। সেখানে ১১ দিনের মধ্যেই সবুজ রংয়ের সবকটি ফড়িং সাবাড় হয়ে যায় কিন্তু উনিশ দিন পরেও কটা রংয়ের সব কটি ফড়িংকে জীবিত দেখা যায়।

প্রজাতির জীবের সন্তান-সন্ততির মধ্যে বহু প্রকারণ দেখা যায়। প্রতিবেশের অনুকূল প্রকারণ নিয়ে যে সকল সন্তান-সন্ততি জন্মে তারাই জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকে,অপর সবগুলি প্রকৃতির ছাঁটাইকলে ছাঁটাই হয়ে যায়। সন্তান-সন্ততি সবগুলি যে একই প্রতিবেশে থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নাই ; ঘটনাচক্রে তারা বিভিন্ন প্রতিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারে। একই গাছের বীজ বায়ুভরে কিংবা পাখীর ঠোঁটে হয়ে দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।* একই মাছের ডিম অথবা ছানা নদীর কিংবা সমুদ্রের স্রোতে দিকে দিকে চলে যায়। পশুপক্ষীর মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে। কতক জীবজন্তু ও গাছপালা আবার মানুষের প্রযত্নে নানা দেশদেশান্তরে চালান হচ্ছে। যে উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী যেরূপ প্রতিবেশের মধ্যে পড়বে সেখানেই তার অভি-যোজন হওয়া চাই, নতুবা সে বিনষ্ট হবে। উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে আমরা দেখেছি যে প্রকারণের সামান্য প্রভেদের উপরেই অনেক সময় অভিযোজন নির্ভর করে। অভিযোজনের ফলে এবং প্রতিবেশের পার্থক্যের দরুণ, প্রকারণজনিত প্রভেদ বংশানুক্রমে ক্রমশঃ গভীরতর হতে থাকে। বহু পুরুষের ব্যবধানে একইরকম জীবের সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রভেদ অবশেষে এত বেশী হয়ে দাঁড়াতে পারে যে তারা ভিন্ন ভিন্ন 'প্রকারের'(Variety) জীব বলে সহজেই গণ্য হয়ে পড়ে। অনেক পুরুষের ব্যবধানে এবং প্রতিবেশের বৈচিত্র্যের ফলে তাদের পার্থক্য ক্রমশঃ আরো গভীর হয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি, গণ, বর্গ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এগুলি অবশ্যি হাজার হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ বৎসরের ব্যাপার। নীচে একটি নক্সা দ্বারা এই পরিবর্তনের ধারাকে সূচিত করা হল।

[ভগ্নাংশগুলির উপরের সংখ্যা পুরুষের (Generations) জ্ঞাপক, এবং নীচের অক্ষরগুলি অভিযোজনের সূচক।

অ—প্রকারণ ও প্রতিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্যের ফলে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ও জীবনসংগ্রামে জীব জয়ী হয়েছে।

প্র—প্রকারণ ও প্রতিবেশের মধ্যে গরমিল হওয়াতে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ও জীবনসংগ্রামে পরাভূত হয়ে জীব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।]



ক ও খ এই দুটি জীব তাদের মূলপুরুষ থেকে প্রত্যেকে হাজার পুরুষ ব্যবধানে আছে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের প্রতিবেশের মধ্যে

গিয়ে পড়েছে। মূলপুরুষের বহু শাখা-প্রশাখা বিলুপ্ত হয়ে এই দুটিই অবশিষ্ট রয়েছে। পরস্পর দুহাজার পুরুষের ব্যবধানে এবং প্রতিবেশের পার্থক্যে মূলপুরুষ থেকে তারা এতদূর বদলে গিয়েছে যে তাদিগকে আর এক 'গোষ্ঠী' বলে চেনা যায় না ; তারা দুই বিভিন্ন 'প্রকার' কিংবা 'প্রজাতি'তে পরিণত হয়েছে। অভিব্যক্তির ধারা এখানেই শেষ হয়নি ;—ক এবং খ র সন্তানসন্ততির সূত্র ধরে আরো চলতে থাকবে।

জেব্রা ও সিংহের দৃষ্টান্তে স্থিতিসাম্যের কথা বলা হয়েছে। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী চিরস্থায়ী ভাবে স্থিতিসাম্যের অবস্থা ঘটলে জীবজগতের অভিব্যক্তি একেবারে বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা কখনো ঘটে নি এবং ভবিষ্যতে ঘটবার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। স্থানে স্থানে সাময়িক ভাবে সাম্যাবস্থা ঘটে ; কিন্তু কালক্রমে প্রতিবেশের পরিবর্তন না হয়ে যায় না। তখন আবার সব ওলট-পালট হয়ে যায়। এই ভাবেই জীবজগতের অভিব্যক্তি চিরকাল ধরে চলে এসেছে। ভূপৃষ্ঠের শীতাতপ যুগে যুগে এক রকম ভাবে থাকে না। পৃথিবীর উপরিভাগে কঠিন আবরণ থাকাতে ভূগর্ভের উষ্ণতা ও উহার ক্রমাগত অপচয় আমরা বুঝতেই পারি না। কিন্তু প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে না পারলেও এটা সত্যি যে ভূগোলক ক্রমশঃ শীতল হচ্ছে। আবার সূর্য থেকে ভূপৃষ্ঠে যে আলো ও উত্তাপ আসে, যুগে যুগে তার প্রভূত তারতম্য ঘটে। প্রথমতঃ পৃথিবীর কক্ষপথ চিরকাল একরকম থাকে না। সূর্য এবং বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের টানাটানির ফলেই পৃথিবীর কক্ষপথ রচিত হয়েছে। কখনো বড় বড় গ্রহ একসঙ্গে পৃথিবীর কাছাকাছি

এসে পড়ে, আবার কখনো তারা দূরে সরে যায়। ফলে এই হয় যে পৃথিবীর কক্ষপথ কখনো হয় প্রায় বৃত্তাকার, কখনো ডিম্বাকার, কখনো আরেকটু লম্বাধরণের উপবৃত্তাকার। ইহা সহজেই অনুমেয় যে কক্ষ-পথের এই পরিবর্তনের ফলে ভূপৃষ্ঠে শীত-গ্রীষ্মের ভয়ানক তারতম্য ঘটে। সাধারণতঃ আমরা জানি যে পৃথিবীর কক্ষতলের উপর পৃথিবীর বিষুবতল ঠিক সমান্তরাল নয়,—উহা প্রায় ২২½° ডিগ্রি কোণে কাৎ হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই কোণ চিরকাল সমান থাকে না ; ২২°-৬′ হতে ২৪°-৫০′ পর্যন্ত সীমাদ্বয়ের মধ্যে এর হ্রাসবৃদ্ধি চলতে থাকে। এই কারণেও ভূপৃষ্ঠে সূর্যাতপের যথেষ্ট তারতম্য হয়। অতীতে পৃথিবীর কয়েকটি তুষারযুগ গিয়েছে, ভবিষ্যতে আরো 'তুষারযুগ' দেখা দিবে। এই সকল পরিবর্তন অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলে ; পঁচিশ হাজার থেকে লক্ষ বৎসর, কিংবা তারও বেশী সময় লাগে। এসকল প্রধান কারণ ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণও আছে, যথা পলিমাটির দ্বারা নূতন দেশ গঠন, বন-জঙ্গলের আবাদ, সামুদ্রিক স্রোত ও বায়ুপথের পরিবর্তন ইত্যাদি। মানুষও বুদ্ধিকৌশলে বাঁধ-নির্মাণ, জলসেচন, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি নানা উপায়ে ভূপৃষ্ঠের এবং জলবায়ুর অল্লাধিক পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। এই রকম ভাবে নানা কারণে জীবের প্রতিবেশের পরিবর্তন চিরকাল ধরে হয়ে এসেছে এবং হতেই থাকবে। সুতরাং পৃথিবী যতদিন উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাসোপযোগী থাকবে ততদিন অভিব্যক্তির ধারাও বজায় থাকবে ; কখনো বন্ধ হবে না।

উপরে যে মতবাদ ব্যাখ্যা করা হল তা ডারুইনের প্রবর্তিত মতবাদ। তা ছাড়া লামার্ক, বার্গসেঁা প্রভৃতি মনীষী প্রবর্তিত অন্যান্য মতবাদও

রয়েছে,—কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজে সেগুলি তেমন আদৃত নয়। জীবন-সংগ্রাম, অভিযোজন, যোগ্যতমের উদ্বর্তন প্রভৃতি ব্যাপার ডারুইন যেমন বহুসংখ্যক দৃষ্টান্তের সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার ও ব্যাখ্যা করেছেন তা বস্তুতঃ বিস্ময়কর। এগুলির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। কিন্তু তা হলেও অভিব্যক্তির নিখুঁত ও পূরাপুরি ব্যাখ্যা ডারুইনের মতবাদের দ্বারা হয় না। তথ্যানুসন্ধানের ফলে জীবজগতে এমন অনেক ব্যাপার ধরা পড়েছে যেগুলিকে ডারুইনের মতবাদের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়ানো যায় না। এই বিষয়ের বিশদ বিচারে আমরা এখানে প্রবৃত্ত হব না। অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা সম্পর্কে ডারুইনের মতবাদ যে পরিত্যক্ত হয় নি তার কারণ এই যে অপর কোন সুষ্ঠুতর ব্যাখ্যা আজও আবিষ্কৃত হয় নি। প্রকারণ কেন হয়, এবং পিতামাতার গুণাগুণ কি নিয়মে ও কি প্রণালীতে সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয় তার কোন ব্যাখ্যা ডারুইন দিতে পারেন নি। প্রায় একশ বছর হতে চলল, ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ প্রচারিত হয়েছে এবং এ নিয়ে বহু তর্কাতর্কি এবং গবেষণা হয়েছে; কিন্তু এই দুই প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা এখনো হয় নি।* এই মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত অভিব্যক্তির ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ হবে না।

* বলা বাহুল্য বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চেষ্ট বসে নেই। এই সকল প্রশ্নের সমাধানের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা নানাদিক থেকে করা হচ্ছে। প্রজাতি-সঙ্করদের বেলায় কিরূপ প্রকারণের সৃষ্টি হয়, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের কিরূপ ক্রমবিকাশ হয় এই সকল সূত্র ধরে প্রকারণের রহস্য-ভেদের চেষ্টা চলেছে। মর্গ্যান নামক একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক জননকোষের ক্রমোসম-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি সাধনের দ্বারা প্রকারণ ও বংশগতির রহস্য নির্ণয়ের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে গিয়েছেন।

আদি-মানবের সন্ধানে

: আগেকার অধ্যায়গুলিতে দেখানো গিয়েছে যে জীবজগতে বৈচিত্র্যের বিকাশ ক্রমে ক্রমে হয়েছে। মানুষও জীবজগতের অন্তর্গত ;—মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে এখন একটু বিশদভাবে বলা হবে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ডারুইন যখন তাঁর 'Origin of Species' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন তখন তাতে মানুষের উৎপত্তি বিষয়ে তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নি ;—শুধু এইটুকু বলেছিলেন যে এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। কিন্তু ডারুইনের গ্রন্থপ্রকাশের অব্যবহিত পরেই হাক্সলি (Huxley), কার্ল ফগ (Carl Vogt) ও হেকেল (Haeckel) এই তিন জন প্রাণি-বিষ্ঠাবিশারদ পণ্ডিত মানবের উৎপত্তি সম্পর্কেও অভিব্যক্তিবাদ খাটাতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে হাক্সলি তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'জীবজগতে মানুষের স্থান' [Man's Place in Nature] প্রকাশ করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে হেকেলের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Generelle Morphologie প্রকাশিত হয়, এবং তাতে তিনি জীবজগতের অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের আবির্ভাবের পালা খুব স্পষ্টরূপেই নির্দেশ করে দেন। এর পাঁচ বছর পরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডারুইনের 'The Descent of Man' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং তাতে ডারুইন একথা বলেন যে বনমানুষ-গোষ্ঠীর কোন না কোন জীব থেকেই কালক্রমে মানুষের উদ্ভব হয়ে থাকবে। তার পর থেকে

বহু বৈজ্ঞানিক মানুষের অভিব্যক্তি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণা করে আসছেন।

সাধারণতঃ অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে বৈজ্ঞানিকদের মতে বানর কিংবা বনমানুষ থেকেই সরাসরি মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। এরূপ উৎপত্তি মানুষের মর্যাদার হানিকর ভেবে অনেক উষ্মাপ্রকাশ ও হাস্যজনক বাগবিতণ্ডাও হয়েছে। ব্যাপারটার কিন্তু গোড়ায় গলদ। জীববিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা এমন কথা কখনো বলেন নি যে বানর থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। এখন যে সমস্ত বানর ও বনমানুষ পৃথিবীতে আছে তারা কেউ সাক্ষাৎভাবে মানুষের পূর্বপুরুষ নয়; তবে সুদূর অতীতে—লক্ষ লক্ষ কিংবা কোটি বৎসর পূর্বে—কোন এক মূলপুরুষ অথবা বীজপুরুষ থেকে তাদের এবং মানুষের পূর্বপুরুষদের উৎপত্তি হয়েছিল বলে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন।

কোন বৈজ্ঞানিক একথা বিশ্বাস করেন না যে এখনকার মত চেহারা নিয়ে এবং বুদ্ধিমান জীবরূপে মানুষ সহসা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল। অভিব্যক্তির ফলে ইতরপ্রাণী থেকে কালক্রমে মনুষ্যাকার কোন জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তা থেকে ধীরে ধীরে মানব-প্রজাতির উৎপত্তি হয়েছে। ইহাই বৈজ্ঞানিকদের স্থির সিদ্ধান্ত। জীবজগতের একটি বর্গ হল প্রাইমেট। এই প্রাইমেটবর্গকে আমরা জীবনবৃক্ষের একটি শাখারূপে কল্পনা করতে পারি। এর বহু প্রশাখা ও অনুশাখা ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে গিয়েছে—অর্থাৎ প্রাইমেটবর্গের অনেক জীব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যে সব প্রশাখা ও অনুশাখা এখনো মাটির উপরে মাথা জাগিয়ে আছে,—সেগুলিই হল বর্তমান কালের

নানা প্রজাতির বানর ও বনমানুষ—এবং বিভিন্ন জাতীয় মানুষ। বিষয়টি পরিষ্কার করবার জন্যে জীবনবৃক্ষের প্রাইমেট শাখার দু'তিনটি নক্সা এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হল।

জীবজগতে অভিব্যক্তির নানাবিধ তথ্য ও প্রমাণ মোটামুটিভাবে আগেকার অধ্যায়গুলিতে দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য যে সেগুলি থেকে মানবের অভিব্যক্তিও সূচিত হয়। কিন্তু ইতর প্রাণী থেকে অভিব্যক্তির ফলে মানবের আবির্ভাব ঘটেছে—একথা জানলেই যথেষ্ট হয় না। আমরা জানতে চাই—সেই অভিব্যক্তির স্বরূপ কি ;—অর্থাৎ মানুষের পূরাপুরি বংশলতা আমরা পেতে চাই। বানরাকৃতি কিংবা বনমানুষাকৃতি কোন জীব থেকে একেবারে সরাসরি আদি মানবের আবির্ভাব নিশ্চয় ঘটে নি। এক এক কলা করে ক্রমশঃ ষোল-কলা মানবের আবির্ভাব হয়ে থাকবে। যে সকল অপূর্ণ মানব (খণ্ডমানব অথবা অর্ধমানব) পুরাকালে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নিয়েছে, তাদের অশ্মীভূত কঙ্কাল যদি খুঁজে বার করা যায়, তবেই মানবের অভিব্যক্তির ক্রম নির্ণীত হতে পারে। সেই অনুসন্ধান আরম্ভ হয় মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ; কিন্তু এরি মধ্যে তার যেটুকু ফল পাওয়া গিয়েছে তাতে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়।

হাক্সলি, হেকেল ও ডারুইন—এঁরা যখন মানবের অভিব্যক্তি সম্পর্কে নিজেদের মতবাদ প্রথম প্রচার করেন—তখন মানুষের পূর্ব-পুরুষদের কোন কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়ই-নি বলা যেতে পারে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর নিয়াণ্ডার্থাল নামক স্থানের গুহাতে একটি মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল—যেটাকে ঠিক মানুষেরও বলা যায় না, অথচ

যেটা ছিল এখনকার গরিলা, শিম্পাঞ্জী, কিংবা ওরাং-ওটাং অপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর কোন জীবের। উহা যে ছিল মানুষ এবং বনমানুষ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক গণভুক্ত কোন জীবের অস্থি—তা সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করতে পণ্ডিতদের অনেক বৎসর সময় লেগে যায়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ডক্টর উইলিয়াম কিং নামক একজন জীববিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত মত প্রকাশ করেন যে ঐ করোটির মালিক ছিল একটা আলাদা রকমের জীব; তিনি উহার নাম দেন নিয়াণ্ডার্থাল মানব (Homo Neander thalensis)। তখনি আপত্তি উঠেছিল যে একটি মাত্র নমুনা থেকে একটা নূতন প্রজাতি খাড়া করা কিছুতেই ঠিক হয় না। প্রকৃতির খেয়ালে অনেক সময় অস্বাভাবিক, কিম্ভূত-কিমাকার জীব দুএকটা জন্মগ্রহণ করে। ওটা যে কোন অস্বাভাবিক মানুষ কিংবা বনমানুষের করোটি নয়, তার নিশ্চয়তা কি? এই সন্দেহের নিরসন হয় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে যখন বেলজিয়মের স্পাই (Spy) নামক স্থানের একটি গুহাতে পাওয়া যায় ঠিক ঐ প্রকার গঠনের একাধিক অশ্মীভূত কঙ্কাল। তখন থেকে বৈজ্ঞানিকদের ঝোঁক পড়ল মানবের পূর্বপুরুষদের পরিচয়-চিহ্ন উদ্ধারের কাজে।

আজ পর্যন্ত কোটি কোটি নরদেহ এই পৃথিবীর মাটিতে কবর দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও অশ্মীভূত নরকঙ্কাল পাওয়া যায় খুব কদাচিৎ। পক্ষান্তরে মানবের পূর্বপুরুষেরা—সংক্ষেপে যাদের আমরা খণ্ড-নর কিংবা অর্ধ-নর বলতে পারি—সংখ্যায় ছিল খুব কম। মহাদেশগুলির বিশাল আয়তনের তুলনায় তাদের সংখ্যা ছিল একেবারে নগণ্য; এবং ধরাপৃষ্ঠ থেকে তারা চিরবিদায় নিয়েছিল

হাজার হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে। সুতরাং এ-হেন জীবের কঙ্কাল খুঁজতে যাওয়া যেন খড়ের গাদায় ছুঁচের তল্লাশ করা। এতে প্রথমতঃ চাই এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া—এসকল মহাদেশ খুঁজে বেড়াবার মত অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়—এবং তার সঙ্গে চাই দৈবের আনুকূল্য। খুঁজে বেড়াবার সময় মাটির উপরে খুঁজলে চলবে না,—খুঁজতে হবে মাটির নীচে কিংবা পাষাণের স্তরে স্তরে। কাজটি যতই কঠিন, এবং পরিশ্রমের ফলাফল যতই অনিশ্চিত হউক না কেন, বৈজ্ঞানিকেরা তাতে পশ্চাৎপদ হন নি। কৌতূহল তাঁদিগকে এই দুরূহ সন্ধানেও প্রবৃত্ত করেছে।

হল্যাণ্ড দেশে ইউজিন ডুবয় (Eugene Dubois) নামক একজন জীববিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে তাঁর জন্ম। চিকিৎসা-বিজ্ঞান- ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যয়ন শেষ করে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি আমস্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তাঁর যেরূপ প্রতিভা ও অধ্যবসায় ছিল তাতে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যাপকের পদ যথাসময়ে অনায়াসে পেতে পারতেন। কিন্তু ডুবয় সেই গতানুগতিক পথে গেলেন না। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে মানুষের পূর্বপুরুষের কোন চিহ্ন আবিষ্কার করা যায় কি না, সেই চেষ্টাতেই জীবন অতিবাহিত করবেন। তাঁর খেয়াল হল যে প্রতীচ্যে যা পাওয়া যায় নি, প্রাচ্যে হয় ত তার সন্ধান মিলবে। মালয় দ্বীপপুঞ্জে বড় বড় বানর ও বনমানুষ দেখতে পাওয়া যায়। ডুবয়ের ধারণা হল যে ওখানে ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান মিলতে পারে। তিনি প্রথমে চেষ্টা করলেন ওলন্দাজ-অধিকৃত ইস্ট-ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে নৃ-

তাত্ত্বিক ও প্রত্ন-তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজে একটা সরকারী বৃত্তি পাবার জন্যে; কিন্তু এই চেষ্টায় কৃতকার্য হলেন না। অবশেষে সৈন্যদলে ডাক্তারের চাকুরী নিয়ে পাড়ি দিলেন প্রাচ্যদেশে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ডুবয় গিয়ে উপস্থিত হলেন সুমাত্রা দ্বীপের 'পাডাং'নামক স্থানে। সেখানে ডাক্তারী কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকল তাঁর নৃ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান। সেই অনুসন্ধানের ফল কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হওয়াতে গবর্নমেণ্ট লজ্জার খাতিরে তাঁকে এই বিষয়ে অল্পস্বল্প সাহায্য করতে বাধ্য হলেন। সুমাত্রা দ্বীপে তেমন প্রাচীন ভূস্তরের সন্ধান না পাওয়াতে ডুবয় নিজের কার্যক্ষেত্র সরিয়ে নিলেন জাভাতে। ১৮৯০ থেকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অসীম ধৈর্যের সহিত তিনি অনেক জীবাশ্ম আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেন। যে সকল জীবাশ্ম তিনি খুঁজে বার করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে একটা ছিল মনুষ্যাকৃতি কোন জীবের নীচের চোয়াল। সেটা পেয়েছিলেন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পেলেন—সেই প্রকার জীবেরই উপরের মাড়ির একটা দাঁত। একমাস পরেই সেখান থেকে অল্প দূরে ভূগর্ভের ঠিক সেই স্তরেই খুঁড়ে পাওয়া গেল—একটা মাথার খুলি। যার জন্য এত চেষ্টা সেই ধরণের একটি বস্তু এতদিনে সত্যি সত্যি আবিষ্কৃত হল! ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ঐ স্থানের অনতিদূরে এবং ঠিক একই ভূস্তরে পাওয়া গেল বা' পায়ের ঊর্বস্থি। এই সবগুলি অস্থি ছিল একই প্রকার জীবের, এবং সে জীব ছিল না বনমানুষ,—না মানুষ। জীবটি ছিল অর্ধ-নর। ডুবয় তার নাম দিলেন—Pithec-anthropus erectus—অর্থাৎ ঋজুদেহ অর্ধ-নর।

(গ্রীক Pithecus—বানর, anthropus—মানুষ, erectus—দণ্ডায়মান, অর্থাৎ যে সোজাভাবে দাঁড়াতে ও হাঁটতে পারে) চলিত কথায় একে সাধারণতঃ বলা হয় 'জাভার মানুষ'।

দ্বিতীয় আবিষ্কার হয় জার্মানীর হিডেলবার্গ শহরের অনতিদূরে—১৯০৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। হিডেলবার্গের কাছে মোয়ার (Mauer) নামক স্থানে কিছুকাল যাবৎ খনিজ দ্রব্যের সন্ধানে খননকার্য চলছিল। বৈজ্ঞানিকেরাও এর উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছিলেন; যেহেতু ওখানে পর পর ৪০ টি ভূস্তর খুব পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল,—এবং স্তরগুলিতে বিভিন্ন যুগের জীবজন্তুর অশ্মীভূত কঙ্কালও যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছিল। খননকার্য এবং অনুসন্ধান প্রায় কুড়ি বছর চলবার পর খনির মালিক ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২১ শে অক্টোবর হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অটো সটেনসেককে (Dr Otto schoetensack) জানান যে মানবাকৃতি কোন জীবের একটা অশ্মীভূত অস্থি পাওয়া গিয়েছে। যা পাওয়া গিয়েছিল তা ছিল শুধু নীচের চোয়ালের হাড়। এই চোয়ালে থুতনীর চিহ্নমাত্র ছিল না। মানুষের চোয়াল অপেক্ষা উহা ছিল ঢের বেশী পুরু ও মজবুত। ওতে মুখগহ্বরের আয়তনের যে সূচনা দেয় তাতে বুঝা যায় যে ঐ জীবের বাক্‌শক্তি ছিল না। চোয়ালের খাঁজগুলি থেকে দাঁতের গড়নের যে আভাস পাওয়া যায় তাতে মনে হয় যে দাঁতগুলি ছিল ঠিক মানুষের মত। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিচার করে কোন সন্দেহ রইল না যে ঐ চোয়ালের মালিক ছিল বনমানুষ এবং মানুষের মাঝামাঝি কোন জীব। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'হিডেলবার্গের

মানুষ' [Homo Heidelbergensis or Palaeoanthropus Heidelbergensis.]

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ডক্টর সটেনসেক 'হিডেলবার্গ-মানবে'র বিবরণ প্রকাশ করেন। সেই বছরেই ইংলণ্ডের সাসেক্স জেলায় আবিষ্কৃত হয় পুরাকালের আরেকটি অশ্মীভূত নৃ-করোটি। মিঃ চার্লস ডসন নামক সাসেক্সের একজন উকীল অবসর সময়ে প্রাণিবিদ্যার চর্চা করতেন, এবং তাঁর সখ ছিল বিলুপ্ত জীবজন্তুর কঙ্কাল সংগ্রহ করা। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে একদিন তিনি পিল্টডাউনের (Piltdown) কাছে কোন গ্রাম্য আদালতে অধ্যক্ষতা করতে যাচ্ছিলেন। যাবার সময় এক জায়গায় দেখতে পান যে মজুরেরা চকমকি পাথর এনে রাস্তা মেরামত করছে। তখন সেটা তত খেয়াল করেন নি। কিন্তু আদালতে বসে বসে অকস্মাৎ তাঁর মনে হল যে নিকটে তাঁর জানামত অন্ততঃ চার মাইলের মধ্যে চকমকি পাথরের পাহাড় অথবা খনি নাই। অতদূর থেকে এই নরম পাথর আনানোতে যে খরচ পড়বে, তাতে ভাল শক্ত পাথরই ত আনানো যেতে পারত। তবে কেন চকমকি পাথর দিয়ে মেরামতের কাজ করানো হচ্ছে? দুপুরে খাবার ছুটির সময় ডসন সাহেব ছুটলেন এই সমস্যার সমাধান করতে। যেখানে রাস্তা মেরামত হচ্ছিল তার কাছেই দেখতে পেলেন চকমকি পাথরের একটি ছোট খনি,—যদিও সাসেক্স জেলার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রে তার অবস্থান দেখানো ছিল না। তিনি মজুরদের বল্লেন যে যদি খনিতে কোন জীবাশ্ম পাওয়া যায়, তবে তাঁকে যেন তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয়। এর অল্পকাল পরেই আরেক দিন যখন তিনি পিলটডাউনে গিয়েছেন তখন একজন মজুর এক টুকরা

অশ্মীভূত অস্থি তাঁর হাতে এনে দেয়। অস্থিটা ছিল মানুষ অথবা মনুষ্যাকৃতি কোন জীবের মাথার খুলির একটা টুকরা, এবং উহা ছিল সাধারণ নৃ-করোটির চেয়ে অনেক বেশী পুরু। সেই এক টুকরা অস্থি ছাড়া তখন আর কিছুই পাওয়া গেল না। কিন্তু তিন বছর পরে ওখানকার বৃষ্টির জলে-ধোয়া আবর্জনারাশির মধ্যে ডসন খুঁজে বার করলেন আরেক টুকরা অস্থি। উহাও ছিল মাথার খুলিরই একটা অংশ, এবং আগেকারটার চেয়ে আকারে একটু বড়। ভূগর্ভের যে স্তরে অস্থিগুলি পাওয়া গিয়েছিল তার প্রাচীনত্ব হিসাব করে—এবং অস্থিগুলি যে রকম পুরু ও মজবুত ছিল তার বিচার করে—ডসনের মনে হল যে এ সকল অস্থি হিডেলবার্গ-প্রজাতীয় কোন মানবের হয়ে থাকবে। তাই ভেবে অস্থিগুলি তিনি বৃটিশ মিউজিয়মের ভূতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট নিয়ে গেলেন। তার পর পিলটডাউনে আরও ব্যাপকভাবে খনন ও অনুসন্ধান করে করোটির অন্যান্য অংশ এবং চোয়ালের অস্থি ক্রমে ক্রমে পাওয়া গেল। সেগুলিকে ঠিকভাবে জোড়া লাগাতে এবং তাদের যথাযথ প্রকৃতি নির্ণয় করতে অনেক বৎসর কেটেছে। অবশেষে বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ প্রফেসার ইলিয়ট স্মিথ যেভাবে অস্থিগুলিকে জোড়া লাগিয়েছেন সেটাই অধিকাংশ পণ্ডিতের মনঃপূত হয়েছে। ইহাও সিদ্ধান্ত হয়েছে যে পিলটডাউনের মানুষ ছিল—নিয়ানডার্থাল অথবা হিডেলবার্গের মানুষ থেকে ভিন্ন প্রজাতির কিংবা গণের। এর নাম দেওয়া হয়েছে "ঊষা-মানব" (Eo-anthropus)। কেউ বলেন এই প্রজাতির মানুষ প্লিয়োসিন যুগে বিদ্যমান ছিল,—কেউ বা বলেন প্লিস্টোসিন যুগে।

এবারে আমরা পিকিংমানব বা চীনা-মানবের (Sinanthropus) আবিষ্কারের কথা বলব। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতেরা জাতিবর্ণনির্বিশেষে কি রকম ভাবে এক যোগে কাজ করতে পারেন—'পিকিং-মানবের' আবিষ্কার তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে পিকিং নগরীতে ডক্টর হেবারার (Dr.K.A. Haberer) নামক একজন ডাক্তার ও নৃতত্ত্ববিদ কোনো চীনা দোকানে কতকগুলি 'ড্রাগনের অস্থি' খরিদ করেন এবং সেগুলি তিনি মিউনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাক্স স্লসারের (Max Schlosser) নিকট পাঠিয়ে দেন। স্লসার ওগুলির ভিতরে দেখতে পান মানুষের দাঁতের ন্যায় একটি অশ্মীভূত দাঁত। ঐ দাঁতটির আকার-প্রকার সবিশেষ বিচার করে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও উহা ঠিক মানুষের দাঁত নয়। অধিকন্তু উহা ছিল এত প্রাচীন যুগের (টার্টিয়ারী) যে তখন ভূপৃষ্ঠে মানবের আবির্ভাব হয়েছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। শিবালিক পর্বতের কঙ্কালরাশির মধ্যে যে সকল বিলুপ্ত বনমানুষের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তাদের এক শ্রেণীর দাঁতের সঙ্গে উহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তা হলেও এই দাঁত কিছুতেই বনমানুষের দাঁত হতে পারে না। স্লসার সিদ্ধান্ত করেন যে হয় এই দাঁত প্রাচীনতম মানবের—নয় তো মানুষ এবং বনমানুষের মাঝামাঝি কোন জীবের। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এই সিদ্ধান্ত সাধারণ্যে প্রকাশ কবেছিলেন, এবং অসীম সাহসের সহিত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে চীনদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে এক দিন না এক দিন এই আদি-মানবের সুস্পষ্ট চিহ্ন

পাওয়া যাবেই যাবে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়।

আধুনিক চীনের জন্মদাতা ডক্টর সান-ইয়াৎ-সেন শুধু রাজনৈতিক বিপ্লবী ছিলেন না, চীন দেশে জ্ঞানচর্চার উন্নতি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিশিল্পের পুনর্গঠনের জন্য তিনি গোড়া থেকেই চেষ্টা শুরু করেন। চীনের কোথায় কি খনিজ দ্রব্য আছে তার বিস্তৃত অনুসন্ধান করে নক্সা প্রস্তুত করবার জন্য তিনি পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে শিক্ষা-প্রাপ্ত তিনজন চীনা বৈজ্ঞানিকের এক কমিশন নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁদের কাজে সাহায্য ও পরামর্শ দিবার জন্য আনা হয় সুবিখ্যাত সুইডিশ বৈজ্ঞানিক জে.জি. এণ্ডার্সনকে (Dr. J. G. Andersson)। খনিজ দ্রব্যের সন্ধান করতে গেলে সেই সঙ্গে ভূগর্ভে প্রাপ্ত জীবাশ্মের প্রকৃতিও বিচার করতে হয়, —কারণ জীবাশ্মের আকার-প্রকার অনেক সময় খনিজ সম্পদের সন্ধান বলে দেয়। চীনা কমিশনের বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের আবিষ্কৃত জীবাশ্মগুলির বিবরণ সুধীসমাজের অবগতির জন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করে যেতে থাকেন।

পিকিং নগরীর পশ্চিমদিকে ‘পশ্চিম পর্বত’ নামক সুরম্য পর্বত-শ্রেণী আছে। উহা শ্বেত-মর্মরের আকর। চূণা-পাথর এবং কয়লার খনিও ঐ পর্বতমালায় বিদ্যমান। ডক্টর এণ্ডার্সন জীবাশ্মের অনুসন্ধানে এই পাহাড়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন;—কারণ ঐ পর্বতের স্তরগুলির বয়স উত্তমরূপে নির্ণীত হয়েছিল, দ্বিতীয়তঃ উহার অনেক স্তরে বহু জীবাশ্ম পাওয়া যাচ্ছিল। প্রথমে তিনি ‘চি-কু-শান’ নামক

পাহাড়ে কাজ আরম্ভ করেন। একদিন শুনতে পান চীনা মজুরেরা বলাবলি করছে যে কাছেই 'চৌ কৌ টিং' পাহাড়ে রাশি রাশি জীবাশ্ম থাকতে কেন এই ভদ্রলোকটি এখানে পাথর খুঁড়ছেন। এণ্ডার্সন মজুরদের এই কথা অবজ্ঞা না করে তখনি চৌ-কৌ-টিং পাহাড়ে খননের কাজ সরিয়ে নিলেন (১৯২১)। প্রথমে জীবজন্তুর কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। কিন্তু একদিন রাশি রাশি চূণা-পাথরের মধ্যে পাওয়া গেল এক টুকরা স্ফটিক-পাথর (Quartz)। তখনি এণ্ডার্সন মনে মনে বল্লেন যে ওটা একটা শুভচিহ্ন, ওখানে নিশ্চয়ই আদি-মানবের সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু আদি-মানবের সন্ধান পেতে পেতে আরো পাঁচ বৎসর কেটে গেল। ইতিমধ্যে ঘটল খনন-কার্য চালাবার টাকার অভাব। তখন আইভর ক্রুগার নামক সুইডেনের একজন ধনী ব্যক্তি অর্থ-সাহায্য করে প্রচেষ্টাকে জীবিত রাখেন। চৌ-কৌ-টিংয়ের খনিতে যে সকল জীবাশ্ম পাওয়া যেত, সে-গুলি পাঠিয়ে দেওয়া হত সুইডেনের আপসালা (Upsala) বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে ও-গুলি পরীক্ষা করে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রফেসর ওয়াইম্যান ঘোষণা করেন যে চীন থেকে প্রেরিত জীবাশ্মগুলির মধ্যে প্রাচীনতম কালের দুটি মনুষ্য-দন্ত পাওয়া গিয়েছে। ঐ সময়ে ডক্টর ডেভিডসন ব্লেক পিকিং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শারীর-স্থান বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে চৌ-কৌ-টিংয়ে প্রাচীনতম যুগের একটি স্বতন্ত্র প্রজাতির মানুষের সন্ধানসূত্র পাওয়া গিয়েছে। খননকার্য পূর্ণ-বেগে চালাবার জন্য তিনি ঐ সময়ে আমেরিকার রকফেলার ফাউণ্ডেশনের (Rockfeller Foundation) কর্তৃপক্ষের নিকট

থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হন। এই নূতন প্রচেষ্টার ফল অচিরেই পাওয়া গেল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঠিক আগেকার জায়গাতেই আরেকটি মনুষ্য-দন্ত আবিষ্কৃত হল। ২রা ডিসেম্বর তারিখে চীনের ভূতত্ত্ব-পরিষদের সভায় ডক্টর ডেভিডসন ব্লেক ঘোষণা করলেন যে চৌ-কৌ-টিংয়ে প্রাপ্ত দাঁতগুলি যে জাতীয় মানবের কিংবা অর্ধ-মানবের ছিল—তারা ছিল একটি স্বতন্ত্র গণ ও প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। ব্লেক তার নাম দিলেন "চীনা-পিকিনী মানুষ" (Sinanthropus Pekinensis)। ব্লেকের এই দুঃ-সাহসিক উক্তিতে কেউ বা হলেন তুষ্ট, কেউ রুষ্ট। বিদ্বৎ-সমাজে ঘোর তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল—প্রথমতঃ দাঁতগুলির প্রাচীনত্ব নিয়ে,—দ্বিতীয়তঃ 'চীনা-পিকিনী মানুষ' বস্তুতঃ পৃথক গণ কিনা তাই নিয়ে। এই তর্কের মীমাংসা হতে কিন্তু বেশী দেরী হল না; কারণ অল্পকালের মধ্যেই আরো নূতন নূতন নিদর্শন পাওয়া গেল। প্রথমে পাওয়া গেল দুটি চোয়ালের হাড় এবং মাথার খুলির ভাঙ্গা টুকরা। তারপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখে চীনা প্রত্ন-তাত্ত্বিক মিস্টার ডব্লিউ. সি. পী. (W. C. Pei) আবিষ্কার করলেন পাষাণে প্রোথিত, এবং প্রায় অখণ্ড একটি নৃ-করোটি। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে চৌ-কৌ-টিং গুহাতে সংগৃহীত কতকগুলি অস্থি ঠিকভাবে সাজিয়ে পাওয়া গেল আরেকটি নৃ-করোটি। আরও কতক ভাঙ্গা টুকরো-টাকরা অস্থি পাওয়া গিয়েছে যাতে চীনা-পিকিনী মানুষের শারীর-সংস্থানকে তুলনামূলকভাবে বিচার করা চলে। বিচারে প্রায় স্থিরসিদ্ধান্ত হয়েছে যে 'চীনা-পিকিনী মানুষ' ছিল একটি স্বতন্ত্র গণ এবং উহার অস্তিত্বকাল

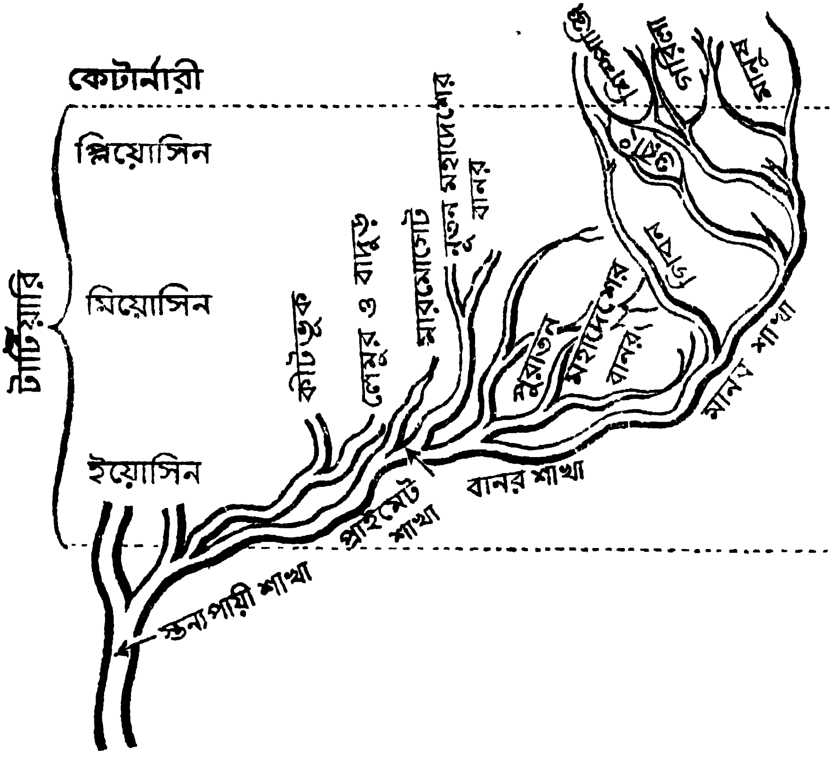
ছিল প্লিস্টোসিন যুগের প্রথমভাগ। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্স শ্লোসার যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা এইরূপে সফল হল।

অভিব্যক্তিবাদ যদি সত্য হয় তবে একথা ধরে নিতে হবে যে সত্যিকারের মানুষের আবির্ভাবের পূর্বে নানা বিচিত্র রকমের অপূর্ণ মানব পৃথিবীতে বিচরণ করেছিল। এই সম্ভাব্যতার সূত্র ধরেই আরম্ভ হয় আদি-মানবের সন্ধান। এই সন্ধানের ফলে যে সকল খণ্ডমানব কিংবা অর্ধমানবের অস্তিত্বের প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তার কয়েকটি এই অধ্যায়ে বর্ণিত হল। এগুলি ছাড়া 'রডেশিয়ার মানুষ' নামে আরেকটি মানব-শাখার সন্ধান অশ্মীভূত কঙ্কাল থেকে পাওয়া গিয়েছে। ক্রমে ক্রমে আরো অনেক বিলুপ্ত শাখা-প্রশাখার পরিচয় হয়ত পাওয়া যাবে।

এখনো আমরা আসল মানুষের—অর্থাৎ আমরা যে গণ ও প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত তার কথা বলি নি। বৈজ্ঞানিক ভাষায় আমাদের সংজ্ঞা homo sapiens (বিচার বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ)। এখন পৃথিবীতে যত জাতির মানুষ আছে (Races of Mankind) তারা সকলেই এই homo sapiens এর শাখা। তা ছাড়া 'ক্রোম্যাগ্নন' ও 'গ্রিমল্ডি' নামক দুটি বিলুপ্ত শাখার পরিচয় ইউরোপখণ্ডে পাওয়া গিয়েছে। কোথায় এবং কোন যুগে সত্যিকার মানুষ অর্থাৎ homo sapiensর আবির্ভাব হয়েছিল তার কোন নিশ্চিত সন্ধান আজও পাওয়া যায় নি। অনেকে মনে করেন এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে কোথাও ছিল homo sapiensর জন্মভূমি। শাখা-প্রশাখার অবস্থান জানলে বৃক্ষের কাণ্ডের অবস্থান সহজেই অনুমান করা যায়।

সমস্ত শাখা-প্রশাখা যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানেই কাণ্ড। পৃথিবীতে মানবজাতির শাখা-প্রশাখা যেভাবে ছড়িয়ে আছে সেগুলির ধারা অনুসরণ করলে মনে হয় যেন এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকেই সেগুলি চারদিকে ছড়িয়েছে। কারো কারো মতে মনুষ্যজাতির প্রথম জীব ভূমিষ্ঠ হয়েছিল আফ্রিকা মহাদেশে। আদিমানব তার জন্মকাল ও জন্মস্থান রহস্যের আবরণে ঢেকে রেখে গিয়েছেন। তার বংশধরেরা কোনকালে এ দুটি তথ্য জানবার জন্য এত ব্যাকুল হবেন তা তিনি ভাবতেও পারেন নি।

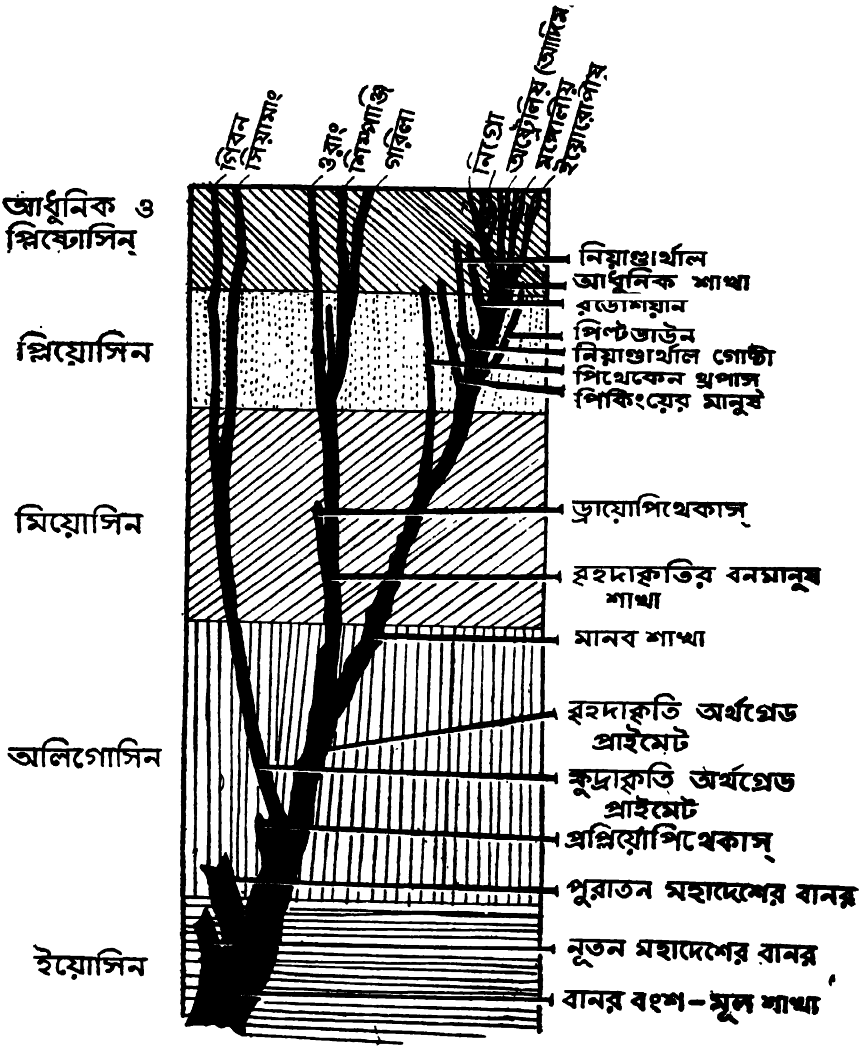
হেকেলের কল্পিত প্রাইমেটবর্গের বংশবৃক্ষ



সিলুরিয়ান যুগে প্রথম মেরুদণ্ডীর আবির্ভাবের বহু কোটি বৎসর পরে প্রাইমেট-বর্গের প্রথম জীব দেখা দেয় তৃতীয় (Tertiary) মহাযুগে। তার পর আরো দু'চার কোটি বৎসর পরে মানবশাখার জন্ম হয় খুব সম্ভবতঃ চতুর্থ (Quaternary) মহাযুগে।

জীবজগতের অভিব্যক্তির ধারা বেয়ে মানুষ ধরাপৃষ্ঠে এসেছে সব শেষে। কিন্তু মানুষই এখন পৃথিবীর সেরা জীব ; পৃথিবীতে তার কর্তৃত্ব সর্বোপরি এবং সর্বময়। বুদ্ধির বিকাশ এবং জ্ঞানচর্চাই এই প্রাধান্যের মূলে।

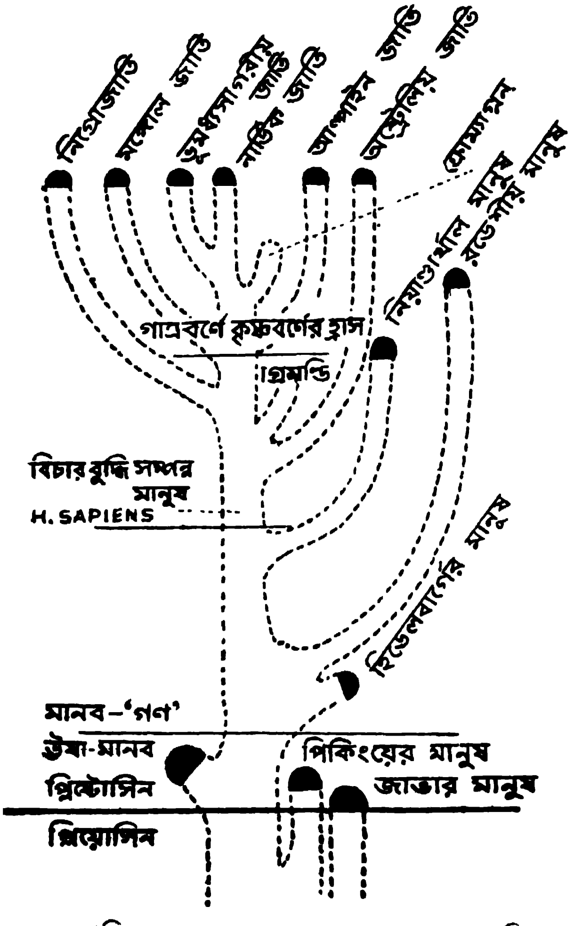
স্যার আর্থর কীথের পরিকল্পিত মানবের বংশবৃক্ষ



মূল প্রাইমেট শাখা থেকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক ডালপালা গজিয়েছে। তার কতক নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কতক এখনো টিকে আছে। যে সকল ডাল-পালা ভাঙ্গা এবং মাটির নীচে প্রোথিত দেখা যাচ্ছে সে-গুলি হচ্ছে বিলুপ্ত গণ এবং প্রজাতি। আর যে গুলো এখনো মাটির উপরে জেগে আছে সেগুলি হচ্ছে বর্তমান যুগের বিভিন্ন গণ, প্রজাতি ও জাতি।

মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রশাখার পারস্পরিক সম্পর্ক

প্রফেসর জি ইলিয়ট স্মিথের পরিকল্পনানুযায়ী



আমরা যে প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত তার নাম homo sapiens বা 'বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ'। বিচারবুদ্ধিই মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য; এর উৎকর্ষের জোরেই মানুষের যা কিছু উন্নতি।

মানব প্রজাতির দুটি জাতি যথা—'গ্রিমল্ডি' ও 'ক্রোম্যাগ্নন'—বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে আছে 'নিগ্রো' প্রভৃতি ছয়টি জাতি, এবং নানা মিশ্র জাতি। এদের মধ্যে যারা জ্ঞানচর্চায় যত মনোনিবেশ করেছে তারাই তত উন্নত ও প্রভাবশালী।

নৃতাত্ত্বিকেরা অনেকে মনে করেন যে আদি-মানবের গাত্রত্বক ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। নিগ্রো এবং অস্ট্রেলয়েড সেই কালো রং হুবহু বজায় রেখেছে। অন্যান্য জাতির মধ্যে কালক্রমে গায়ের রং অনেক পাতলা হয়েছে কিংবা একেবারে ফরসা হয়ে গিয়েছে।

পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় জাভা-নর, ঊষা-মানব, রডেশিয়ার মানব, ও নিয়াণ্ডার্থাল মানব—এই চারটি আদি-মানবের ছবি দেওয়া হল। সাধারণ ভাষায় এদের 'মানব' বলা হলেও একথা মনে রাখা উচিত যে এরা যথার্থ মানব ছিল না,—এরা ছিল আংশিক মানব, কিংবা মানব-সদৃশ জীব। এরা মানবের পূর্বপুরুষ নয়, কিন্তু খুব নিকট জ্ঞাতি। এদের সত্যিকার চেহারা কি রকম ছিল তা কেউ চোখে দেখে নি। যে সকল অশ্মীভূত কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে—অসীম ধৈর্যসহকারে সেগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে বৈজ্ঞানিকেরা এদের সত্যিকার চেহারা সম্পর্কে যে ধারণায় উপনীত হয়েছেন—ছবিগুলিতে তারি আভাস দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিকৃতিগুলি কাল্পনিক হলেও কবিকল্পনা নয়। প্রত্যেক অবয়বের গঠন, পরিমাপ, অনুপাত ইত্যাদি স্থির করতে বৈজ্ঞানিকদের অনেক মাথা ঘামাতে হয়েছে।

জাভা-নর



এদের মাথার খুলির ভিতরটা খুব বড় ছিল না। আয়তন দেখে মনে হয় মগজের পরিমাণ বনমানুষের চেয়ে বেশী হলেও মানুষের চেয়ে ঢের কম ছিল। শরীর ছিল লোমশ, বুক ছিল চওড়া.—হাত দুখানি ছিল বনমানুষের মত বেজায় লম্বা, হাঁটুর নীচ অবধি ঝুলে পড়ত। চোয়াল ও দাঁতের পাটি যেমন ছিল বড়, তেমনি মজবুত; মনে হয় হাড় চিবিয়ে খেত। মানুষের মত অত সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারলেও জাভার অর্ধনর দুপায়ে ভর করে হাঁটত—হাতে-পায়ে চলত না। মুখগহ্বরের আয়তন থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে মানুষের মত বাকশক্তি এদের ছিল না, ইতর প্রাণীর মত শুধু কতকগুলি অস্ফুট ধ্বনি সম্ভবতঃ উচ্চারণ করতে পারত।

উষা-মানব



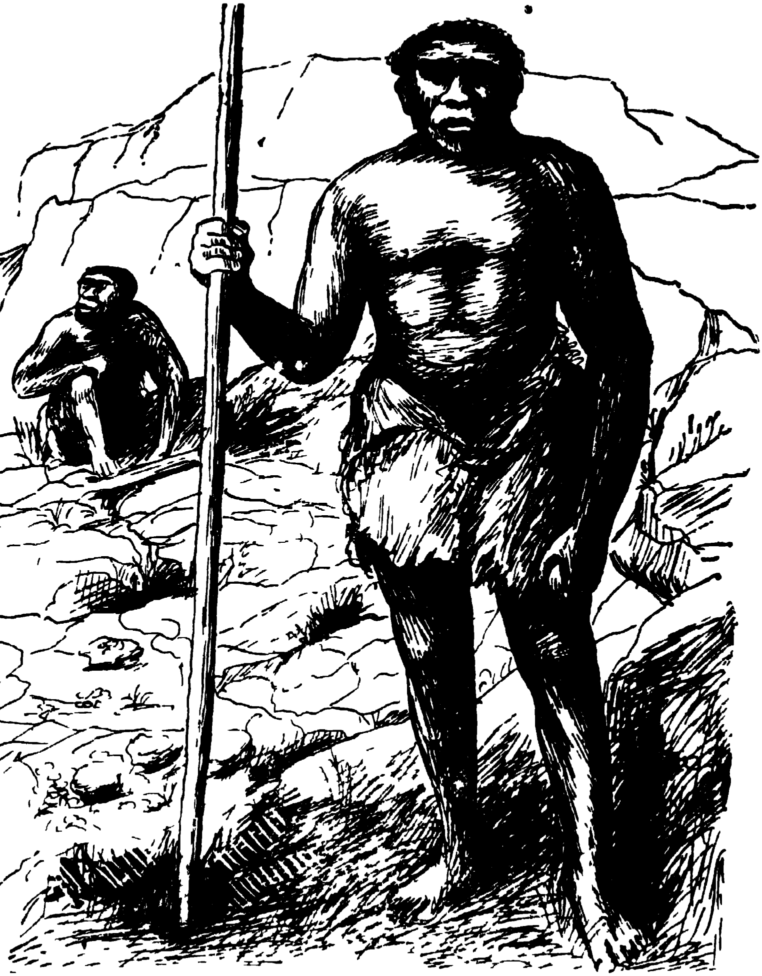
এদের থুতনি ছিল না বল্লেই হয়। দাঁত ছিল বড় বড় এবং ব্যবহারের দরুণ ক্ষয়ে যাওয়ার চিহ্ন তাতে বিদ্যমান। বাকশক্তি এদেরও ছিল না। কয়েকটা পাথরের অস্ত্রশস্ত্র উষামানবের কঙ্কালের কাছেই পাওয়া গিয়েছে। এদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। অনুমিত হয় এরা বন্য পশুর মত যদৃচ্ছ বিচরণ করত ;—ঘরবাড়ী দূরের কথা, কোন সাময়িক বাসস্থান কিংবা আড্ডা পর্যন্ত এদের ছিল না। অসংখ্য হিংস্রজন্তু-সমাকুল অরণ্যাবৃত ভূখণ্ডে কী দুশ্চিন্তায় ও কী কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যেই না এদের দিনরাত্রি কেটেছে ! একটি জিনিষই ছিল এদের প্রধান অবলম্বন, সেটি হচ্ছে দুর্জয় সাহস। কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধির অভাবে শুধু সাহসের জোরে এরা কিংবা জাভা-মানব, কেউ শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে নি।

নিয়াণ্ডার্থাল মানব



জার্মানীর নিয়াণ্ডার্থাল নামক স্থানের চূণাপাথরের গুহায় এই জাতীয় মানবের কঙ্কাল সর্বপ্রথম পাওয়া গিয়েছিল। পরে ইউরোপের আরো অনেকস্থানে পাওয়া গিয়েছে। লোকগুলি কিছু গাট্টাগোট্টা বেঁটে ছাঁদের ছিল। হাঁটু থেকে গোঁড়ালী পর্যন্ত পায়ের দৈর্ঘ্য ছিল বড়ই অল্প। শিরদাঁড়ার হাড়গুলিও আমাদের চেয়ে একটু পৃথক ধরণে সাজানো ছিল। সুতরাং মনে হয় তারা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত, দৌড়ধাপ করতে পারত না। এদের মাথার খুলির গড়নও আমাদের মত ছিল না। নিয়াণ্ডার্থালদের খুলি ছিল জাভা-নর, উষা-মানব কিংবা রডেশীয় মানবের মত। ছবিতেই দেখা যাচ্ছে যে ভ্রূর উপর থেকে কপাল হঠাৎ পিছন দিকে সরে গিয়েছে। খুলির ভিতরে মস্তিষ্কের (Brain) সম্মুখ-ভাগ অর্থাৎ কপালের ঠিক নীচেকার অংশ হল চিন্তাশক্তি ও ধারণাশক্তির আধার। মানুষের বেলায় মস্তিকের এই অংশ বেশ পুষ্ট ; অর্ধমানবদের বেলায় তা ছিল না। দুটি বিষয়ে নিয়াণ্ডার্থালেরা মনুষ্যত্বের দিকে এগিয়ে এসেছিল। প্রথমতঃ এরা নানারকমের প্রস্তরাস্ত্র ব্যবহার করত। দ্বিতীয়তঃ এরা মৃতদেহ কবর দিত, অর্থাৎ পরকাল বলে একটা কিছু আছে এরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা সম্ভবতঃ তাদের মনে জেগেছিল। নিয়াণ্ডার্থালেরা সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়েছিল এবং লক্ষাধিক বছর টিকেছিল। তাদের অস্তিত্বকালের শেষের দিকে ছিল চতুর্থ তুষার-যুগের প্রচণ্ড শীত ; স্কাণ্ডিনেভিয়া থেকে আল্পস পর্যন্ত ছিল জমাট-বাঁধা বরফ। ম্যামথ, বল্গা হরিণ প্রভৃতি তুষারমণ্ডলের প্রাণী ছিল নিয়াণ্ডার্থালদের প্রধান শিকার ও খাদ্য।

রডেশিয়ার মানব



১৯২১ খৃষ্টাব্দে রডেশিয়ার একটি গুহাতে এই গণভুক্ত মানবের মাথার খুলি ও কয়েকটি অস্থি পাওয়া যায়। এদের চেহারা ছিল ভয়ংকর। নাক, মুখ, চোখ ও ভ্রূর গঠনে গরিলার মুখাবয়বের সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে এদের দেহের গঠন ছিল নিয়াণ্ডার্থালদের চেয়ে অনেক বেশী মনুষ্যোপম। মাথার খুলি মেরুদণ্ডের উপর বেশ সোজাভাবে বসানো ছিল এবং মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ ছিল নিয়াণ্ডার্থালদের তুলনায় বড়। দাঁত এবং শরীরের হাড়-গুলি ছিল ঠিক মানুষের মত।

মানবের জাতি-বিভাগ

অভিব্যক্তিবাদের বিচারে আমরা ইহাই দেখতে পেয়েছি যে জীবজগতে বৈচিত্র্য এবং জটিলতার সৃষ্টি ক্রমশঃ হয়েছে। মানব প্রজাতির মধ্যে আমরা নানা জাতি দেখতে পাই। গুর্খা, ভুটিয়া, মণিপুরী, খাসিয়া, সাঁওতাল, প্রভৃতির দিকে তাকালেই মনে হয় তারা যেন বাঙ্গালীদের থেকে একটু ভিন্ন জাতির মানুষ ;—চেহারা-ছবিতে বেশ একটা পার্থক্য আছে। গুর্খাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য অবশ্য আছে ; কিন্তু তাদের সকলের মধ্যে এমন একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যও আছে যাতে তাদিগকে পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী ও ইংরেজ প্রভৃতি অন্যান্য লোকদের থেকে সহজেই আলাদা করে দেয়। চেহারা দেখে এরূপ জাতি-বিভাগের ব্যাপারটা প্রথমে খুব সহজ মনে হলেও আসলে তা নয়। বিচার করতে বসলেই নানা গোলমাল বাঁধে।

মনে রাখা উচিত যে এখানে আমরা যে জাতি-বিভাগের কথা বলছি তা নিছক প্রাণি-বিজ্ঞানের দিক থেকে। ভাষা, পোষাক, বৃত্তি, সমাজ, সভ্যতা—ইত্যাদির কোন বিচার এখানে করা হচ্ছে না। এগুলি দিয়ে জাতি-বিচার করা যায় না। একই জাতির মধ্যে বিভিন্ন ভাষা ও সভ্যতা প্রচলিত থাকতে পারে। যেমন বর্মী ও চীনাদের মধ্যে। আবার বিভিন্ন জাতির মধ্যে একই ভাষা ও সভ্যতার প্রচলন ঘটতে পারে, যেমন আমেরিকান যুক্তরাজ্যে যারা বসতি স্থাপন করেছে এমন ইংরেজ, ইটালীয়ান, ইহুদী ও নিগ্রোদের মধ্যে।

প্রাণি-বিছ্যার বিচারে আকৃতি ও শারীরিক গঠন দিয়ে প্রধানতঃ শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কখনো বা শারীরবৃত্তের খুঁটিনাটিও তুলনা করা হয়। আকৃতি নিয়ে বিচার করতে গেলে সহজেই চোখে পড়ে বৈচিত্র্য। বস্তুতঃ প্রত্যেক মানুষের চেহারাতেই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা সাদৃশ্য থাকে এবং সেটাকে খুঁজে বার করাই বিজ্ঞানের কাজ। সেজন্য এক একটা সূত্র ধরে শ্রেণীবিভাগ করবার আবশ্যক হয়। যদি গায়ের রং ধরে বিচার করি তবে ইউ-রোপের অধিকাংশ লোককে বলতে পারি এক জাতি। কিন্তু যদি নাকের গঠন দিয়ে বিচার করি, তবে ইহুদীদের আলাদা করে দিতে হবে। যদি চোখ ও চুল দিয়ে বিচার করি তবে তুন্দ্রাঞ্চলের এস্কিমো-দের ফেলতে হবে আরেক কোঠায়। যদি শরীরের কাঠাম ও উচ্চতা দিয়ে বিচার করি, তবে শ্রেণীবিভাগ হয়ে যাবে ভিন্ন রকমের। অতএব কোন অবয়বের আকৃতি-প্রকৃতি দিয়ে বিচার করব এবং একসঙ্গে ক'টা বিষয় নিয়ে তুলনা করব—তার উপরে শ্রেণীবিভাগ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

জাতি-বিভাগের জন্য সাধারণতঃ এই কয়টি বিষয় নিয়ে বিচার করা হয় :—

১। গায়ের রং—গায়ের রং শাদা, গোলাপী, তামাটে, কটা, বাদামী, কালো, পীতাভ প্রভৃতি কত রকমের দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এরূপ একটি ধারণা আছে যে শীতের দেশে লোকের গায়ের রং ফর্সা হয় এবং গরমদেশে কটা, বাদামী, কালো ইত্যাদি হয়। কিন্তু এই ধারণা ভুল। একই অক্ষরেখায় অবস্থিত এবং একই প্রকার জল-

বায়ু-বিশিষ্ট বিভিন্ন স্থানে যে সকল মানবসমাজ বহু শতাব্দী যাবৎ বসবাস করছে বলে জানা গিয়েছে—তাদের মধ্যেও রংয়ের পার্থক্য যথেষ্ট দেখা যায়। নৃতত্ত্ববিদেরা আজকাল মনে করেন যে শুধু জল-বায়ুর তারতম্যে গায়ের রং বদলায় না। এই পার্থক্যের কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে। এবিষয়ে কোন সর্বমান্য সিদ্ধান্ত এখনো হয় নি। একটা মতবাদ হচ্ছে এই যে আদি-মানবের গাত্রবর্ণ ছিল কালো। কিন্তু মানব-প্রজাতির শৈশবাবস্থায় এখনকার চেয়ে প্রকারণের ছড়াছড়ি ছিল অনেক বেশী। এই প্রকারণের ভিতর দিয়েই ভিন্ন ভিন্ন গাত্রবর্ণ দেখা দিয়েছিল। পরে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তার বাছাইয়ের কাজ করেছে। যাদের গাত্রচর্মের রং গাঢ় তারা সূর্যের প্রখর উত্তাপ সহ্য করতে পারে; এজন্য তারা গরমদেশে অপেক্ষাকৃত সহজে টিকতে পেরেছে ও সংখ্যাধিক্য লাভ করেছে। গরমদেশে বাস করবার ফলে যে গায়ের রং কালো হয়েছে তা নয়। ব্যাপারটা তার ঠিক উলটো। অর্থাৎ গায়ের রং গাঢ় বলেই তারা প্রখর রোদ সহ্য করে গরমদেশে টিকে গিয়েছে ও প্রাধান্য পেয়েছে। আবার সৌন্দর্যের আদর্শও সর্বত্র সমান নয়। এক এক জাতি ও এক এক সমাজে একটা বিশেষ গাত্রবর্ণ ও চেহারাকে 'সুন্দর' বলে গণ্য করা হয়। বিবাহের সময়ে সেই বিশিষ্ট ধরণের 'সুন্দর' পাত্র-পাত্রী বাছাইয়ের ফলে অন্য পাঁচ ধরণের সুন্দরের আদর্শ ক্রমে সংখ্যাল্প কিংবা বিলুপ্ত হয়েছে;—কারণ তারা বংশবিস্তারের তেমন সুযোগ পায় নি।

২। চুল—চুলের রং কাল, কটা, ধূসর প্রভৃতি আছে। আবার অন্যান্য পার্থক্যও রয়েছে। কোন চুল মসৃণ ও নরম, কোন চুল খস-

খসে কিংবা সজারুর কাঁটার ন্যায় খাড়া। কোন চুল সোজা, কোনটা ঢেউ-খেলানো, কোনটা বা ভেড়ার লোমের মত কোঁকড়ানো। সাধারণতঃ আমরা ভাবি যে সব রকম চুল ও লোম বুঝি খুব সরু নলের মত নিখুঁত গোলাকার। বস্তুতঃ তা নয়। নিগ্রোদের চুল ফিতার মত চেপটা এবং সেজন্যই এত কোঁকড়ানো। মঙ্গোলদের চুল গোল এবং শক্ত। ভূমধ্যসাগরীয় ও আল্লাইন জাতিদের চুল ঠিক গোলও নয় চেপ্টাও নয় (Elliptical) ; কিন্তু মোলায়েম এবং প্রায়শঃ ঢেউ-খেলানো।

৩। উচ্চতা—সকল জাতির গড়-পড়তা উচ্চতা সমান নয়। আমরা সচরাচর দেখতে পাই যে একজন সাধারণ পাঠান অথবা জাঠ, একজন সাধারণ বাঙ্গালী কিংবা মাদ্রাজীর তুলনায় বেশ অনেকটা উঁচু। সুইডিশ প্রভৃতি নর্ডিক জাতীয় লোকেরা আরো লম্বাচৌড়া। সব চেয়ে ঢেঙ্গা হচ্ছে প্যাটাগনিয়ার অধিবাসীরা। তাদের গড়-পড়তা উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। পশুছাল পরে পাহাড়ের উপর দিয়ে যখন কোন প্যাটাগনিয়ান লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে তখন দূর হতে তাকে দেখে মনে হয় যেন রূপকথার দৈত্যদানা। আবার অনেক খর্বকায় 'বামন' জাতিও পৃথিবীতে আছে। সাতপুরা পর্বতের 'কর্কু' জাতি, মালাবারের জংলী বেদ্দা, আন্দামানী ও আফ্রিকার বুশম্যান প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত।

৪। মাথার ও করোটির আকৃতি—উপর দিক হতে তাকালে কারো মাথাকে মনে হয় 'লম্বাটে,' কারো মাথাকে মনে হয় 'গোল'। নৃতত্ত্ববিদেরা মাথার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত কষে জাতিনির্ণয়ের চেষ্টা করেন।

আজকাল এই পদ্ধতির খুব প্রচলন। জীবন্ত মানুষের মাথার মাপ থেকে যে অনুপাত পাওয়া যায় তাকে বলা হয় 'মস্তকের সূচক' (Cephalic Index)। আর শুধু করোটির অস্থি মেপে যে অনুপাত পাওয়া যায় তাকে বলা হয় 'করোটিকা-সূচক' (Cranial Index)। একই জাতি কিংবা উপজাতির অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির করোটিকা-সূচক সাধারণতঃ একই সংখ্যা হতে দেখা যায়, কিন্তু জাতিতে জাতিতে করোটিকা-সূচকের সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। সুতরাং জাতি কিংবা উপজাতি নির্ণয়ের ব্যাপারে করোটিকা সূচকের মূল্য যথেষ্ট।

৫। মুখের আকৃতি—জাতিতে জাতিতে মুখাবয়বের কতক পার্থক্য দেখা যায়। কোন জাতির লোকদের মুখ সাধারণতঃ লম্বাটে ধরণের, কোন জাতির হয় ত গোলগাল; কারো কপাল উঁচু, কারো নীচু; কারো চিবুক খাট, কারো হয়ত অপেক্ষাকৃত লম্বা। চীনাদের মধ্যে গালের হাড় উঁচু, নিগ্রোদের মধ্যে ঠোঁট খুব পুরু। এই রকম বহু বিচিত্র রকমের মুখাবয়ব মানবপ্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন দলের লোকদের মধ্যে দেখা যায়।

৬। নাক—ধারাল, মোটা, উঁচু, নীচু, মাঝারি, সোজা, বাঁকানো ইত্যাদি বহু ধরণের নাক লোকসমাজে দেখতে পাওয়া যায়। ইহুদীদের ধারাল এবং বাঁকা নাক প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদীয় আর্যদের উঁচু নাকের খুব বড়াই ছিল। অনার্যদের বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁরা শুধু খাঁদা বলে তুষ্ট হতে পারেন নি, বলেছেন 'অনাস' অর্থাৎ একেবারে নাসাবিহীন।

৭। চোখ—বড় বড়, মিটমিটে, টানা (পটল-চেরা), গোল, ভাসা-ভাসা, কিংবা কোটরগত—ইত্যাদি নানা রকমের হয়ে থাকে। চক্ষু-

তারকার রংয়েও বৈচিত্র্য দেখা যায়। আমাদের দেশে কালো রংয়ের প্রাধান্য, কটা রংয়ের চোখ দুচার জনের মাত্র দেখা যায়। ইউরোপীয়দের মধ্যে বিড়ালাক্ষ ও বিড়ালাক্ষীদের সংখ্যা বহু।

জাতি কিংবা উপজাতি বিভাগের জন্য উপর্যুক্ত সাতটি লক্ষণ ছাড়া কেউ কেউ রক্তবিশ্লেষণ ও শারীর বৃত্তের ব্যাপারও ধর্তব্যের মধ্যে আনেন। এই সবগুলি মিলিয়ে জাতি এবং উপজাতি নির্ণয় মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। পণ্ডিতদের মধ্যেও এ বিষয় নিয়ে মতভেদের অন্ত নাই। অধিকাংশ নৃতত্ত্ববিদের মতানুযায়ী বর্তমানের সমগ্র মানবপ্রজাতি মূলতঃ ছয়টি প্রধান জাতিতে বিভক্ত। যতদূর জানতে পারা যায় খৃষ্টপূর্ব ১০০০০ অব্দের আগেই এই জাতিবিভাগ সুস্পষ্ট-রূপে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। মূল বাসস্থান থেকে নির্গত হয়ে মানবপ্রজাতির ছয়টি শাখা কোথায় কোথায় বসতি স্থাপন করে পৃথক পৃথক জাতিতে পরিণত হয়েছিল,—তার পরিচায়ক একটি নক্সা এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হয়েছে।

মানবেতিহাসের ধারা অনুসরণ করবার জন্য ছয়টি প্রধান জাতির পরিচয় জানা আবশ্যক। কিন্তু তাদের বর্ণনা দেবার আগে অপর দু'একটি বিষয় উল্লেখ করা সমীচীন হবে। সমগ্র মানবপ্রজাতির উৎপত্তি যদি এক হয় তবে নিগ্রো, ইংরাজ প্রভৃতি নিতান্ত বিসদৃশ চেহারার বিভিন্ন জাতীয় লোকের উদ্ভব কিরূপে হল তা জানবার কৌতূহল আমাদের মনে খুবই জাগে। এ বিষয়ে কোন স্থির ও সর্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত এখানো হয় নি। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ হেডন সাহেবের (A.C.Haddon) মতের সারমর্ম এখানে দেওয়া হচ্ছে। "আদিম

যুগে মানবপ্রজাতির বিভিন্ন শাখা চারদিকে ছড়িয়ে যেতে যেতে এক এক দল এক এক দেশে বসতি স্থাপন করে। সেই সকল দেশের জলবায়ু ও ভৌগোলিক সংস্থান ছিল বহু বিচিত্র রকমের। ছড়িয়ে-পড়া দলগুলির মধ্যে মেলামেশা অসম্ভব না হলেও খুব কম ছিল—কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই ছিল না। অতএব তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক এবং রক্তের মিশ্রণ হয়ে গিয়েছিল কার্যতঃ বন্ধ। মনুষ্যদেহের যন্ত্রপাঁতির ক্রিয়াকলাপের সূক্ষ্মতত্ত্ব যাই হোক না কেন, অভিজ্ঞতা থেকে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে জলবায়ুর প্রভাব অপরোক্ষভাবে জননকোষের উপর তার ছাপ অঙ্কিত করে। এইরূপে জলবায়ুর প্রভাব সন্তানসন্ততির উপর প্রতিফলিত হয়। একই ভৌগোলিক অবস্থানে যারা বহু পুরুষ ধরে বাস করে, তাদের আকৃতি-প্রকৃতিতে ক্রমশঃ ফুটে উঠে একটা দলগত বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতিক নির্বাচন এই বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলতে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য করে। যদি বাইরের কোন সমাজের সঙ্গে রক্তের যোগাযোগ অর্থাৎ বৈবাহিক সম্বন্ধ না ঘটে, তবে বৈশিষ্ট্য খুব উত্তমরূপে ফুটে। যাদের মধ্যে আকৃতি-প্রকৃতির এরূপ একটা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়েছে নৃতত্ত্বের বিচারে তারাই এক 'জাতি'। সুদূর অতীতে মৌলিক 'জাতি' সমূহের সৃষ্টি এ রকম ভাবেই হয়ে থাকবে।

"প্রত্যেক জাতির মধ্যে আকৃতি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও দেশে দেশেই এমন অনেক নর-নারী দেখা যায় যাদের চেহারা সেখানকার 'জাতীয়' চেহারার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এই না-মেলার কারণ এক হতে পারে প্রকারণ, আর হতে পারে রক্তমিশ্রণ। কোন কোন

ক্ষেত্রে দলকে দল লোক এরূপ দেখা যায় যাদের কোন সুপরিচিত এবং সুনির্দিষ্ট জাতির পর্যায়ে ফেলা যায় না। বিবিধ প্রকারের রক্তমিশ্রণ হয় ত এর কারণ; কিংবা এটাও অসম্ভব নয় যে তাদের মধ্যেই আমরা কতক আভাস পাই আদিম মানবের আসল চেহারার—যার উপর কোন নির্দিষ্ট স্থানের জলবায়ু এখনো গভীর দাগ কাটতে পারে নি।”

উৎপত্তির সময়ে অবস্থা যেরূপই থাকুক না কেন, পরে সেই অবস্থা বজায় থাকে নি এবং কোন জাতিই নিজের বিশুদ্ধতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে নি। প্রত্যেক জাতি নানা উপজাতিতে বিভক্ত হয়েছে। জাতিতে জাতিতে, উপজাতিতে উপজাতিতে বহু মিলন মিশ্রণ হয়েছে এবং হচ্ছে। কোন যুগে এবং কোন দেশে হয়ত বেশী পরিমাণে হয়েছে, অপর কোন যুগে এবং দেশে হয় ত অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে জাতি একটা খুব স্বতন্ত্র, অবিমিশ্র, এবং চিরস্থায়ী জিনিষ নয়। এর ভাঙ্গাগড়া চিরকাল ধরে হয়ে আসছে। আমরা শুনে ও বিশ্বাস করে আসছিলাম যে বাঙ্গালীরা আর্য,—অন্ততঃ উচ্চবর্ণের হিন্দু ও অভিজাত-শ্রেণীর মুসলমানেরা। কিন্তু উপরে জাতি-বিভাগের যে সাতটি লক্ষণ বলা হল, তার সঙ্গে মিলিয়ে যদি আমরা বাঙ্গালীদের আকৃতি বিচার করি, তা হলে সাধারণ দৃষ্টিতেও দেখা যায় যে বহু “অনার্য” চেহারা আমাদের হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের অনেক বড়ঘরেও যথেষ্ট বিদ্যমান। অধুনা নৃতত্ত্ববিদেরা মাথা মেপে এবং নাক-মুখ-চোখ ইত্যাদির বিচার করে আমাদের ‘আর্যামি’ প্রায় বাতিল করে দিয়েছেন। কিন্তু তা হলে কি হবে? আমরা এখনো সেই বৈদিক যুগের আর্য কিংবা পাঠান-মোগল সেজে বসে আছি।

হোমিওপ্যাথিতে ওষুধকে যতই পাতলা করা যায়, ততই তার 'শক্তি' বাড়ে। আভিজাত্যের নিয়মটাও সেই ধরণের। অভিজাতবংশের রক্তটা যতই পাতলা হয়ে আসে, আভিজাত্যের গর্ব ততই ফেঁপে উঠে।

মানব-সমাজে বর্ণবিদ্বেষ ও জাতিবিদ্বেষ যথেষ্ট প্রবল। মনে হয় যেন শ্বেতকায় জাতি বর্ণ-বিদ্বেষের পোষণে ও প্রচারে চিরকাল ধরে অগ্রণী। প্রাচীন ভারতে কৃষ্ণকায় অনার্যদের প্রতি আর্যদের অবজ্ঞার ভাব থেকেই অস্পৃশ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল। পরে অবশ্যি ডালপালা অনেক গজিয়েছে। ইউরোপীয় শ্বেতকায় জাতিদের প্রাধান্য পৃথিবীতে স্থাপনা হওয়া অবধি বর্ণ-বিদ্বেষের মাত্রা আরো বেড়েছে। এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশে যেখানেই ইউরোপীয় শ্বেতকায়েরা উপনিবেশ কিংবা প্রভুত্ব স্থাপন করেছেন সেখানেই তারা কৃষ্ণকায় এবং পীতকায় জাতিদিগকে সব রকমে দাবিয়ে কিংবা দূরে ঠেকিয়ে রেখেছেন।

'জাতি'র উৎপত্তি ও স্বরূপ যাই হোক না কেন, জাতিতে জাতিতে যে বুদ্ধি-শক্তি ও হৃদয়বৃত্তির কোন মৌলিক প্রভেদ নাই,—তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষা, সুযোগ ও উদ্যমের ফলে সকল জাতির মানুষই যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উচ্চতম শিখরে উঠতে পারে এবং এগুলোর অভাবে সকল জাতির মানুষই যে একেবারে অধঃপাতে যেতে পারে তার পরীক্ষা ইতিহাসে বারংবার হয়ে গিয়েছে। অবশ্য এক এক জাতির প্রতিভা এক এক বিষয়ে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করতে পারে, যেমন কারো বা আধ্যাত্মিক চিন্তায়, কারো রাজ্যবিস্তারে, কারো ব্যবসা-বাণিজ্যে।

এবারে আমরা মানব প্রজাতির অন্তর্গত ছয়টি প্রধান জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি।

(১) অষ্ট্রেলয়েড বা অষ্ট্রেলিয়ান জাতি—পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এই জাতির আদিম বাসস্থান ছিল দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব-আফ্রিকার মধ্যবর্তী কোন ভূখণ্ড (অধুনা জলমগ্ন)। এই বাসস্থান থেকে এরা ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি দেশ অতিক্রম করে ক্রমে অষ্ট্রেলিয়াতে উপনীত হয়। অষ্ট্রেলয়েডদের গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু মাথার চুল কিম্বা নাকমুখ নিগ্রোদের মত নয়। মুখে গোঁফ-দাড়ি ও গায়ে লোম যথেষ্ট। এরা যাযাবর,—কৃষি,ঘরবাড়ী, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির কোন ধার ধারে না। অষ্ট্রেলিয়াতে যে এরা খুব বিশুদ্ধ জাতি হিসাবে ছিল তা নয়। নিগ্রো, মঙ্গোল প্রভৃতির সঙ্গে যথেষ্ট মিলন-মিশ্রণ এদের হয়েছিল। অধুনা অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ ইউরোপীয়দের কবলিত হবার পর থেকে—অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা ক্রমশঃ কোণঠেসা হয়ে প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে। ভারতবর্ষের কতক জাতির (বেদ্দা, মুণ্ডা, কোল, সাঁওতাল, গোণ্ড, কর্কু প্রভৃতি) মধ্যে অষ্ট্রেলয়েড কিংবা প্রোটো-অষ্ট্রেলয়েড (Proto-Austıaloid = Australoid-like) ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।

(২) নিগ্রোজাতি—অষ্ট্রেলয়েডদের মত নিগ্রোরাও মানবগোষ্ঠীর একটি খুব প্রাচীন জাতি। এদের গায়ের রং মসীকৃষ্ণ, নাক চেপ্টা এবং নাকের ছেঁদা খুব বড়, ঠোঁট পুরু, চুল কোঁকড়ানো। অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে এদের চুল ফিতার মত চেপ্টা। চুল এত কোঁকড়ানো হবার ইহাই কারণ। নিগ্রোদের গোঁফ-দাড়ি খুব বিরল।

হাড়গুলি অন্যান্য জাতির তুলনায় তেমন বড় কিংবা পুরু নয়; কিন্তু অস্থির ঘনত্ব বেশী। এই ঘনত্বের জোরে হাড় পাতলা হলেও মজবুত যথেষ্ট। নিগ্রোদের মাথার খুলিতে গড়পড়তা মগজের পরিমাণ ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য জাতিদের অপেক্ষা কম।

নিগ্রোদের আদি বাসস্থান আফ্রিকা বলেই ধরে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ওরা আরব, পারশ্য, ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, মালয় ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে মেলানেশিয়ার ও পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে বসতি স্থাপন করে। পারশ্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে এদের কোন পৃথক অস্তিত্ব বজায় থাকে নি। কিন্তু দক্ষিণ পারশ্য, দাক্ষিণাত্য ও মালয় অঞ্চলে কতক লোকের মধ্যে গাত্র-বর্ণ, চুল ও অবয়বের গঠনে নিগ্রো ছাপ অদ্যাবধি দেখতে পাওয়া যায়। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে একটি খাঁটি নিগ্রো উপনিবেশ এখনো রয়েছে। এদের বাদ দিলে সমগ্র নিগ্রোজাতি এখন দুটি প্রধান উপজাতিতে বিভক্ত,—এক, আফ্রিকার নিগ্রো—দুই, ওশেনিক (মেলানেশিয়া ও পলিনেশিয়ার) নিগ্রো।

ওশেনিক নিগ্রোরা একটু বেশী পরিমাণে মিশ্র জাতি; মঙ্গোল ও অষ্ট্রেলয়েডদের সঙ্গে এদের রক্তমিশ্রণ খুবই হয়েছে। আফ্রিকার নিগ্রোদের সঙ্গে তেমনি ভূমধ্যসাগরীয় জাতির মিলন হয়েছে যথেষ্ট। নিগ্রোদের মধ্যে যেমন খুব লম্বাচোড়া লোক আছে, তেমনি আবার খর্বকায় বেঁটে উপজাতিও আছে। আফ্রিকার এরূপ বামন উপজাতি-গুলিকে (বুশম্যান, হটেনটট্, কঙ্গোপ্রদেশের নিগ্রো) বলা হয় 'নেগ্রিলো', এবং মেলানেশিয়ার খর্বকায় উপজাতিগুলিকে বলা হয় 'নেগ্রিটো'।

(৩) মঙ্গোলীয় জাতি—মঙ্গোলীয় জাতির উৎপত্তি চীনদেশে। সেখান থেকে ওরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণে যায় মালয় উপদ্বীপ ছাড়িয়ে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত। উত্তরে মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া পার হয়ে এরা তুন্দ্রাঞ্চল পর্যন্ত বসতি স্থাপন করে। পশ্চিমে মধ্য-এশিয়ার তুর্কীস্তান পর্যন্ত এরা ছড়িয়ে পড়েছিল। পূর্বাঞ্চলে কোরিয়া ও জাপানের অধিবাসীদের মধ্যে মঙ্গোল রক্তের মিশ্রণ খুব প্রচুর পরিমাণেই আছে। সুদূর অতীতে একদল মঙ্গোল (কিংবা পুনঃ পুনঃ কয়েক দল) বেরিং প্রণালী পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছেছিল। প্রধানতঃ এদেরই বংশধর হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার যত আদিম অধিবাসী। চীনের মধ্যদেশেই মঙ্গোল জাতির বিশুদ্ধতা যথাসম্ভব বজায় আছে। অপর সর্বত্র রক্তমিশ্রণ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

সমগ্র মঙ্গোলজাতি মোটামুটি তিনটি শাখায় বিভক্ত। প্রথমতঃ "দক্ষিণী মঙ্গোল"—চীন, তিব্বত, ইন্দোচীন, ব্রহ্ম, আসামের পার্বত্য-অঞ্চল, ভূটান, সিকিম, নেপাল, গাড়োয়াল প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ। দ্বিতীয়তঃ "উত্তরে মঙ্গোল" (Northern Mongols)। মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও তুন্দ্রাঞ্চলের লোকেরা এই শাখার অন্তর্গত। মালয় উপদ্বীপ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মঙ্গোলদিগকে বলা হয় "সমুদ্রতীরবর্তী মঙ্গোল" অথবা প্রোটো-মালয় (Maritime Mongols or Proto Malayas)। এদের সঙ্গে অন্যান্য জাতির রক্তমিশ্রণ হয়েছে খুবই বেশী। এরাই তৃতীয় শাখা।

মঙ্গোলদের গাত্রবর্ণ, দেহের উচ্চতা, শারীরিক গঠন ও চেহারায়

অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ মঙ্গোলদের, যথা চীনাদের, গায়ের রং প্রায়শঃ হলদে এবং নাকমুখ চ্যাপ্টা ধরণের। এদের চোখ ছোট এবং চোখের উপরের পাতার ভিতরের কোণ একটু নীচে ঝুলে আসাতে চোখগুলি কিছু অদ্ভুত রকমের দেখায়। মঙ্গোলদের গোঁফ-দাড়ি, এবং গায়ের লোম খুব বিরল। মাথার চুল মোটা, খসখসে এবং খাড়া ধরণের।

(৪) ভূমধ্য-সাগরীয় জাতি—এই নামকরণটা খুব সুষ্ঠু কিংবা যুক্তিসঙ্গত হয় নি। নৃতত্ত্ব-আলোচনার ত্রুটিতেই এই ভুল নাম প্রথমে দেওয়া হয়েছিল। অসম্পূর্ণ অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে নৃতত্ত্ববিদেরা এক সময়ে মনে করতেন যে ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে ছিল এই জাতির মূল বাসস্থান। অধিকতর আলোচনার ফলে এই ধারণা এখন দূরীভূত হয়েছে; কিন্তু 'ভূমধ্য-সাগরীয়' নামটি এযাবৎ বদলানো হয় নি। আধুনিক মতে এই জাতির আদি বাসস্থান ছিল এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ও আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব প্রান্ত জুড়ে। প্রাচীন মিশর, ক্রীট, সিরিয়া, সুমের প্রভৃতি অঞ্চলের লোক এই জাতির অন্তর্গত ছিল। বর্তমান সময়ে আরব, পারশ্য ও ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে ভূমধ্য-সাগরীয় ছাপ সব চেয়ে বেশী দেখতে পাওয়া যায়। ইউরোপের লোকদের মধ্যেও ভূমধ্য-সাগরীয় জাতির মিশ্রণ যথেষ্ট রয়েছে, বিশেষতঃ দক্ষিণ অঞ্চলে।

ভূমধ্য-সাগরীয় জাতির রং মোটামুটি ফর্সা—কতকটা বাদামী। এদের উচ্চতা মাঝারি রকমের, মাথা লম্বাটে, চোখের রং কালো, মাথার চুল ঢেউ-খেলানো, এবং চুলের রং কটা অথবা কালো।

অনেক পণ্ডিতের মতে ভূমধ্য-সাগরীয় জাতিই পৃথিবীতে মানব-সভ্যতার জনক।

(৫) আলপাইন জাতি—নামটি 'আলপাইন' হলে ও আল্পস্ পর্বত এই জাতির আদি বাসভূমি নয়। ভুল করে এই নাম প্রথমে দেওয়া হয়েছিল। আধুনিকতম নৃতাত্ত্বিক বিচারে এই জাতির বাসভূমি ছিল মধ্য-এশিয়ার তুর্কীস্তানে; সেখান থেকে এক শাখা ইউরোপে প্রবেশ করে, আরেক শাখা ভারতবর্ষে আসে এবং ক্রমশঃ আরো পূবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মহেঞ্জোদড়োতে আল্পাইন জাতীয় লোকের করোটি পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধী, গুজরাটী, মারাঠী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে আল্পাইন জাতীয় ছাপ কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়।

আল্পাইনদের মাথার আকৃতি মঙ্গোলদের মত গোল ও চ্যাপ্টা; কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে এরা মঙ্গোলদের চেয়ে পৃথক। এদের রং ফর্সা, গোঁফদাড়ি খুব জাঁকালো, গায়ে লোম যথেষ্ট। আল্পাইনদের শরীরের কাঠাম বড় এবং হাড় মজবুত। নাক বেশ বড় এবং ধারাল, চোখ ডাগর।

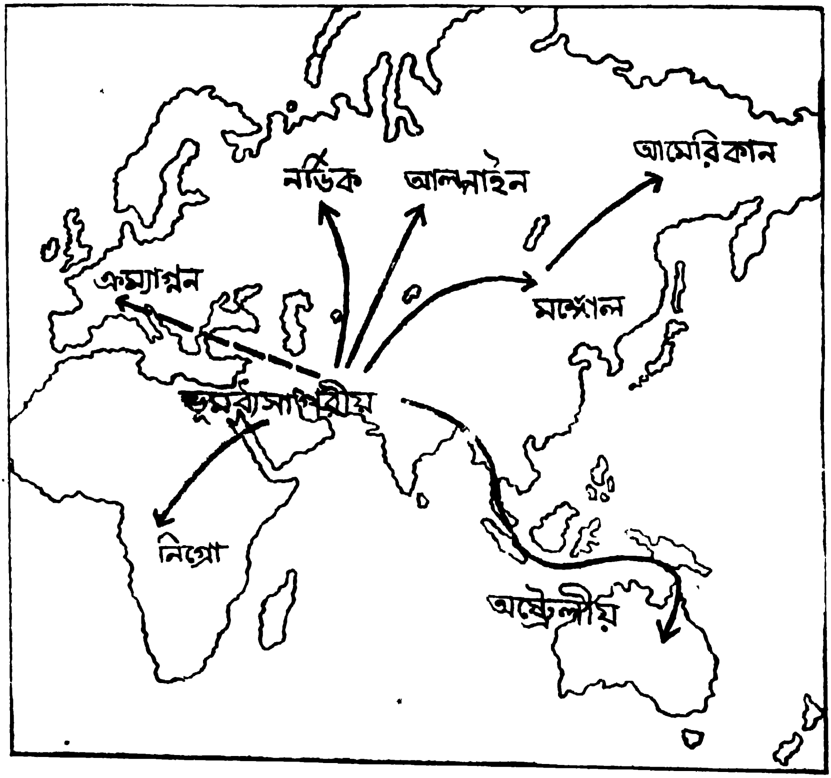
(৬) নর্ডিক জাতি—নর্ডিক জাতির আদি বাসস্থান ছিল কৃষ্ণ-সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে। সেখান থেকে এদের একশাখা ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অপর এক শাখা পারশ্য, আফগানিস্তান ও ভারতবষের দিকে আসে। 'এই শেষোক্ত শাখার পারিভাষিক নাম 'ইণ্ডো-আফগান', প্রচলিত নাম 'বৈদিক আর্য'।

নর্ডিকদের দেহ খুব লম্বাচৌড়া, গায়ের রং ফ্যাকাসে শাদা, চুল কটা এবং চোখ নীল। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, জার্মানী, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড,

ও ব্রিটিশদ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে নর্ডিক ছাপ বেশী দেখতে পাওয়া যায়। নর্ডিকেরা খুব সাহসী,—সমুদ্রগমনে এবং নানা বিপদসঙ্কুল কাজে তারা অগ্রণী। এজন্য একথা বলা হয় যে ভূমধ্য-সাগরীয় জাতি সভ্যতার জনক অথবা উদ্ভাবক, এবং নর্ডিক জাতি সভ্যতার বাহক অথবা প্রচারক।

['আর্যজাতি' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। নৃতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিচারে 'আর্য' নামক কোন "জাতি" নাই; একটি ভাষা-গোষ্ঠীর সম্পর্কেই 'আর্য' শব্দটি বস্তুতঃ প্রযোজ্য। এই ভাষা-গোষ্ঠীর অপর নাম 'ইণ্ডো-ইউরোপীয়' ভাষাগোষ্ঠী। ভারতবর্ষের সংস্কৃতমূলক সমস্ত ভাষা, পার্শী ভাষা, এবং ইউরোপের প্রায় সমস্ত ভাষাই 'আর্য' ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। যারা আর্যভাষা-ভাষী তারা সকলেই এক জাতি থেকে উদ্ভূত—এই ভুল ধারণা থেকেই 'আর্যজাতি'র সৃষ্টি হয়েছিল]

মানব-প্রজাতির আদি বাসভূমি ও বিস্তৃতি
(প্রফেসর ইলিয়ট স্মিথের মতানুযায়ী)



নৃতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন যে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ছিল মানবের আদি বাসভূমি। সেখান থেকেই মানব-প্রজাতি নানাদিকে ছড়িয়েছে। এক এক শাখা এক এক রকম ভৌগোলিক সংস্থানের মধ্যে সুদীর্ঘকাল বসবাস করে এক একটা বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে এবং এক একটি নির্দিষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছে। আদি

বাসভূমিতে যারা সবচেয়ে দীর্ঘকাল টিকেছিল তারাই কালক্রমে হয় 'ভূমধ্যসাগরীয়' জাতি।

মৌলিক একতার উপর জোর দিবার উদ্দেশ্যে মানব-প্রজাতির বিভিন্ন জাতি-উপজাতিকে (Races & Sub-Races) একই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার সঙ্গে সচরাচর তুলনা করা হয়। কিন্তু এই উপমার ব্যাপারে একটি পার্থক্যের কথা সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত। গাছের প্রত্যেক ডালপালা বরাবর নিজের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখে, অর্থাৎ একটি আরেকটির সঙ্গে মিশে কখনো এক হয়ে যায় না। কিন্তু মানুষের জাতি উপজাতির বেলা সেরূপ নয়। তাদের মধ্যে ক্রমাগত মিলন মিশ্রণ হয়েছে এবং হচ্ছে। বায়ুভরে চালিত খণ্ড খণ্ড মেঘ যেমন একবার এসে মিলিত হয় আবার নব নব রূপ ধারণ করে আলাদা হয়ে যায়, তেমনি ইতিহাসের স্রোতে কত জাতি উপজাতি একবার এসে মিলে—আবার নব নব রূপ গ্রহণ করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সভ্যতা

অরণ্যচারী বনমানুষ কি করে সমাজবদ্ধ হয়ে সভ্যতার পথে যাত্রা করল তা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। বীবর, মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়া, উইপোকা প্রভৃতি নিম্নবর্গের প্রাণীদের মধ্যেও এক রকম সমাজবন্ধন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সমাজ-বন্ধনের মধ্যে কোন চিন্তাশক্তির প্রেরণা নাই; সহজাত সংস্কারের বশে এই সকল প্রাণী দলবদ্ধভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের কাজকর্ম চলে একটা একঘেঁয়ে গৎবাঁধা প্রণালীতে, তিলমাত্র নড়চড় হয় না। অভিব্যক্তির ধারায় এদের বুদ্ধিবিকাশ একটা জায়গায় এসে যেন একেবারে থেমে গিয়েছে। আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই যে মানবসমাজের গঠন-প্রণালী এরকম নয়। মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার মূলে আছে সদা-জাগ্রত বিচারবুদ্ধি। এই বিচারবুদ্ধির জোরে মানুষ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। অতএব মানবসমাজের সূত্রপাত কি করে হল তা জানতে হলে আমাদিগকে খুঁজতে হবে কি করে প্রাইমেটবর্গের একটা বিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যে ঘটল অসাধারণ রকমের বিচারবুদ্ধির বিকাশ ও হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ। মনে হয় এই ব্যাপারেরও মূলে ছিল প্রাণী হিসাবে মানবের অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তির এই বিশেষ ধারা বুঝবার জন্য আরো পেছিয়ে গিয়ে বনমানুষের পর্যায় থেকে শুরু করতে হবে।

মানবের পূর্বপুরুষেরা হাতে-পায়ে চলত। তার পরে ক্রম-

পরিবর্তনের ফলে এমন এক রকম বনমানুষের আবির্ভাব হল যারা চলার কাজটা শুধু পায়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে হাত দুটো অপর দশ কাজের জন্য ব্যবহার করতে লাগল। এতে তিন দিক দিয়ে বুদ্ধি-বিকাশের সুবিধা হল। প্রথমতঃ হাতের স্পর্শশক্তি হয়ে উঠল খুব সজাগ। যে কোন বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করবার পক্ষে এই স্পর্শশক্তি অর্থাৎ ধরা-ছোঁয়া আমাদিগকে খুবই সাহায্য করে। শিশুদের হাল-চাল লক্ষ্য করলে অনায়াসেই বুঝা যায় জ্ঞানলাভের জন্যে এই ধরা-ছোঁয়া কত প্রয়োজনীয়। ধরে ছুঁয়ে আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে বলেই আমরা যে কোন বস্তুর চেহারা দেখেই বুঝতে পারি জিনিসটি শক্ত কিংবা নরম, মসৃণ কিংবা খসখসে ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ হাত দুটো মুক্ত থাকাতে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার হল সম্ভবপর এবং সহজসাধ্য। কর্মপ্রবৃত্তিও অনেক বেড়ে গেল; কারণ হাত খালি থাকলেই মনে ইচ্ছা জাগে এটা করি, ওটা করি। তৃতীয়তঃ বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন যে হস্তচালনার সঙ্গে মস্তিষ্কের পুষ্টির একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে। হাত যত চালানো যায় মাথার মগজও তত বেশী পুষ্ট হয়। অতএব যখন থেকে মানবের পূর্বপুরুষ হাত দুটিকে হাঁটার কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে প্রধান কর্মেন্দ্রিয়রূপে ব্যবহার করতে শুরু করল তখন থেকে মস্তিষ্কের পরিপুষ্টির একটা নূতন পথ খুলে গেল। মানুষের মাথার খুলি ও উহার ভিতরকার মস্তিষ্ক অথবা মগজ ইতর প্রাণীর তুলনায় অনেক বড়। মস্তিষ্কই বুদ্ধি, স্মৃতি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানভূমি। অতএব মস্তিষ্কের পুষ্টিতে এগুলিরও উন্নতি হয়েছে। ইতর প্রাণীর তুলনায় মানবমস্তিষ্ক যে

শুধু আকারে বড় তা নয়, উহার গঠনও অনেক বেশী জটিল, অসংখ্য ভাঁজ তার মধ্যে রয়েছে। মস্তিষ্কের এই জটিলতা বুদ্ধি-বিকাশের সহায়ক ও পরিচায়ক।

ইতর প্রাণীর তুলনায় প্রাইমেটদের দৃষ্টিশক্তিরও খুব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ পশুপক্ষীর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তাদের নাকমুখের অথবা চঞ্চুর গঠন এমনি ভাবের যে চোখ দুটির দৃষ্টি সর্বদা দুই পাশের দিকে থাকে। ডান চোখ শুধু ডান দিক দেখে, এবং বা' চোখ শুধু বা' দিক দেখে ; উভয় চোখের দৃষ্টি একসঙ্গে একই বস্তুর উপর নিবদ্ধ হতে পারে না। চোখ হল একটা ক্যামেরা। ফটোগ্রাফের ক্যামেরাতে যেমন লেন্সের সম্মুখস্থ জিনিষের ছায়া (প্রতিকৃতি) প্লেট অথবা ফিল্মের উপর পড়ে, তেমনি দৃষ্টবস্তুর ছায়া অক্ষিগোলকের পিছনে অবস্থিত 'রেটিনা' নামক পর্দার উপর পড়ে। সেখান থেকে স্নায়ু গিয়েছে মস্তিষ্ক পর্যন্ত। রেটিনাতে ছায়া পড়লেই স্নায়ু উত্তেজিত হয় এবং সেই উত্তেজনার ঢেউ মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছলে পর আমরা 'দেখি'। এথেকে সহজেই ধারণা করা যাবে যে যাদের ডান বা' দুটি চোখ যুগপৎ একই জিনিসের উপর নিবদ্ধ হতে পারে তাদের দৃষ্টিশক্তি এক রকম, এবং যাদের ওরূপ হতে পারে না তাদের দৃষ্টিশক্তি আরেক রকম। একই বস্তু এই উভয়বিধ প্রাণীর দৃষ্টিতে ঠিক একই রকম প্রতিভাত হতে পারে না। অধিকাংশ পশুপক্ষীর দিকে তাকালেই দেখা যায় যে তাদের নাকমুখের গঠন এরূপ এবং তাদের চোখ দুটি এমন ভাবে স্থাপিত যে তারা ডান চোখ দিয়ে শুধু ডান দিকে এবং বা' চোখ দিয়ে শুধু বা' দিকেই তাকাতে পারে। তাদের পক্ষে

উভয় চোখের দৃষ্টি একই সঙ্গে কোন একটিমাত্র জিনিষের উপর স্থাপিত করা মোটেই সম্ভবপর নয়। যাদের দৃষ্টি এরূপ 'একচোখো' (monocular) তারা খুব সম্ভবতঃ জিনিসের ঘনত্ব বুঝতে পারে না। ঘোড়া অনেক সময় ছায়া দেখে ভয় পায় কিংবা চঞ্চল হয়ে উঠে। ছায়ার শুধু দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আছে, বেধ নাই; এজন্য আমাদের দৃষ্টিতে ছায়াকে কখনো আসল জিনিসের সঙ্গে ভুল করি না। কিন্তু ইতর প্রাণীদের দৃষ্টি একচোখো বলে তাদের সেই ভুল সম্ভবতঃ হয়।

বোর্নিয়ো দ্বীপে 'টার্সিয়াস' নামে এক অদ্ভুত প্রাণী আছে; কাঠবিড়ালীর ন্যায় তারা গাছে চড়ে। টার্সিয়াসের বড় বড় গোল গোল চোখ যেন সমস্ত মুখমণ্ডল জুড়ে রয়েছে বলে মনে হয়। চোখ দুটির দৃষ্টি আমাদের মত সামনের দিকে, অন্যান্য প্রাণীদের মত পাশের দিকে নয়। এদের দৃষ্টিকে বলা হয় দুচোখো (Binocular), এরা সম্মুখস্থ যে কোন বস্তুর উপর একই সঙ্গে উভয় চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে; অতএব একচোখো দৃষ্টির চেয়ে এদের দৃষ্টি উন্নত ধরণের। কিন্তু তা হলেও বনমানুষ এবং মানুষের দৃষ্টির সমকক্ষ নয়। পাশের দিকে কোন জিনিসের দিকে তাকাতে হলে টার্সিয়াসকে গ্রীবা ঘুরিয়ে দৃষ্টি স্থাপন করতে হয়, কারণ তার দৃষ্টি শুধু সামনের দিকেই যায়। প্রাইমেটবর্গের প্রাণীরা কিন্তু ঘাড় না বেঁকিয়েও তির্যকভাবে উভয় চোখের দৃষ্টি যে কোন জিনিসের উপর একই সঙ্গে স্থাপন করতে পারে। তাদের চোখের স্নায়ু এবং পেশীগুলি এত উন্নত ধরণের যে দৃষ্টবস্তু চোখ দুটি থেকে সমান দূরে অবস্থিত না হলেও দেখার কোন ত্রুটি কিংবা অসুবিধা হয় না। বরঞ্চ দৃষ্টির এই

বৈশিষ্ট্যের দরুন দৃষ্টবস্তুর ঘনত্ব এবং যথার্থ আকার সম্পর্কে ধারণা আরো অনেক বেশী স্পষ্ট হয়। এজন্য এরূপ দৃষ্টিশক্তিকে বলা হয় Stereoscopic vision অর্থাৎ ঘনত্ব-পরিজ্ঞাপক দৃষ্টি। প্রাইমেট বর্গের তীক্ষ্ণ ও সুপটু দৃষ্টিশক্তি বহির্জগতের জ্ঞানলাভের পক্ষে একটা খুব বড় রকমের সহায়। আর এর ফলে সব জিনিষ দেখবার ও জানবার ইচ্ছা হয়ে উঠে খুব প্রবল।

হস্তচালনা ও উন্নত দৃষ্টিশক্তির ফলে মানবের পূর্বপুরুষের সম্মুখে বুদ্ধিবিকাশের রাজপথ খুলে গেল। কিন্তু সমাজ গড়ে উঠবার পক্ষে শুধু বুদ্ধিবিকাশই যথেষ্ট নয়; তার জন্য চাই প্রীতির বন্ধন। এই বন্ধনেরও সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় অভিব্যক্তির ধারার মধ্যে। ইতর প্রাণীদের মধ্যে মাতাপিতার উপর নির্ভরশীলতা তেমন বেশী কিংবা দীর্ঘস্থায়ী নয়। বাছুর, ছাগলছানা প্রভৃতি জন্মাবার অল্পক্ষণ পরেই ছুটাছুটি, লাফালাফি, দাপাদাপি করে বেড়ায়। কিন্তু প্রাইমেটদের বেলায় শিশুসন্তান ভূমিষ্ঠ হয় নিতান্ত অসহায় অবস্থায়। দীর্ঘকাল ধরে মা-বাপ যদি প্রতিপালন না করে, তবে সন্তানের পক্ষে বেঁচে থাকাই হয় অসম্ভব। মাতাপিতার উপর সন্তানের এরূপ দীর্ঘকালব্যাপী নির্ভরশীলতার মধ্যেই ছিল স্নেহমমতার এবং পারিবারিক জীবনের বীজ। এজন্যই নৃতাত্ত্বিকেরা বলেন যে ছেলেমেয়েরাই হচ্ছে সমাজরূপ ইমারতের সিমেন্ট, অর্থাৎ বাঁধুনি। সন্তানবাৎসল্যের ফলেই স্বামীস্ত্রীর মিলন হয় স্থায়ী এবং পারিবারিক বন্ধন হয় দৃঢ়। আর 'পরিবার'ই ক্রমে ক্রমে বড় এবং পরস্পর মিলিত হবার ফলে গড়ে উঠেছিল 'গোষ্ঠী' এবং 'সমাজ'।

ইতর প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিবিকাশ ও হৃদয়বৃত্তির বিকাশ অল্পাধিক দেখা যায় বটে, কিন্তু তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুর গঠন এ রকম যে বুদ্ধিবিকাশ একটা নির্দিষ্ট সীমানায় পৌঁছে থেমে যেতে বাধ্য। এজন্যই পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতির বেলায় আমরা দেখতে পাই যে তাদের বুদ্ধিবিকাশ পর্যবসিত হয়েছে একটি সহজাত সংস্কারে। সেই সংস্কারের গণ্ডী পার হয়ে তারা কিছুতেই আর অগ্রসর হতে পারে না। নিয়াণ্ডার্থাল প্রভৃতি অর্ধমানবদের বেলায়ও আমরা দেখতে পাই যে মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ (pre-frontal area of brain) ছিল অপুষ্ট এবং স্বল্পপরিসর। সেজন্য তাদের বুদ্ধিবিকাশ একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে থেমে যেতে বাধ্য হয়েছিল। পক্ষান্তরে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর গঠন এত শ্রেষ্ঠ ধরণের যে বিচারবুদ্ধির ক্রমোন্নতির পথে কোথাও কোন সীমারেখা আছে বলে মনে হয় না। বুদ্ধিবিকাশের এই বিপুল সম্ভাব্যতা নিয়ে আদিমানব ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হলেও বুদ্ধির বিকাশটা যে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গিয়েছিল এবং সমাজ ও সভ্যতা যে দুচার পুরুষেই গড়ে উঠেছিল তা মোটেই নয়। সম্ভাব্যতা থাকলেই হয় না, সম্ভাব্যতার বাস্তব পরিণতির জন্য চাই অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এবং যথোপযুক্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়।

সুমের, মিশর, এসিরিয়া, বাবিলন, মহেঞ্জোদড় প্রভৃতি যে সকল প্রাচীনতম সভ্যতার পরিচয় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেছেন সেগুলি ৬।৭ হাজার বছরের বেশী পুরাতন নয়। অথচ মানবের আবির্ভাব হয়েছিল ৫০।৬০ হাজার কিংবা লক্ষ বৎসর পূর্বে।

অতএব ধরাপৃষ্ঠে আজ পর্যন্ত মানবের মোট স্থিতিকালের তুলনায় ইতিহাস-বর্ণিত মানবসভ্যতা সেদিনকার জিনিষ। ইতিহাস যার নাগাল পায় না সেই বিস্মৃত যুগের তথ্য আবিষ্কার করবার জন্য,—আদিম অবস্থা থেকে মানুষ কি রকম ভাবে সভ্য অবস্থায় এসে পৌঁছল তা জানবার জন্য—নৃতাত্ত্বিকেরা প্রভূত অনুসন্ধান করেছেন এবং করছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে অনেক কিছু জানা গিয়েছে বটে, কিন্তু কোন ধারাবাহিক চিত্র ফুটিয়ে তোলা এখন পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নি। সভ্যতার আরম্ভ সম্পর্কে যেটুকু জানা গিয়েছে তার সামান্য আভাস মাত্র আমরা এখানে দিব।

মানবপ্রজাতির প্রথম অবির্ভাব কখন হয়েছিল তা আমরা সঠিক জানি না,—৫০ হাজার বছর পূর্বে কিংবা হয় ত লক্ষ বৎসর পূর্বে প্রথম মানব ধরাপৃষ্ঠে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার পর নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হতে কত হাজার বছর লেগেছিল তাও আমরা জানি না। তবে যতদূর অনুমান করা যায় খৃঃ পূঃ ১০০০০ অব্দের পূর্বেই ঐ ব্যাপার সম্পন্ন হয়েছিল, এবং সভ্যতার সূত্রপাত তার আরো আগেই হয়েছিল।

১৪০ পৃষ্ঠায় নিয়াণ্ডার্থালদের যৎসামান্য পরিচয় আমরা দিয়েছি। তুষারযুগের বরফঢাকা ইউরোপে নিয়াণ্ডার্থালেরা যখন গুহাবাসে আশ্রয় নিয়ে একঘেঁয়ে ভাবে জীবন যাপন করছিল, তখন আরো দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত মৃদু জলবায়ুতে সত্যিকার মানব বেড়ে উঠছিল সংখ্যায় ও সামর্থ্যে। তার পর যখন তুষারযুগের অন্তে ইউরেশিয়ার উত্তরাঞ্চলের জলবায়ু মোলায়েম হতে শুরু করল, তখন দক্ষিণাঞ্চলের পশুপক্ষী

ক্রমশঃ উত্তরে সরে যেতে লাগল এবং শিকারী মানবও চলল তাদের পিছে পিছে। এই রকম করে খৃঃ পূঃ ৩০০০০ থেকে ২৫০০০ অব্দের মধ্যে দুটি মানবশাখা গিয়ে উপস্থিত হয় ইউরোপে। একটির নাম দেওয়া হয়েছে গ্রিমল্ডি, যেহেতু গ্রিমল্ডি নামক স্থানে এই জাতীয় মানবের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছিল। এরা ছিল নিগ্রোসদৃশ। অপর শাখার নাম ক্রোম্যাগ্নন। ক্রোম্যাগ্ননদের আকার ছিল খুব লম্বা চওড়া এবং অবয়ব ছিল সুশ্রী ও সুগঠিত। নিয়াণ্ডার্থালেরা এদের দ্বারাই বিতাড়িত হয়ে ক্রমশঃ বিলয় প্রাপ্ত হয়। ইউরোপে প্রায় ১৫০০০ বৎসর আধিপত্য করে খৃঃ পূঃ ১০০০০ অব্দের কাছাকাছি ক্রোম্যাগ্ননেরা নিজেরাও ধরাধাম থেকে চিরবিদায় নেয়। ক্রোম্যাগ্নন ও গ্রিমল্ডি এই দুটি জাতি কি করে সমগ্রভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল তা জানা যায় না। হয় ত কোন ব্যাপক মহামারী ছিল এই বিলুপ্তির কারণ।



ক্রোম্যাগ্নন মানব

নিয়াণ্ডার্থালেরা এবং ক্রোম্যাগ্নন ও গ্রিমল্ডি মানবেরা কিরূপ ভাবে জীবন ধারণ করত, তাদের আচার ব্যবহার কি রকম ছিল—এ সকল বিষয়ে নৃতাত্ত্বিকেরা বহুল অনুসন্ধানের দ্বারা অনেক কথা জানতে পেরেছেন। যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে

ক্রোম্যাগ্নন ও গ্রিমল্ডিরা সত্যিকার মানব (homo sapiens) হলেও তারা যে নিয়াণ্ডার্থালদের চেয়ে খুব উন্নত ছিল তা নয়। নিয়াণ্ডার্থালদের ন্যায় তারাও শুধু ফলমূল কুড়িয়ে এবং পশুপক্ষী শিকার করে জীবন ধারণ করত.—কৃষিকার্য অথবা পশুপালন জানত না। পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাদের শিকারের ও আত্মরক্ষার সম্বল, এবং সেগুলি ছিল ঠিক নিয়াণ্ডার্থালদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের মতই নিতান্ত অপটু ধরণে তৈরি। তীর-ধনুক তাদের ছিল না। কোনরূপ ধাতুর ব্যবহার তারা জানত না, কিংবা মাটির বাসনপত্রও তৈরি করতে পারত না। অতএব তাদের রান্নাবান্নার কোন বালাই ছিল না। তারা কাঁচা মাংস খেত ; হয় ত বা আগুনে সেঁকে কিংবা সামান্য পুড়িয়ে খেত। কোনরূপ বয়ন কিংবা বুননের কাজ তারা জানত না ; সুতরাং হয় পশুচর্ম পরিধান করত, নয় ত উলঙ্গ থাকত। শুধু একটি বিষয়ে তারা ছিল নিয়াণ্ডার্থালদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সেটি হচ্ছে সৌন্দর্যবোধ। সৌন্দর্যসৃষ্টির দিকে তাদের ঝোঁক ছিল বেজায়। পাথর এবং হাড়ের উপর তারা নানাবিধ খোদাইয়ের কাজ করত। কয়লার টুকরা, রঙিন নরম পাথর এবং তরল রং দিয়ে তারা সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকত। সেগুলির অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে কতক স্থানে গুহাগহ্বরের দেয়ালে। ছবিগুলি প্রায়শঃ সেই সব জীবজন্তুর যেগুলিকে তারা শিকার করত। কতক ছবিতে জানোয়ারগুলির আকৃতি, গতি-ভঙ্গী প্রভৃতি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। আবার কতকগুলি আছে কিম্ভূতকিমাকার ছবি, সেগুলির মধ্যে আদিম মানবের কল্পনারাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শেষের দিকের অনেক ছবিতে হুবহু নকলের

পরিবর্তে দেখা যায় সাঙ্কেতিক চিহ্নের প্রয়োগ। যেমন, মানুষ আঁকতে গিয়ে মানুষের সত্যিকার চেহারা না এঁকে আঁকা হয়েছে—দেহযষ্টি বুঝাবার জন্য একটি লম্বা টান, এবং হাত পা' বুঝাবার জন্য আড়াআড়ি চারটি ছোট টান। অঙ্কন হিসাবে কাজটি সহজ হলেও উহা শুধু অনুকরণ নয়, ওতে প্রতীকব্যবহারের অর্থাৎ মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইউরোপখণ্ডে নৃতাত্ত্বিকেরা তন্ন তন্ন ভাবে অনুসন্ধান করেছেন। তার ফলে সুদূর অতীতের ক্রোম্যাগ্নন ও গ্রিমল্ডি মানবদের সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারা গিয়েছে। মানব প্রজাতির অন্যান্য শাখা সম্বন্ধে তত সুদূরবর্তী কালের পরিচয় এখন পর্যন্ত আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। তবে এরূপ মনে করবার হেতু নাই যে মানব প্রজাতির অপর কোন সমসাময়িক শাখা গ্রিমল্ডি কিংবা ক্রোম্যাগ্নদের তুলনায় খুব বেশী উন্নত ছিল। বরঞ্চ এটাই ধরে নেওয়া সঙ্গত যে তারা সবাই ছিল মোটামুটি একই স্তরে অবস্থিত। অতএব দেখা যায় যে ভূপৃষ্ঠে প্রথম আবির্ভাব থেকে ক্রোম্যাগ্নদের সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ হাজার হাজার বছর ধরে,মানব প্রায় একই অবস্থায় ছিল। বন্য ফলমুল সংগ্রহ করে এবং পশু-পক্ষী শিকার করে সে কোন রকম ভাবে দিন কাটাত। তার জীবনধারণ-প্রণালীর মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির কোনরূপ বিকাশ আমরা দেখতে পাই না। ইতর প্রাণী যেমন গৎবাঁধা নিয়মে খাওয়া শোওয়া ও চলাফেরা করে, সে যুগের মানুষও তাই করত। এগিয়ে চলার অপার ক্ষমতা অন্তর্নিহিত থাকা সত্ত্বেও মানবের বুদ্ধি যেন একটা জায়গায় এসে কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছিল—সম্মুখে চলবার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। এই

সমগ্র যুগকে বলা যেতে পারে আদিম অথবা প্রাক্-সভ্য যুগ। এর প্রচলিত নাম 'প্রাচীন' প্রস্তর-যুগ। চকমকি-পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্রই ছিল সে যুগে মানুষের প্রধান সম্বল। আর সেগুলি ছিল এবড়ো খেবড়ো,—মোটেই ধারাল কিংবা পালিশ ছিল না। অন্যান্য উল্লেখ-যোগ্য জিনিষের মধ্যে ছিল হাড়ের তৈরি সূঁচ, বর্শাফলক, এবং খোদাই-কাজ-করা হাতল, বাঁট প্রভৃতি। সূঁচ দিয়ে সম্ভবতঃ চামড়া সেলাই করা হত।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের পরবর্তী কালের নাম 'নূতন' প্রস্তর-যুগ। নাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে এ যুগেও প্রস্তর-শিল্পই ছিল প্রধান শিল্প। তা হলেও গঠন-নৈপুণ্যে নূতন যুগের শিল্প ছিল প্রাচীন যুগের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ। নূতন যুগের অস্ত্রশস্ত্র এবং হাতিয়ারগুলি যেমন ছিল ধারাল তেমনি মসৃণ। পাথরের কুড়াল, হাতুড়ি, বর্শাফলক প্রভৃতির গঠন ছিল চমৎকার, এবং সেগুলিতে এমনভাবে ছেঁদা করা থাকত যাতে কাঠের হাতল কিংবা বাঁট অনায়াসেই লাগানো যায়। নূতন প্রস্তরযুগের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল পশুপালন। শিকারের সহায় ও সঙ্গী হিসাবে জীবজন্তুর মধ্যে সম্ভবতঃ কুকুরকেই মানুষ সর্বপ্রথম পোষ মানিয়েছিল। তার পর ধীরে ধীরে গরু, ছাগল, ভেড়া, শূওর প্রভৃতি প্রাণীকে সে একে একে বশে আনতে সমর্থ হয়। জীবনসংগ্রামের জয়পরাজয়ে এর সার্থকতা অনেকখানি। যতদিন ব্যাধবৃত্তি ছিল জীবিকার একমাত্র উপায়, ততদিন মানুষ ছিল প্রকৃতির দানের উপর ষোল-আনা নির্ভরশীল। পশুপালনের সূত্রপাত হওয়া অবধি খাদ্য-সংস্থানের ব্যবস্থা সে কতকটা নিজের হাতেই নিল, প্রকৃতির নিকট

একান্ত মুখাপেক্ষী হয়ে রইল না। নূতন প্রস্তর-যুগের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাটির বাসনপত্র এবং বুননের প্রবর্তন। মাটির হাঁড়িকুড়ি থেকে বুঝা যায় যে মানুষ তখন খাদ্যদ্রব্য শুধু কাঁচা কিংবা পোড়া খেয়ে সন্তুষ্ট ছিল না, হাঁড়ি চড়িয়ে রান্না শুরু করেছিল। এথেকে এটাও অনুমান করা সহজ যে স্বভাবজাত ভূট্টা, যব, গম প্রভৃতি তারা তখন কুড়িয়ে নিত এবং ফুটিয়ে কিংবা সিদ্ধ করে খেত। হয়ত নরম মাটিতে শস্যের বীজ ছড়িয়ে একটু আধটু ফসল নিজেরাও জন্মাত। এই যুগেই মানুষ লতা-পাতা, বেত এবং ঘাস প্রভৃতি দিয়ে সর্বপ্রথম বুননের কাজ শুরু করে।

নূতন প্রস্তর-যুগের আরম্ভ যে সর্বত্র একই সময়ে হয়েছিল তা নিশ্চয়ই নয়। ইউরোপে এই যুগের সূচনা হয়েছিল খৃঃ পূঃ ১২০০০ থেকে ১০০০০ অব্দের মধ্যে। ক্রোম্যাগ্নদের পরে যে সকল লোক দক্ষিণ ও পূব থেকে ইউরোপে প্রবেশ করেছিল তারা নূতন প্রস্তর-যুগের অস্ত্রশস্ত্র, হাতিয়ার ও জীবন-যাপন-প্রণালী সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। অতএব পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে ইউরোপে নীত হবার কয়েক হাজার বছর আগেই দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায়, আফ্রিকার উত্তর উপকূলে. অথবা হয় ত অধুনা ভূমধ্যসাগরে জলমগ্ন কোন ভূভাগে নূতন প্রস্তরযুগের বিশিষ্ট শিল্প এবং জীবন-যাপন-প্রণালী সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত হয়েছিল। তার পর সেখ[illegible] থেকে আস্তে আস্তে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নূতন প্রস্তর-যুগকে বলা যেতে পারে সভ্যতার যাত্রাপথে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ। রীতিমত চ[illegible] শুরু হয় কৃষির প্রবর্তনের সময়

থেকে। শিকারী মানুষকে রোজই পেটের ভাবনা ভাবতে হত। শিকারলব্ধ পশুপক্ষী এবং কুড়ানো ফলমূল দীর্ঘকাল সঞ্চিত রেখে নিজেদের ইচ্ছামত খাওয়া চলে না। অতএব শিকারী মানুষকে বছরের সব ঋতুতেই খাদ্যবস্তুর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হত,—শীত-গ্রীষ্ম বৃষ্টি-বাদল কোন কিছুতেই রেহাই ছিল না। উদরচিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তায় মন দিবার অবকাশ শিকারী মানুষের ছিল না বললেই চলে। কৃষিপ্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার্জনের জন্য নিত্যকার ভাবনা দূরীভূত হয়ে গেল। বৎসরের একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে কৃষককে চাষ-আবাদ করতে হয়, এবং অপর একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে ফসল তুলতে হয়। বাকী সময়ে কৃষকের হাতে অপর দশ কাজের জন্য থাকে প্রচুর অবকাশ। একবার ফসল ঘরে তুলে রাখলে সম্বৎসর ধরে কিংবা আরও দীর্ঘকাল ধরে তা দিয়ে জীবন ধারণ করা যায়। খাদ্যসংগ্রহের ব্যাপারে নিত্যকার যে অনিশ্চয়তা এবং দুঃখকষ্ট শিকারী মানবের ছিল, কৃষক মানব তা থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পেল। জমির চাষ এবং ফসল তোলা, শুধু এই দুটি সময়েই কৃষক পরিবারকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়; বৎসরের বাকী সময় ক্ষেতের প্রতি তত মনোযোগ দিতে হয় না এবং খাটুনিরও দরকার হয় না। অতএব অন্যান্য কাজকর্ম এবং আমোদ-আহ্লাদের জন্য কৃষকসমাজের হাতে থাকে প্রচুর অবসর। এই অবসর সময়ের সদ্ব্যবহারের দ্বারাই মানুষ ক্রমে ক্রমে নানাবিধ প্রয়োজনীয় ও সৌখীন শিল্পকলার উদ্ভাবন করেছে এবং জ্ঞানচর্চ্চায়ও মনোযোগ দিতে পেরেছে।

কোথায় এবং কোন সময়ে কৃষিকার্য এবং পশুপালনের আরম্ভ

হয়েছিল তা ঠিক জানা যায় না। কেউ বলেন মিশরের নীলনদের তীরেই সর্বপ্রথম কৃষিকার্য শুরু হয়েছিল এবং সেখান থেকে অন্যান্য স্থানে কৃষিবিদ্যা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে পরস্পর-নিরপেক্ষ ভাবে বিভিন্ন স্থানে কৃষির প্রবর্তন হয়েছিল। যাই হোক না কেন, ঐতিহাসিক সময়ের নিকটে যখন পৌঁছি (অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৫০০০ অব্দের কাছাকাছি) তখন আমরা দেখতে পাই যে কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করেই নীল, টাইগ্রীস, ইউফ্রেটিস, সিন্ধু, ইয়াং সিকিয়াং প্রভৃতি বড় বড় নদীর তীরে তীরে গ্রাম জনপদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সভ্যসমাজ গড়ে উঠেছে।

পশুপালন ও কৃষির প্রবর্তনের ফলে মানুষের হাতে এল উদ্বৃত্ত সময়। এই উদ্বৃত্ত সময়ের সদ্ব্যবহারের দ্বারাই মানুষ ক্রমে ক্রমে নানা বিদ্যা ও শিল্পকলার উদ্ভাবন করেছে। কৃষি এবং শিল্পের প্রবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক লোক একত্র বসবাস করতে লাগল। তার ফলে গড়ে উঠল গ্রাম এবং শহর। অনেক লোক সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাস করাতে যেমন হল মানবের অন্তর্নিহিত ভালবাসা ও মেলামেশার প্রবৃত্তির পরিস্ফুরণ, তেমনি অপর দিকে হল সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের গোড়াপত্তন। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি এবং শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যরূপেই আরম্ভ হল পণ্যদ্রব্যের বিনিময়। বিনিময়ের সুবিধার জন্য ক্রমে ক্রমে হল মুদ্রার প্রচলন। এইরূপে পরিমাপ-প্রণালী, বর্ণমালা, সংখ্যালিখন-প্রণালী, বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার, বিবিধ দ্রব্যের গুণাগুণ প্রভৃতি কত কিছু কালক্রমে উদ্ভাবিত ও আবিষ্কৃত হল ; সেই সব বিদ্যা একে অন্যের নিকট শিখে স্থান

হতে স্থানান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে প্রচার করল। মানব-সভ্যতা এই ভাবে লক্ষ লক্ষ শাখা-প্রশাখা মেলে দিকে দিকে নিজকে প্রসারিত করেছে এবং করছে। তার পরিচয় দিতে গেলে সমগ্র ইতিহাস আলোচনা করতে হয়। তা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বনমানুষের বংশধর একটি নগণ্য জীব কিসের জোরে প্রাণিজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করল, এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে যাত্রা শুরু করল—তার আভাস মাত্র দিয়ে আমরা নিরস্ত হলাম। বুদ্ধিবিকাশ, উদ্ভাবনীশক্তির বিকাশ, হৃদয়বৃত্তির বিকাশ, জ্ঞানসঞ্চয়, সময়ের সদ্ব্যবহার, এবং অধ্যবসায়—এগুলি হচ্ছে মানুষের উন্নতির মূলে।

'সভ্যতা' জিনিষটি কি—এই নিয়ে অনেকের মনে হয় ত প্রশ্ন জাগবে। আদিতে মানব ছিল প্রকৃতির ক্রীড়নক মাত্র ;—সেই অবস্থাকে বলা হয় মানবের 'আদিম' (Primitive) অবস্থা। তারই বিপরীত অবস্থার নাম 'সভ্য' অবস্থা, অথবা 'সভ্যতা'। আদিম অবস্থায় মানুষ অন্নবস্ত্র নিজে উৎপাদন করত না,—কুড়িয়ে নিত। ফলমূল, শস্য—যেখানে যা আপনা আপনি জন্মে তাই সংগ্রহ করে—বনের পশু পক্ষী ও জলের মাছ শিকার করে—ক্ষুন্নিবৃত্তি করত ; গাছের পাতা-বাকল, পশুর চামড়া ও পাখীর পালক দিয়ে গা ঢাকত। 'সভ্য' অবস্থায় মানুষ নিজের অন্নবস্ত্র নিজেই উৎপাদন করে,—স্বভাবজাত খাদ্য-সামগ্রী ও আচ্ছাদন দ্বারা তুষ্ট হয় না। সভ্য মানব অন্নবস্ত্র ছাড়া আরো বহু জিনিসের প্রয়োজন নিজেই সৃষ্টি ও নিজেই পূরণ করে। তার মধ্যে কতক শারীরিক ভোগবিলাসের, কতক মানসিক, এবং কতক আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাবার বস্তু। কি রকমের প্রয়োজন মানুষ

সৃষ্টি করে এবং কি উপায়ে তা পূরণ করে—তা দিয়ে হয় সভ্যতার ভালমন্দের বিচার। কেবল অসংখ্য রকমের উপকরণ ও আড়ম্বরের দ্বারা জীবনকে ভারাক্রান্ত করলেই যে সুসভ্য ও খুব উন্নত হওয়া গেল তা মনে করবার কোন হেতু নাই। যার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ যত উচ্চ এবং আচরণ যত মহৎ—সেই ব্যক্তি কিংবা সমাজ তত শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত। এই উন্নতির অপর নাম 'সংস্কৃতি'। পশুভাব, অর্থাৎ হিংসাদ্বেষ, ক্ষুদ্রতা, নীচতা থেকে মুক্ত হয়ে যার স্বভাব এবং চালচলন যত অধিক সুষ্ঠু, মার্জিত, জ্ঞানালোকিত, সত্যনিষ্ঠ এবং পরার্থ-পরায়ণ—সেই ব্যক্তি কিংবা সমাজ তত 'সংস্কৃত' কিংবা 'সংস্কৃতি'-সম্পন্ন।

একবার যখন মানুষ আদিম অবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে জ্ঞানের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হল তখন থেকে তার অগ্রগতির পথ হয়ে গেল অনেকটা সহজ। প্রথম হাঁটতে শিখা কঠিন। বহু চেষ্টা করে এবং অনেকবার আছাড় খেয়ে তবে মানব-শিশু দু'চার পা চলতে শিখে। কিন্তু একবার যখন ভাল করে হাঁটতে সক্ষম হয়, তারপর অনায়াসেই দৌড়তে শুরু করে। সব রকম বিদ্যাচর্চারই আরম্ভটা বেশী কঠিন ; পরে যতই এগুনো যায়, ততই চলার কাজ হয় সহজ, এবং চলার বেগ হয় দ্রুত। তাই দিনের পর দিন মানুষের জ্ঞান ক্রমবর্ধমান গতিতে বেড়ে চলেছে। কিন্তু তা বলে একথা কেউ যেন মনে না করেন যে সভ্যতার সূত্রপাত হওয়া অবধি মানুষের জ্ঞানচর্চা ও সংস্কৃতির প্রসার অবলীলাক্রমে এবং অব্যাহত গতিতে হয়ে এসেছে। সত্যানুসন্ধানের পথে, এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে মানুষকে পদে পদে অনেক বাধাবিপত্তি ও সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়েছে। গোড়া থেকেই অনেক ভ্রান্ত ধারণা

এবং কুসংস্কার মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ; তার অনেক-গুলি থেকে আমরা আজও মুক্ত হতে পারি নি। তা ছাড়া ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, সামাজিক বিধিনিষেধ, শাসকবর্গের অত্যাচার, ক্ষমতাপন্ন লোকদের কিংবা সম্প্রদায়বিশেষের হীন স্বার্থবুদ্ধি—প্রভৃতি কত রকম বিরুদ্ধ শক্তি মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে পঙ্গু ও খর্ব করবার চেষ্টা চিরকাল ধরে করে আসছে, এমন কি মানব-প্রতিভাকে বিপথে চালিত ও কুকার্যে রত করেছে। সমগ্র মানবেতিহাস যে একটানা সভ্যতা-বিকাশের ও আলোকের যুগ তা মোটেই নয় ; অনেক 'অন্ধকার' যুগ এবং বর্বরতার কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে মলিন করে রেখেছে। অজ্ঞানতা এবং অকল্যাণের শক্তি কখনো চিরতরে হার মানে নি। অপর পক্ষে মানুষের আত্মাও কখনো পরাজয় স্বীকার করে নি। গাঢ়তম অন্ধকার যখন মানব-সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে, তখনো দেশে দেশে দু'চার জন তত্ত্বদর্শী, নির্ভীক, এবং সত্যসন্ধ বীর-পুরুষ সমস্ত রাজশাসন, সামাজিক শাসন, ও অত্যাচারের ভয় উপেক্ষা করে জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন এবং ঘনান্ধকার দূরীভূত করতে সমর্থ হয়েছেন। সমস্ত দুর্দৈবের বিরুদ্ধে মানব সভ্যতা ও মানব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার এবং বাড়িয়ে তুলবার জন্য চাই—নির্ভীকতা, দৃঢ়সংকল্প এবং বিরামহীন চেষ্টা। শিক্ষাদীক্ষার বহুল বিস্তার, এবং সর্বত্র গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে এই চেষ্টার দায়িত্ব আজ আর শুধু মুষ্টিমেয় লোকের নয়, পরন্তু সমগ্র জনসাধারণের।

রাষ্ট্র

আমরা যে দেশ, যে সমাজের দিকে তাকাই সেখানেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দেখতে পাই। কোন প্রকার শাসনব্যবস্থা নাই এমন দেশ কোথাও আমাদের চোখে পড়ে না। সমাজ ও রাষ্ট্র—এ দুয়ের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা যদি নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় না রাখে, তবে দেশে দেখা দেয় 'মৎস্যন্যায়'—অর্থাৎ জোর যার মুলুক তার। তখন বিদ্যাভ্যাস, ধনোৎপাদন প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক শুভ প্রচেষ্টা দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়, সমাজ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জনসাধারণ যদি পরস্পর শুধু রেষারেষি ও দ্বন্দ্বের ভাব নিয়ে চলে—তবে রাষ্ট্রের শাসনশক্তির পক্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয় খুবই কঠিন। পরস্পর মিলে মিশে থাকার এবং সমবেত ভাবে কাজ করার যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে আছে, তারই প্রেরণা হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়েরই মূলে।

সভ্যতা ও সমাজের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় রাষ্ট্রেরও অভিব্যক্তি। সন্তানের প্রতি ভালবাসা থেকেই পরিবারের উৎপত্তি হয়েছিল। পরিবারের মধ্যেই ছিল রাষ্ট্রের বীজ। পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে পিতার ছিল সর্বময় কর্তৃত্ব। পরিবারের কর্তা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক ব্যবহার যে সর্বদা এবং সকল ক্ষেত্রে শুধু ভালবাসার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত, তা নয়। স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির উপর পুরুষ রীতিমত অধিকার খাটাত। এরূপ অনুমানের হেতু এই যে প্রায়

সব দেশের প্রাচীনতম স্মৃতিগ্রন্থেই আমরা দেখতে পাই পুরুষের পক্ষে স্ত্রী-পুত্রকে বিক্রয় করবার, নির্বাসিত করবার,—এমন কি মেরে ফেলবার এবং দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দিবার অধিকার পর্যন্ত আইনতঃ স্বীকৃত হয়েছে। অতএব সমাজগঠনের গোড়ার দিকে পরিবারের মধ্যেই শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক পুরাদস্তুর বিদ্যমান ছিল। আর এই সম্পর্কের বিদ্যমানতাই হচ্ছে রাষ্ট্র এবং শাসন-প্রণালীর মূলসূত্র।

পরিবার ক্রমশঃ বড় হয়ে হল গোত্র কিংবা গোষ্ঠী। পরস্পরের মধ্যে রক্তের টান এবং বাইরের শত্রু থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজন—এই দুই কারণে গোষ্ঠী অর্থাৎ প্রথম দলবদ্ধ সমাজের সূচনা হয়ে থাকবে। গোষ্ঠীর পুরুষদের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ তার কাছে স্বভাবতঃ সকলেই মাথা নোয়াত। পরিবারের মধ্যে পারিবারিক কর্তা যেমন সর্বেসর্বা ছিলেন, গোষ্ঠীর লোকদের উপরে গোষ্ঠীপতিও তেমনি ছিলেন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। আদিম পরিবারে রাষ্ট্র ছিল বীজাকারে; গোষ্ঠীজীবনে সেই বীজ যেন হল অঙ্কুরিত। বিচারবুদ্ধির বিকাশের ফলে ধর্মানুষ্ঠান, সামাজিক আচারব্যবহার, এবং শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারকে আমরা এখন আলাদা করে দেখি; একটির সঙ্গে আরেকটিকে জড়িয়ে ফেলি না। কিন্তু আদিম সমাজে এত বিচার বিশ্লেষণ ছিল না, জীবনযাত্রার মধ্যে এত ভাগ-বিভাগ ছিল না। তাই গোষ্ঠীপতি ছিলেন ধর্মানুষ্ঠান, আচার-ব্যবহার, অপরাধীর শাস্তি প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারেরই নিয়ন্তা।

দুদিক দিয়ে গোষ্ঠী ক্রমে ক্রমে বড় হতে লাগল, প্রথমতঃ নিজেদের জনসংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ বৈবাহিক সম্বন্ধে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে

মিলনের দ্বারা। আবার শিকার ও যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতির ব্যাপারে সুবিধালাভের জন্য কখনো কখনো একাধিক গোষ্ঠী সুযোগ্য নেতার অধীনে মিলিত হত। কখনো বা এমনও হত যে কোন শক্তিমান বীরপুরুষ নিজ অনুচরদের সাহায্যে কয়েক গোষ্ঠীকে পরাজিত করে নিজের নেতৃত্বাধীনে মিলিত করতেন। এক গোত্র কিংবা গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে রক্তের বন্ধনই ছিল প্রধান বন্ধন। বিভিন্ন গোষ্ঠী যখন সঙ্ঘবদ্ধ হতে লাগল তখন একনেতৃত্বের অধীনতাই হল প্রধান বন্ধন। এই নেতাই কালক্রমে হলেন 'রাজা'। এরূপে 'রাজা'র আবির্ভাবের এবং দিন দিন প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে গোত্র কিংবা গোষ্ঠীর প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এল। পূর্বে ধর্মানুষ্ঠান ব্যতীত শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারেও গোষ্ঠী ছিল সমষ্টি, আর পরিবার ছিল ব্যষ্টি। রাজার আবির্ভাবের পরে 'রাজ্য' হল সমষ্টি, কিন্তু পরিবার আগেকার মতই রইল ব্যষ্টি। শাসনব্যাপারে গোত্রের কিংবা গোষ্ঠীর কোন স্থান রইল না।

অনেক নৃতাত্ত্বিকের মতে সর্বপ্রথম রাজা ছিলেন 'পুরোহিত রাজা'। আদিম সমাজে পুরোহিতের প্রাধান্য ছিল সকল বিষয়ে। প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের সম্পর্কে আদিম মানব ছিল নিতান্ত অজ্ঞ। প্রতিনিয়ত যে সকল নৈসর্গিক ব্যাপার আমাদের চোখে পড়ে তার অনেকগুলিরই কার্যকারণ সম্বন্ধ ছিল তার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাই সে ভাবত যে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সর্বত্র লুকিয়ে আছে বহু দৈত্যদানা, ভূতপ্রেত, দেবতা-অপদেবতা। তারা তুষ্ট থাকলে করে মানুষের উপকার; আর রুষ্ট হলে করে প্রভূত অপকার। পুরোহিতের ছিল

তাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাব। যাদুমন্ত্র, তুকতাক প্রভৃতির সাহায্যে পুরোহিত তাদিগকে সহজেই বশে আনতে পারতেন ; অর্থাৎ তিনি সত্যি সত্যি মনে করতেন, কিংবা হয়ত শুধু বাইরে দেখাতেন, যে এদের সবার সঙ্গে তার বেজায় বন্ধুত্ব। এজন্য আপামর সাধারণ পুরোহিতকে সমীহ করে চলত, পুরোহিতের কোন আদেশ কিংবা নির্দেশ অমান্য করতে সাহস পেত না। এইরূপে পুরোহিত ছিলেন ঐহিক পারত্রিক সকল বিষয়েই সর্বেসর্বা। তিনি ছিলেন একাধারে ধর্ম ও নীতির উপদেষ্টা, চিকিৎসক, নেতা, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, শাসনকর্তা প্রভৃতি সব কিছু। আদিম সমাজের এরূপ সর্বাধিনায়ককে সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় পুরোহিত-রাজা (Priest-King)। ধর্মানুষ্ঠান ও শাসনকার্য তখন ছিল ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত এবং পুরোহিত-রাজা ছিলেন দুয়েরই সর্বময় কর্তা।

শান্তির সময়ে পুরোহিত-রাজার আধিপত্য যতই থাকুক, যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বীর, অর্থাৎ অপর সকলের চেয়ে সাহসী, শক্তিমান এবং রণপটু তাঁরই ছিল সম্মান, তিনিই হতেন সেনাপতি। পুরোহিত-রাজা এরূপ শৌর্যবীর্যের অধিকারী হতেন খুব কম ক্ষেত্রেই। অতএব অধিকাংশস্থলেই তিনি যুদ্ধকালীন নেতা হতে পারতেন না, যুদ্ধের সময়ে অধিনায়ক ও সেনাপতি হতেন অপর কোন ব্যক্তি। এটা খুবই স্বাভাবিক যে একবার অধিনায়কত্বের আস্বাদ পেয়ে সেই ব্যক্তি যুদ্ধ শেষ হবার পরেও নিজের নেতৃত্ব সহজে ছেড়ে দিতেন না। তিনি তার প্রাধান্য যথাসাধ্য বজায় রাখতেন এবং পুরোহিতের পদবী হত তখন তার নীচে। এই ভাবে পুরোহিতকে হটিয়ে দিয়ে

সেনানী হলেন শাসনকর্তা, অথবা রাজা। কালক্রমে সিংহাসনের অধিকার হয়ে গেল বংশানুক্রমিক। রাজার বড় ছেলে হন যুবরাজ, যথাসময়ে তিনিই বসেন সিংহাসনে ;—গুণাগুণের প্রশ্ন নাই, কিংবা প্রজাবর্গের সম্মতি অসম্মতির কোন অপেক্ষা নাই। এই রকমভাবে ইতিহাসের প্রারম্ভে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই 'রাজার' উদ্ভব-হয়েছিল।

কোন কোন আদিম সমাজ কিন্তু একনায়কত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। তাদের শাসনকার্য চলত পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায়। যুদ্ধবিগ্রহের সময় অনিবার্যরূপে সেনাপতির হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পিত হত ; কিন্তু উহা স্থায়ী হত না। যুদ্ধান্তে সমাজ আবার পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় ফিরে যেত। সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভাব এত প্রবল ছিল যে বিপদের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে তারা ব্যক্তিবিশেষের নিকট কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করত না। যেটা দশজনের ব্যাপার সেটাতে দশে মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত ; একজনকে রাজা মেনে তাঁর হাতে সমস্ত কর্তৃত্ব ছেড়ে দিত না। আপৎকালে একজন সর্বাধিনায়কের প্রয়োজন হলে দশে মিলে তাঁকে নির্বাচন করত।

পঞ্চায়েতের অধীনই হউক, কিংবা একনায়কত্বের অধীনই হোক—প্রাচীনকালের রাষ্ট্রসমূহ ছিল আয়তনে ক্ষুদ্র; তাদের শাসনব্যবস্থা ছিল ছোটখাট ব্যাপার। লোকের জীবনযাত্রা ছিল অনাড়ম্বর এবং সাদাসিধা; সুতরাং রাজ্যশাসন তেমন কঠিন কাজ ছিল না। বাইরের আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা,—এবং দেশের ভিতরে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন—এই দুটোই ছিল সরকারের কাজ। তার পর বহু পরিবর্তনের

ভিতর দিয়ে বর্তমানকালের রাষ্ট্র তার বিশাল, বহুশাখাবিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করছে। রাষ্ট্রের অভিব্যক্তির কথা বলতে গেলে সমগ্র মানবেতিহাসের অনেকখানি আলোচনা করতে হয়। এরূপ আলোচনা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবুও প্রসঙ্গাধীন রাষ্ট্রের অভিব্যক্তির ধারার সামান্য একটুখানি আভাস দেওয়া প্রয়োজন। সকল দেশে এবং সকল সমাজে রাষ্ট্রের অভিব্যক্তি যে একই রকম ভাবে হয়েছে তা নিশ্চয়ই নয়। বিভিন্ন ধারায় অভিব্যক্তি হয়েছে; কিন্তু সকল ধারার গুরুত্ব সমান নয়, কারণ সমগ্র মানবেতিহাসের উপর তারা সমান ভাবে দাগ কাটতে পারে নি। কতক ধারা অতি নগণ্য; —কতক ধারা আবার চলতে চলতে থেমে গিয়েছে, বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি। ইউরোপখণ্ডে একটি বিশেষ ধারায় অভিব্যক্তির ফলে রাষ্ট্র যে রূপ গ্রহণ করেছে—পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র তাই এখন ছড়িয়ে পড়েছে কিংবা পড়ছে। সুতরাং এই বিশিষ্ট ধারার সঙ্গে একটুখানি পরিচয় থাকা ভাল।

রাজায় রাজায়, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ঝগড়া বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহের ওজ্‌হাতের অভাব কখনো হয় নি। ধনলোভে হউক, পত্নীলাভের জন্য হউক, প্রতিশোধ গ্রহণের দোহাই দিয়ে হউক, অশ্বমেধের ছলে হউক কিংবা সভ্যতাবিস্তারের ধ্বজা উড়িয়ে হউক—যিনি শক্তিমান যোদ্ধা কিংবা রাষ্ট্রনায়ক তিনি নিঃসঙ্কোচে পররাজ্য আক্রমণ করে আসছেন। এই রকম ভাবে প্রাচীন কালে অনেক 'সাম্রাজ্য' গড়ে উঠেছিল। আধুনিক কালেও সাম্রাজ্য গড়বার চেষ্টা অনেকে করেছেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে বহু সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের বিবরণ।

ইউরোপের ইতিহাসে রোমক সাম্রাজ্যই সমধিক প্রসিদ্ধ। ওতে ভাল মন্দ দুইই ছিল। উহার কাহিনীতে যেমন দেখা যায় অসাধারণ শৌর্য-বীর্য, সংগঠনপ্রতিভা ও শাসন-নৈপুণ্য—তেমনি দেখা যায় কূটনীতি, দুরাচার, বিলাসব্যসন প্রভৃতি। রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর ইউরোপে দেখা দেয় ফিউডেল প্রথা বা সামন্ততন্ত্র। ফিউডেল প্রথার অধীনে দেশের রাজা হয়ে পড়েন সামন্তদের উপর একান্ত নির্ভরশীল, এবং রাষ্ট্রের বন্ধন হয়ে পড়ে অনেক পরিমাণে শিথিল। কিন্তু এর ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যথেষ্ট বেড়ে উঠে। কয়েক শতাব্দী পর ধীরে ধীরে ফিউডেল প্রথার উচ্ছেদ হয়; আবার ফিরে আসে রাজার প্রাধান্য। কিন্তু প্রাধান্য ফিরে পেলেও রাজা আর আগেকার মত সর্বশক্তিমান হতে পারলেন না। প্রজারা হয়ে পড়েছিল নিজেদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে খুবই সজাগ ও সচেতন। রাজা যেখানেই প্রজার অধিকার খর্ব করতে চাইতেন, সেখানেই রাজায় প্রজায় লেগে যেত ঠুকাঠুকি। ইংলণ্ডের ইতিহাসে আমরা দেখ্তে পাই যে প্রজাবর্গ এবং সামন্তেরা মিলে রাজার হাত থেকে অনেক অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিল। রাজার আর পূর্বের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হবার যো ছিল না।

মধ্যযুগের আরেকটি জিনিস ছিল পোপের আধিপত্য। রোমক-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর রোমনগরীর প্রধান ধর্মযাজক (পোপ) সমগ্র খৃষ্টান জগৎ জুড়ে এক ধর্মরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা শুরু করেন। কাল-ক্রমে এই চেষ্টা ফলবতী হয়, যদিও পোপের 'ধর্মরাজ্য' খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। উহার প্রতিপত্তির সময়ে শুধু খৃষ্টান জনসাধারণ নয়, রাজারাজড়ারাও পোপের নির্দেশ মেনে চলতেন। ঐহিক ও পারত্রিক

সকল বিষয়েই পোপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন খৃষ্টান জগতের একচ্ছত্র অভিভাবক। পুরাকালের 'পুরোহিত-রাজার' ন্যায় পোপও হয়েছিলেন ধর্ম এবং রাষ্ট্র উভয় সংক্রান্ত ব্যাপারের নিয়ামক। কি কি বই লোকেরা পড়বে পোপ তার নির্দেশ দিতেন, পাপীদের পাপ মার্জনা করে পরকালের জন্য ছাড়পত্র দিতেন। রাজ-পরিবারের বিবাহাদিতে, রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়নে পোপ আবশ্যকবোধে হস্তক্ষেপ করতেন। বড় বড় আমীর ওমরাকে, এমন কি রাজা-রাজড়াকে পর্যন্ত সমাজচ্যুত করে পোপ একঘরে করে দিতেন। দেশে দেশে সমস্ত পাদ্রীরা ছিলেন পোপের অধীন। তাদের সাহায্যে পোপ খৃষ্টান-জগতের সর্বত্র নজর রাখতেন ও খবরদারী করতেন।

কালক্রমে পোপের গুরুগিরির এবং অধিনায়কত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজারাজড়ারাই হয়েছিলেন এই বিদ্রোহের নায়ক, কারণ সকল বিষয়ে পোপের হস্তক্ষেপ মোটেই তাদের মনঃপূত ছিল না। অপরদিকে পোপ কর্তৃক ধর্মানুষ্ঠানের অছিলায় নানা বুজরুকী জারী হওয়ার ফলে অনেক বিবেকী ও চিন্তাশীল লোক হয়ে উঠেছিলেন পোপের উপর ভয়ানক বীতশ্রদ্ধ। তাদের সমবেত চেষ্টার ফলে পোপের অধিকার ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়ে গেল। রাজ্যশাসন ব্যাপারে খৃষ্টান রাজাদের উপর পোপের অধিকার আর কিছুই রইল না। এমন কি 'প্রোটেস্টেণ্ট' নামক সম্প্রদায় ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারেও পোপের অধিনায়কত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি কতক দেশে পাদ্রীরা পর্যন্ত পোপের অধীনতাপাশ ছিঁড়ে

ফেলে রাজার অনুগত হয়ে পড়লেন। এরূপে ধর্মানুশাসনের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়াল সর্বেসর্বা।

পোপের প্রাধান্যের আমলে লাটিন ভাষা ছিল সাধু ভাষা, খৃষ্টান জগতের সর্বত্র ছিল লাটিন ভাষারই কদর। পোপের আধিপত্যলোপের সঙ্গে সঙ্গে লাটিন ভাষার সম্মান কমে গেল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোকেরা নিজেদের ভাষার প্রতি মনোযোগ দিল,—মাতৃভাষায় লিখতে, পড়তে ও সাহিত্যরচনা করতে লাগল। নিজের দেশ, নিজের ভাষা, নিজের সাহিত্য, নিজের ঐতিহ্য, নিজের সংস্কৃতি—প্রভৃতির প্রতি লোকের মনে মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধাবোধ জন্মাতে লাগল। তখন থেকেই 'নেশন'-রাষ্ট্রের আরম্ভ। 'নেশন' কথার সংজ্ঞা নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। সেগুলির মধ্যে না গিয়ে মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে যারা এক দেশের অধিবাসী, যাদের ভাষা এক, ঐতিহ্য এক, সংস্কৃতি এক, আশাআকাঙ্ক্ষা এক—তারাই এক 'নেশন'। প্রত্যেক নেশনের জন্য চাই একটি আলাদা রাষ্ট্র যার ভিতর দিয়ে নেশনের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠতে পারে।

নেশন-রাষ্ট্রের আদর্শের সঙ্গে পরে এসে মিলিত হয় ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের 'সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা'র আদর্শ। বিপ্লবের চিন্তানায়কেরা ঘোষণা করলেন যে মানুষে মানুষে উচ্চনীচ নাই কিংবা কোন মৌলিক প্রভেদ নাই,—প্রত্যেকেই স্বাধীনতার অধিকারী। জনসাধারণই রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক; শাসনকার্য তাদের দ্বারা, এবং শুধু তাদের হিতের জন্যই পরিচালিত হওয়া উচিত। এই অগ্নিগর্ভ বাণী অচিরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। উহার ঝড়ের ঝাপটায় অনেক অত্যাচারীর সিংহাসন

ভূলুণ্ঠিত হল। দেশে দেশে এই ঘোষণা-বাণীই হল গণতন্ত্রের সনদ। নেশনেলিজমের আদর্শের সঙ্গে মিলিত হয়ে উহাই সর্বত্র রচনা করেছে গণতান্ত্রিক নেশন-রাষ্ট্রের ভিত্তি।* এমন কি সুদূর প্রাচ্যে পর্যন্ত প্রচারিত হয়ে এই বাণীই উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের জনগণের চিত্তে।

প্রত্যেক নেশনের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের আদর্শ—অর্থাৎ প্রচলিত কথায় জাতীয়তাবাদের (Nationalism'র) আদর্শ—অনেক দেশে আভ্যন্তরিক ভেদবিবাদ ও দলাদলি ঘুচিয়ে দেশের লোককে সংহত এবং সঙ্ঘবদ্ধ করেছে। মানুষকে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে অনেক মহৎ কাজ উহা সম্পাদন করেছে। এই আদর্শের অনুপ্রেরণায় অনেক বড় বড় সাহিত্য রচিত হয়েছে, অনেক অত্যাচারিত দেশ অধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তা হলেও জাতীয়তাবাদের আদর্শ যে নিছক ভাল একথা বলা যায় না। এর দ্বারা

---

*'নেশন' 'নেশনেলিজম' প্রভৃতি কথার ঠিক ঠিক বাংলা কিংবা সংস্কৃত প্রতিশব্দ নাই। সত্যি কথা এই যে নেশনেলিজমের ধারণা ভারতবর্ষের কিংবা এশিয়ার অপর কোন দেশের মাটিতে জন্মায় নি। উহা আধুনিক ইউরোপের সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র খোলাখুলিভাবেই লিখে গিয়েছেন যে নেশনেলিজম ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা—এ দুটি জিনিষ আমরা ইংরাজের চিত্তভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করেছি।

বাংলা ভাষায় Race ও Nation উভয় অর্থে 'জাতি' শব্দের প্রচলন হওয়াতে কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। নেশনেল ব্যাঙ্ক, নেশনেল স্কুল, নেশনেল থিয়েটার প্রভৃতি কথা লোকমুখে এবং বিজ্ঞাপনে বহুল প্রচলিত। 'নেশন', 'নেশনেলিজম' চালু করাতেও কোন দোষ দেখা যায় না।

অনেক মন্দ কাজও হয়েছে। জাতীয় মান-মর্যাদা, জাতীয় ঐশ্বর্য বাড়াবার ছলে,—জাতীয় অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের দোহাই দিয়ে অনেক কুকাজ, অনেক অত্যাচার অনাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেক নেশন যদি নিজের সত্বাকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করে ভাবে—তা হলে সমগ্র মানব প্রজাতির একতাবোধ হয় মারাত্মক ভাবে খণ্ডিত। মানুষে মানুষে যে স্বাভাবিক মমত্ববোধ এবং ভালবাসার যোগাযোগ, তার মাঝখানে এসে দাঁড়ায় নেশনেলিজমের দেয়াল। তাই নেশনেলিজমের বুলি হয়েছে অনেক অহেতুক যুদ্ধবিগ্রহের জনক। এই দিক দিয়ে বিচার করে অনেক বড় বড় মনীষী উৎকট নেশন-ভক্তির বিরুদ্ধে তীব্রভাবে মত প্রকাশ করেছেন।

আরেক দিক দিয়েও নেশনরাষ্ট্র দিন দিন মানবপ্রজাতির পক্ষে অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের ফলে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে দূরত্বের ব্যবধান ঘুচে গিয়েছে। কোন নেশনের পক্ষেই ছুঁৎ-মার্গী হয়ে একটা সম্পূর্ণ আলাদা সত্ত্বা ও আদর্শকে আঁকড়ে থাকা আজকাল অসম্ভব। তা ছাড়া এখনকার যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে এত ব্যয়বহুল এবং মারাত্মক যে ছোট ছোট নেশনরাষ্ট্রের পক্ষে নিজেদের বাহুবলের উপর নির্ভর করে টিকে থাকাই হয়ে পড়েছে অসম্ভব। যুদ্ধের সম্ভাবনা চিরতরে দূর করতে না পারলে মানবপ্রজাতিই নির্মূল হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় নেশনরাষ্ট্রগুলির পক্ষে নিজ নিজ সর্বময় কর্তৃত্ব কতক পরিমাণে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে এক বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের অধীন হওয়াই হবে বুদ্ধিমত্তার কাজ। ভবিষ্যতের রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তি হয় ত এই পথ ধরেই চলবে।

রাষ্ট্রের অভিব্যক্তির ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এবার আমরা শ্রেণীবিভাগের কথা বলব।

ঐকৈক এবং যৌথ হিসাবে রাষ্ট্র দুই প্রকার। ঐকৈক রাষ্ট্রে একই রকম শাসনব্যবস্থা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং শাসনক্ষমতা কোন রকম ভাবে খণ্ডিত নয়। যৌথ রাষ্ট্রে তার বিপরীত। দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি ভাল বুঝা যাবে। অনেকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্র একত্র মিলে তৈরি হয়েছে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র। সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের কেন্দ্রীয় একটি শাসনযন্ত্র আছে; আবার প্রত্যেক রাষ্ট্রের আলাদা আলাদা শাসনযন্ত্রও আছে। উভয় শাসনযন্ত্র এক সঙ্গে কাজ করছে। দেশরক্ষা, ডাক-বিভাগ, মুদ্রা এবং বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় ব্যাপারে কর্তৃত্ব রয়েছে ফেডারেল অর্থাৎ কেন্দ্রীয় গবর্নমেন্টের হাতে; বাকী সকল বিষয়ের ভার নিজ নিজ এলাকার জন্য প্রত্যেক আলাদা রাষ্ট্রের হাতে। সুইজর্লণ্ড, রুশিয়া, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, এগুলি যৌথরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত। পৃথিবীতে যৌথরাষ্ট্রের সংখ্যা কম; ঐকৈক রাষ্ট্রের সংখ্যাই বেশী।

শাসনব্যবস্থা অনুযায়ী সমস্ত রাষ্ট্রকে মোটামুটি তিন রকম শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র। রাজশক্তি যেখানে একজনের হাতে তার নাম রাজতন্ত্র, রাজশক্তি যেখানে স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে তার নাম অভিজাততন্ত্র, আর রাজশক্তি যেখানে সর্বসাধারণের হাতে তার নাম গণতন্ত্র। সুবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটলের সময় থেকে এই শ্রেণীবিভাগ চলে আসছে। বিগত দুই হাজার বছরে দেশে দেশে রাষ্ট্রের চেহারা অনেক বদলেছে; তবুও অতীতের ও বর্তমানের বিবিধ প্রকার রাষ্ট্রের

মধ্যে তুলনামূলক বিচারের জন্য উক্ত শ্রেণীবিভাগ এখনো মোটের উপর কার্যকরী ও চালু রয়েছে।

যদিও প্রত্যেক দেশের শাসনপ্রণালীই উপর্যুক্ত তিন রকম শাসনতন্ত্রের কোন না কোনটিতে পড়তে বাধ্য তবুও শুধু বাইরের চেহারা দেখে সব সময়ে শাসনতন্ত্রের রকম ঠিক বুঝতে পারা যায় না। ঐতিহাসিক কারণে শাসনতন্ত্রের বাহ্য রূপ তার সত্যিকার রূপ থেকে ভিন্ন বলে মনে হতে পারে। এজন্য শ্রেণীবিভাগের সময় ভাল করে তলিয়ে দেখতে হয় দেশের রাজনৈতিক গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রাজশক্তি বস্তুতঃ কার কিংবা কাদের হাতে ন্যস্ত। গ্রেট বৃটেনে সিংহাসন আছে, রাজা আছেন, খাতায়-পত্রে রাজার হাতে অনেক ক্ষমতাও আছে। কিন্তু বস্তুতঃ গ্রেট বৃটেনের শাসনপ্রণালী রাজতান্ত্রিক নয়,—গণতান্ত্রিক। দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন ক্যাবিনেট, অথবা মন্ত্রিমণ্ডলী। পার্লামেণ্টে যে দল সংখ্যায় ভারী সেই দলের নেতৃবর্গ মিলে গঠন করেন ক্যাবিনেট। পার্লামেন্টের ভিতরে কমন্স সভায় আছেন জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ, আর লর্ড সভায় আছেন বনেদী ধনী, জমিদার ও পাদ্রী লর্ড। অর্থাৎ গণতন্ত্রের অঙ্গে নীলরক্তের (আভিজাত্যের) দাগ আছে, আবার খৃষ্টানীর ছাপও আছে। কোন নূতন আইন যখন পাশ হয় তখন বিধি অনুযায়ী কমন্স সভা, লর্ডসভা ও রাজা তিন জনেরই সম্মতি চাই। কিন্তু লর্ডসভা ও রাজার পক্ষে কমন্স সভার বিরোধিতা করার কোন কার্যকরী ক্ষমতা এখন আর বস্তুতঃ নাই। লর্ডসভা কিংবা রাজা এরূপ করতে গেলে নিজেরাই বেকায়দায় পড়েন। শাসনক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে

কমন্স সভারই হাতে এবং সেই সভার সদস্যেরা নির্বাচিত হয়ে থাকেন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। অতএব চরম পর্যায়ে গ্রেট বৃটেনের জনসাধারণই হচ্ছে রাজশক্তির মালিক।

তিন রকম শাসনতন্ত্রের মধ্যে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ এই নিয়ে তর্কাতর্কির শেষ নাই। কিন্তু একটি চমৎকার মীমাংসার সূত্র এরিষ্টটলই নির্দেশ করে গিয়েছেন। সূত্রটি হচ্ছে এই যে কোন প্রকার শাসনতন্ত্রকেই শূন্যের উপর বিচার করা চলে না। প্রত্যেক শাসনতন্ত্রেরই সুস্থ এবং বিকৃত দুরকম করে রূপ আছে। শাসনক্ষমতা যার হাতেই থাকুক—কি উদ্দেশ্য, এবং কিরূপ যোগ্যতা ও দক্ষতার সহিত উহা পরিচালিত হয়, তার উপর নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের ভালমন্দ।

রাজা যদি জ্ঞানী, গুণী, কার্যদক্ষ এবং প্রজাবৎসল হন তবে আমরা দেখতে পাই রাজতন্ত্রের সুস্থ রূপ,—আর রাজা যদি তার বিপরীত হন তবে দেখতে পাই রাজতন্ত্রের বিকৃত রূপ। আদর্শচরিত্র রাজার অধীনে বাস করা সকলেই সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে। 'রামরাজ্য' আমাদের দেশে প্রবাদে পরিণত হয়েছে, এর চেয়ে সুখের রাজ্য আর হতে পারে না। রাজতন্ত্রের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবে ইতিহাস থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে অশোক, আকবর, শিবাজী প্রভৃতি রাজার রাজত্ব। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ রকম রাজার নাম বেশী পাওয়া যায় না; অলস, অকর্মণ্য, ভোগবিলাসপরায়ণ কিংবা অত্যাচারী রাজার দৃষ্টান্তই ইতিহাসে বেশী।

অভিজাততন্ত্রে রাজশক্তি থাকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে।

আভিজাত্য বংশমর্যাদার হতে পারে, ধনের হতে পারে, বর্ণের হতে পারে, শৌর্যবীর্যের হতে পারে। কিন্তু সত্যিকার আভিজাত্য হওয়া উচিত বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্রের। যেখানে শাসনক্ষমতা স্বল্পসংখ্যক জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং তাঁরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে সমগ্র সমাজের কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে শাসনযন্ত্র পরিচালিত করেন,—তাকেই বলা যেতে পারে অভিজাততন্ত্রের সুস্থ এবং বিশুদ্ধ রূপ। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ছিলেন এই আদর্শের পূজারী। যে রাষ্ট্রে জ্ঞানের মর্যাদা সর্বোপরি, প্লেটোর মতে তাহাই আদর্শ রাষ্ট্র। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর সংখ্যা কোন দেশে এবং কোন যুগেই বেশী থাকে না। কিন্তু এরূপ স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে শাসনক্ষমতা অর্পিত হলেই দেশের যথার্থ কল্যাণ হতে পারে। প্লেটোর প্রস্তাবিত এরূপ আদর্শ অভিজাততন্ত্রের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নাই বললেও চলে। অভিজাততন্ত্রের যে দু'চারটি দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় তা গুণগত আভিজাত্যের নয়,—ধনগত কিংবা বংশমর্যাদাগত আভিজাত্যের। বলা বাহুল্য এগুলি অভিজাততন্ত্রের উৎকৃষ্ট রূপ নয়। যাঁদের উচ্চবংশে কিংবা উচ্চবর্ণে জন্ম, যাঁরা ধনী কিংবা যোদ্ধা—তাঁরা যে স্বভাবতঃ শাসনকার্য পরিচালনে উত্তম অধিকারী একথা কিছুতেই বলা চলে না। শাসনক্ষমতা হাতে পেয়ে তাঁরা যখন সেই ক্ষমতা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও ভোগবিলাসের জন্য নিয়োজিত করেন, তখন জনসাধারণের কিরূপ ক্ষতি ও দুর্গতি হয় তা সহজেই অনুমেয়।

রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্র দুইই সভ্যসমাজ থেকে প্রায় বিদায় নিয়েছে। অতএব এগুলির সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীই বর্তমান যুগে সব চেয়ে বেশী আদৃত এবং প্রচলিত। গণতন্ত্র দু'রকমের, এক পঞ্চায়েতি, অপর প্রতিনিধি-মূলক। আমাদের গ্রাম্য পঞ্চায়েতে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই পঞ্চায়েত সভায় উপস্থিত থাকে ও মতামত প্রকাশ করে। প্রাচীন গ্রীসের নাগরিক-রাষ্ট্রগুলিতেও (City states) এ রকম ব্যবস্থাই ছিল। শাসনকার্য নির্বাহের জন্য যখন সভা বসত তখন ক্রীতদাস ও বিদেশীয় লোক ছাড়া প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ তাতে যোগদান করত। কিন্তু আধুনিক বড় বড় রাষ্ট্রে যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সংখ্যা কয়েক লক্ষ কিংবা কোটি সেখানে সকলের পক্ষে এরূপ প্রত্যক্ষভাবে শাসনপরিষদে যোগদান করা সম্ভবপর নয়। সেজন্য প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। এক শহর, এক মহকুমা, কয়েক থানা কিংবা কয়েক পরগণার লোক মিলে শাসনপরিষদে একজন প্রতিনিধি পাঠায়। এরূপে নানা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সমস্ত দেশের প্রতিনিধিবর্গকে নিয়ে ব্যবস্থাপরিষদ গঠিত হয়। এজন্য একে বলা হয় প্রতিনিধি-মূলক গণতন্ত্র।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেহেতু ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যবৃন্দ জনসাধারণের দ্বারা নিবাচিত হন, অতএব এরূপ মনে করা স্বাভাবিক যে তাঁরা সমগ্র সমাজ ও দেশের স্বার্থকেই সকল বিষয়ে প্রাধান্য দিবেন। এই আশা যখন ফলবতী হয় তখনই আমরা দেখতে পাই গণতন্ত্রের শুদ্ধ অথবা সুস্থ রূপ। তা নইলে ঘটে এর বিকৃতি। কি করে গণতন্ত্রের বিকৃতি ঘটে তার আলোচনা একটু পরে হবে।

উপরে যেটুকু আলোচনা করা হল তা থেকে বুঝা যাবে যে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র এই তিন রকম শাসনপ্রণালীর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ভাল তা চোখ বুজে বলা যায় না। সুস্থ ও অবিকৃত অবস্থায় কোনটিই খারাপ নয়। আর বিকৃত অবস্থায় সবগুলিই তুল্যভাবে সমাজের সর্বনাশ সাধন করতে পারে। গুণাগুণ তুলনা করতে হলে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি তাই বিচার করা দরকার।

আমরা প্রথমেই বলেছি যে পরিবার ও গোষ্ঠীর স্বাভাবিক পরিণতিরূপে সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল। আবার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক নিরাপত্তার জন্যও মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রবদ্ধ হয়ে বাস করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়ে থাকলেও এখানেই তার শেষ হয় নি এবং হওয়া উচিত নয়। উপমাস্থলে বলতে পারি ব্যক্তিবিশেষের জীবনের কথা। কোন মানবশিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার নিজের কিংবা তার পিতামাতার নিকট তার জীবনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু সেই শিশু যখন বড় হতে থাকে তখন পিতামাতা কিংবা অভিভাবক যদি তাঁর জীবনের একটা উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ঠিক করে নিতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করেন তবে শিশুর জীবন সহজেই অগ্রসর হয় সাফল্যের দিকে। মানবশিশুর জীবন যদিচ গোড়াতেই একটা সজাগ উদ্দেশ্য নিয়ে আরম্ভ হয় না, তবুও যথাসময়ে উহাকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা যায় এবং এরূপ করার উপরেই নির্ভর করে ব্যক্তির জীবনের সার্থকতা। সমাজের জীবনেও এই একই কথা প্রযোজ্য। মানবসমাজের জীবনপ্রভাতে মানুষ ভেবে চিন্তে এবং ভবিষ্যতের

দিকে দৃষ্টি রেখে রাষ্ট্র গঠন করে নি। সাময়িক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে এবং স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে রাষ্ট্র আপনা হতেই গড়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ আগে থেকেই ঠিক করে নিয়ে মানুষ রাষ্ট্রবদ্ধ হয় নি। কিন্তু তা হলেও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও আদর্শকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি এবং কার্যে পরিণত করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এর উপরেই ষোল আনা নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা।

সমাজবদ্ধ মানব যত রকম সংঘ গঠন করেছে তার মধ্যে বৃহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে রাষ্ট্র। বিদ্যাচর্চার, পরোপকারের, খেলাধূলা প্রভৃতির যত রকম সংঘ কিংবা প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলিই রাষ্ট্রের অধীন এবং আশ্রিত। মানুষের যা শ্রেষ্ঠতম ও বৃহত্তম সংঘ (রাষ্ট্র) তার উদ্দেশ্য তেমনি হওয়া উচিত মানবের বৃহত্তম এবং উচ্চতম কল্যাণ। বহু শতাব্দী পূর্বে গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল এ কথাই পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রের গুণাগুণ বিচার করতে গিয়ে এই মানদণ্ডের কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই এবং বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরপাক খেয়ে মরি।

রাষ্ট্র মানবজীবনের একটা চরম অভিব্যক্তি নয়। মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তির উপায় হিসাবেই রাষ্ট্র এবং শাসনব্যবস্থাকে বিচার করতে হবে। রাষ্ট্র নামক বিরাট দেবতার নিকট বলিপ্রদত্ত হবার জন্য মানুষ জন্মে নাই। উপায়কে যেন আমরা উদ্দেশ্য বলে ভুল না করি,—কোন রকম শাসনপদ্ধতিকেই যেন চরম বলে গণ্য না করি। দেশ কাল ও অবস্থাভেদে প্রত্যেক রাষ্ট্র এবং শাসনপদ্ধতিকে এই মাপকাঠিতে

বিচার করতে হবে যে উহা মানবের উচ্চতম জীবনবিকাশের কতটুকু সহায়ক অথবা প্রতিবন্ধক।

একথা শুনতে শুনতে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে যে গণতন্ত্র মানুষের জন্মগত অধিকার। কথাটির তাৎপর্য এই যে লোক-সমাজে গণতন্ত্র ব্যতীত অপর কোন প্রকার শাসনতন্ত্র থাকাই অন্যায়, এবং গণতন্ত্রের দোষগুণের বিচার অনাবশ্যক। একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে যে এটা একটা ভুয়া অর্থহীন বুলি। জন্মগত অধিকার বলে কোন জিনিষ নাই,—যদি থাকে তবে তা জংলী আইন। আমরা বলতে পারি বাঘের জন্মগত অধিকার হরিণকে ধরে খাওয়া, এবং মানুষের মধ্যেও সবলের জন্মগত অধিকার দুর্বলকে ধরে ঠেঙ্গানো। কিংবা এও বলতে পারি যে মানবশিশুর জন্মগত অধিকার উঙা-উঙা করে কাঁদা। জন্মগত অধিকারের দোহাই দেওয়াটা যুক্তি-বিচার নয়। গণতন্ত্রেরও ভালমন্দ আছে। গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করতে হলে আমাদের দেখা উচিত গণতন্ত্রের অধীনে মানবজীবনের উচ্চতম কল্যাণ বিশেষরূপে সাধিত হয় কি না। এ ছাড়া আর কোন মাপকাঠি প্রযুক্ত হতে পারে না।

অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে যে সুশাসন অপেক্ষাও স্বশাসন ভাল; অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসন যদি খারাপও হয় তবু তা অন্যান্য শাসন-প্রণালীর তুলনায় উৎকৃষ্টতর। কিন্তু এটা বিচারের কথা নয়, ভাবোচ্ছ্বাসের কথা। সুশাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গণতান্ত্রিক শাসনকে কখনো ভাল বলা যেতে পারে না;—সুশাসনের অনুকূল, পরিপোষক ও প্রতিষ্ঠাপক হিসাবেই শুধু উহাকে ভাল বলতে পারি। অন্যান্য

শাসনতন্ত্রের তুলনায় গণতন্ত্রের সপক্ষে একটি প্রধান যুক্তি এই যে ওতে বিকৃতির সম্ভাবনা কম। রাজতন্ত্রের বেলা প্রায়ই দেখা যায় যে অশোকের পুত্র অশোকের ন্যায়, কিংবা আকবরের পুত্র আকবরের ন্যায় গুণশালী হন না। অভিজাততন্ত্রেও এটা একটা মস্ত অসুবিধা। রাজা এবং অভিজাতবর্গ স্বভাবতঃ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও ভোগবিলাসের জন্য ব্যগ্র হতে পারেন। তখন তাদের খামখেয়ালী, মূর্খতা অথবা বিলাস-ব্যসনের বোঝা বহন করতে হয় সমস্ত প্রজাবর্গকে। কিন্তু গণতন্ত্রের অধীনে যেহেতু জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনযন্ত্র পরিচালিত করেন, অতএব সমগ্র দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ এবং উপেক্ষিত হবার সম্ভাবনা সেখানে নাই, কিংবা থাকলেও তা সুদূর-পরাহত।

গণতন্ত্রের আরেকটি প্রধান গুণ এই যে উহা জনসাধারণের মধ্যে আত্মসম্মান এবং আত্মনির্ভরতার ভাব জন্মায়। গণতন্ত্রের অধীনে প্রত্যেক ভোটদাতা ভাবে যে দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালনে সেও একজন অংশীদার, সুশাসন অথবা কুশাসনের জন্য সেও আংশিকভাবে দায়ী। এই দায়িত্ববোধের ফলে তার আত্মমর্যাদা বাড়ে, দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি তার একটা কর্তব্যজ্ঞান ও মমত্ববোধ জন্মে। এটা যেমন তার ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে ভাল তেমনি সামাজিক উন্নতি ও দশের কল্যাণের পক্ষেও ভাল। রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের অধীনে সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে সরকারী অত্যাচারের কোন প্রতি-বিধান তাদের হাতে নাই। এগুলিকে তারা ভূমিকম্প, জলপ্লাবন প্রভৃতি নৈসর্গিক উৎপাতের মতই নীরবে সহ্য করে। দেশশাসন

ব্যাপারে এই নিষ্ক্রিয় অদৃষ্টবাদ সমাজকে দুর্গতি ও অবনতির পথে ঠেলে দেয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

গণতন্ত্রের এ সকল অন্তর্নিহিত গুণ সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক শাসন অনেক স্থলেই সুশাসনে পরিণত হয় নি। এর প্রধান কারণ জনসাধারণের অজ্ঞতা। অজ্ঞতার দরুণ সাধারণ ভোটদাতারা নিজেদের প্রকৃত ইষ্টানিষ্ট, নিজেদের শত্রুমিত্র সব সময়ে ঠিক চিনতে পারে না। দেশে দেশেই ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর ও চালাক লোকের অভাব নাই। সাধারণ লোকের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রতারণার জাল বিস্তার করতে তারা কখনো কুণ্ঠিত হয় না।

প্রাচীনকালের তুলনায় বর্তমান যুগে লোকের শিক্ষাদীক্ষা অনেক বেড়েছে। চারদিকে সংবাদ ও মতামত ছড়িয়ে দিবার যে সকল ব্যবস্থা এখন প্রবর্তিত হয়েছে—অল্পকাল পূর্বেও তার কথা কেউ ভাবতেই পারে নি। অতএব মনে করা যেতে পারে যে ভোটারদের পক্ষে সমস্ত বিষয় জেনে বুঝে যোগ্য প্রতিনিধি বাছাই করা আজকালকার দিনে খুবই সহজ। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়; কারণ নির্বাচনী ব্যাপারটা সোজাপথে না চলে প্রায়শঃ চলে বাঁকা পথ ধরে।

সকল গণতান্ত্রিক দেশেই আছে বড় বড় রাজনৈতিক দল। দল বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি যারা কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একই অভিমত পোষণ করে। যেমন—'সাধুভাষার দল', 'সমাজ-সংস্কারকের দল', 'সনাতনী দল', 'অসবর্ণ বিবাহের দল', 'অবাধ বাণিজ্যের দল' ইত্যাদি। যে কোন দলের লোকদের ঐক্যবদ্ধতার কারণ এই যে ছোট খাট নানা বিষয়ে তাদের মতামত এবং আচরণের

পার্থক্য থাকলেও কোন একটা বড় বিষয়ে তারা সকলেই একমত। ইতিহাসে দেখা যায় যে এইরূপ কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতের এবং পথের সমতার ফলেই রাজনৈতিক দলসমূহের উদ্ভব চিরকাল ধরে হয়ে এসেছে।

বড় বড় রাষ্ট্রে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র চালু রাখবার পক্ষে রাজনৈতিক দলগঠনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করবার জো নাই। বিভিন্ন স্থান থেকে বহুসংখ্যক প্রতিনিধি যদি স্ব স্ব প্রধান হয়ে ব্যবস্থা পরিষদে আসেন তবে সেখানে তাদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া এবং একটা নির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করাই হয় কঠিন ব্যাপার। আবার কোন এক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সাময়িকভাবে বজায় না থেকে যদি নিত্য নূতন ভাঙ্গাগড়া চলতে থাকে তবে শাসনযন্ত্র হয়ে পড়ে বিকল এবং নিতান্ত দুর্বল। রাজনৈতিক দলগঠনের প্রয়োজন ও উপকারিতা এই যে এদ্বারা সংহতি বাড়ে এবং শাসনকার্যে কতকটা ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন দলের লোক পরস্পরের কার্যকলাপ তীব্রভাবে সমালোচনা করে। এর ফলে জনমত জাগ্রত থাকে এবং কোন দলগত দুষ্কার্য অথবা দুর্নীতি গোপন থাকতে পারে না।

সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় "পার্টিপ্রথার" শাসন যতই ভাল জিনিষ হউক না কেন, কার্যতঃ অনেক ক্ষেত্রেই এর বিকৃতি ঘটে। যে কোন রাজনৈতিক দল একবার ভাল করে গড়ে উঠবার পর আদর্শনিষ্ঠা বেশীদিন বজায় থাকে না, দলের লোকদের মধ্যে ঘটে ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতার অভাব। তখন যে কোন উপায়ে দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি রক্ষা করা হয় দলপতিদের একমাত্র লক্ষ্য। যে দল নির্বাচনে জয়ী হয়

তাদের হাতেই থাকে দেশের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব। সেই কর্তৃত্বের লোভে দলপতিরা নির্বাচনের সময়ে মিথ্যাপ্রচার, উৎকোচদান প্রভৃতি নানা হীন উপায় অবলম্বন করেন। সমগ্র দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন হয়ে উঠে কলুষিত এবং বিষাক্ত। এটা হল এক ধরণের বিপদ। আর এক ধরণের বিপদ হচ্ছে এই যে ক্ষমতালোভী ধুরন্ধর ব্যক্তিরা প্রত্যেকে একটা আলাদা দল গঠন করে সমগ্র দেশের রাজনৈতিক জীবনকে শুধু একটা নিকৃষ্ট দলাদলিতে পরিণত করতে পারেন। দেশের শাসনব্যবস্থা তখন হয়ে পড়ে অতিমাত্রায় বিশৃঙ্খল এবং দুর্নীতিপূর্ণ। অত্যুগ্র দলাদলির ফলে দেশের ঐক্য এবং স্বাধীনতা পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। ফ্রান্সের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় এরূপ উৎকট দলাদলির শোচনীয় পরিণাম। উল্টা রকমের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেখানে কোন একটা রাজনৈতিক দল প্রভূত ক্ষমতাশালী হবার পর বিরুদ্ধবাদী অপর সমস্ত দলকে গলা টিপে মেরে ফেলে,—যাতে তাদের নিজেদের অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলবার মত কোন সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান দেশে আর না থাকে।

পার্টিপ্রথায় যেখানে ঘুণ ধরেছে সেখানে প্রায়ই দেখা যায় যে দেশের যোগ্যতম ব্যক্তিরা নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন না, কিংবা হলেও কৃতকার্য হতে পারেন না। যারা গলাবাজি করতে পারে, দ্বিধাহীনভাবে মিথ্যাপ্রচার করতে পারে, নিজেদের ঢাক পিটাতে পারে,—যারা দলাদলিতে পটু এবং কূটচালে ধুরন্ধর তারাই রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রত্যেক দলের থাকে নিজস্ব তহবিল, সংবাদপত্র, প্রচারক প্রভৃতি। দিনের পর দিন নিজেদের দলের মাহাত্ম্যপ্রচার

এবং প্রতিপক্ষ দলের দোষকীর্তন হচ্ছে এদের প্রধান কাজ। নির্বাচনের সময়ে এই সকল অপপ্রচার চরমে পৌঁছে। এক জন সাধারণ ভোট-দাতাকে বিভ্রান্ত করবার জন্য যত রকম উপায় হতে পারে তার সব কিছুই অনুষ্ঠিত হয়। এগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে লাভ নাই, কারণ মুদ্রাযন্ত্রের, বক্তৃতার, প্রচারের ও সংঘপরিচালনের স্বাধীনতা সংকুচিত করতে গেলে ফল হয় হিতে বিপরীত। গণতন্ত্রকে বিশুদ্ধ রাখার একমাত্র উপায় জনসাধারণের মধ্যে সৎশিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তার। অজ্ঞতা দূরীভূত হলে লোক মিথ্যাপ্রচারে এবং নির্বাচনী মত্ততায় ভুলবে না। তখন তারা বুঝতে পারবে যে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপরিষৎ থাকলেই হয় না,—সেই পরিষদে বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান ব্যক্তিদিগকে প্রতিনিধিত্বে পাঠানোর উপরেই নির্ভর করে পরিষদের সার্থকতা এবং দেশের ও দশের যথার্থ কল্যাণ।

মনুর কথা উদ্ধৃত করে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

"একোঽপি বেদবিদ্ধর্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ।
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে।"

"এক জন মাত্র জ্ঞানী ব্যক্তি যে বিধিব্যবস্থা করেন তাই পরম ধর্ম, পরন্তু অযুত সংখ্যক অজ্ঞান ব্যক্তি যা করেন তাকে ধর্ম (অর্থাৎ নীতি) বলা যায় না। "যাদের চরিত্রবল ও বুদ্ধিমত্তা নাই, যারা কেবল জাতের (পদবীর) গুণে বড় মানুষ, এমন হাজার ব্যক্তি একত্র হলেও তাকে 'পরিষৎ' বলা যায় না।"

ধর্ম

আমাদের এই ধর্মপ্রাণ দেশে 'ধর্ম' জিনিষটা বড়ই প্রাণবন্ত ও ঝাঁঝাল। যে দেশে সকলেই 'ধর্ম' জানে, বুঝে ও পালন করছে বলে মনে করে, সেখানে এই বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া শুধু ধৃষ্টতা নয়;—নানা কারণে বিপজ্জনক হয়েও দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তবু এখানে কিছু বলা আবশ্যক; কারণ যে বিষয় আমরা সব চেয়ে বেশী জানি বলে মনে করি সে বিষয়েই অনেক সময়ে আমাদের ধারণা সব চেয়ে অস্পষ্ট ও এলোমেলো। আর এই বইয়ের উদ্দেশ্যই হচ্ছে পাঠকের মন ও বুদ্ধিকে সজাগ করে দেওয়া—যাতে তিনি নিষ্ক্রিয়-ভাবে সব কিছু মেনে না নিয়ে—সক্রিয়ভাবে প্রত্যেক বিষয় ভাবতে ও বুঝতে চেষ্টা করেন।

'ধর্ম' বলতে আমরা সাধরণতঃ বুঝি হিঁদুয়ানী, মুসলমানী, কিংবা খৃষ্টানী। তা ছাড়া আছে বৌদ্ধধর্ম, লাওৎসি ও কংফুচের ধর্ম, পার্শীদের ধর্ম, ইহুদী ধর্ম ইত্যাদি। ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মের চেয়ে এগুলি অল্পাধিক প্রাচীন। কিন্তু এগুলিরও আগে বিভিন্ন ধর্ম অজ্ঞাত ছিল না। মিশর, বাবিলন, কালদিয়া, উর প্রভৃতি প্রাচীন সমাজে,—ভারতবর্ষের প্রাক্-আর্য ও প্রাক্-বৈদিক যুগের 'সিন্ধু' সভ্যতাতে—বিভিন্ন ধরণের ধর্ম প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ যখন থেকে পৃথিবীতে মানব ও মানবসমাজের উৎপত্তি হয়েছে তখন থেকেই কোন না কোন রকমের 'ধর্ম' প্রচলিত রয়েছে। প্রাচীনতম মানবের

যেটুকু পরিচয় আমরা জানতে পেরেছি—এবং বর্তমান জগতে যে সকল মানবগোষ্ঠী আদিম অবস্থায় রয়েছে, তাদের আচার ব্যবহার আমরা যতটুকু লক্ষ্য করতে পেরেছি—তাতে নিঃসন্দেহ বুঝা যায় যে 'ধর্ম' গোড়া থেকেই মানুষের ঘাড়ে চেপে বসেছিল।

ধর্ম কি এবং ধর্মের উৎপত্তি কোথায় এবিষয়ে একটু তলিয়ে দেখা যাক। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানে (Anthropology) মানুষ ও তার আচারব্যবহার, সমাজের উৎপত্তি বিকাশ প্রভৃতির বিশদ আলোচনা হয়ে থাকে। এই বিদ্যা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হলেও এর খুব দ্রুত উন্নতি হয়েছে এবং অনেক তথ্য উহা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছে। নৃতত্ত্ব আমাদিগকে একথা স্পষ্টভাবেই বলে যে বিস্ময় ও ভয় থেকেই আদিম মানবের মনে 'ধর্মের' উৎপত্তি হয়েছিল। আদিম যুগের ধর্মের প্রায় ষোল আনাই ছিল ভূতপ্রেত, দৈত্যদানা, দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ বিশ্বাস, এবং নানাবিধ যাদুমন্ত্র, তুকতাক প্রভৃতি। মরলে পর কি হয়,— তাই নিয়ে প্রথমে জাগল বিস্ময়, তার পরে ভয়। মানুষ নিদ্রা যায়, কিংবা মূর্ছা যায়; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার জেগে উঠে। তা থেকে আদিম মানব মনে করলে যে ঘুমন্ত অথবা মূর্ছিত ব্যক্তির শরীর থেকে একটা কিছু বেরিয়ে যায়, সেটা আবার ফিরে এলেই নিদ্রা কিংবা মূর্ছার অবসান ঘটে। নিদ্রা এবং মূছার মতই মৃত্যুও একটা অসাড় অবস্থা। তাই কোন মৃত ব্যক্তিকে দেখে আদিম মানবের প্রথম ধারণা হল লোকটা ঘুমিয়েছে, কিছুক্ষণ পরে আবার জেগে উঠবে। যখন শরীর পচতে আরম্ভ হলো তখনো সেই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভাঙলো

না। অতএব মৃত ব্যক্তিকে মাটির নীচে (কবরে) শুইয়ে রাখা হলো। কিন্তু ওখানে খাবে কি? তাই মৃতের পাশে খানিকটা খাবার এবং পানীয় রেখে দেওয়া হল। যারা সর্দারগোছের লোক, তারা সঙ্গীসাথী ও অনুচর ছাড়া ওখানে থাকবেন কি করে? অতএব দু'চার জন কিংবা দু'চার গণ্ডা দাস-দাসী, পত্নী প্রভৃতিকে হত্যা করে তখনি মৃত সর্দারের নিকট পাঠিয়ে দিবার ব্যবস্থা হল।

মাটির ভিতর থেকে সুন্দর সুন্দর গাছপালা গজায়। সুতরাং আদিম মানব মনে করল যে মাটির ভিতরে এমন সব দেবতারা আছেন যারা সেখানে গাছপালাকে জন্ম দিয়ে উপরে ঠেলে দেন। রাত্রির অন্ধকারে ভয়ে যখন গা ছম ছম করত তখন আদিম মানবের নিকট সারা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ কত যে দুষ্ট দানবে ভরপূর হয়ে উঠত তার ইয়ত্তা নাই। এ সকল নানাবিধ শিষ্ট ও দুষ্ট, মানবের হিতকারী ও অহিতকারী, দেবতা-অপদেবতার ধারণার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তাদিগকে তুষ্ট করবার নানা অনুষ্ঠান ও তন্ত্রমন্ত্র। সেগুলি থেকে উদ্ভব হল বিবিধ পারিবারিক ও সামাজিক প্রথার। আর যারা ছিলেন ঐ সকল তন্ত্রমন্ত্র প্রভৃতিতে ওস্তাদ, তারা হলেন একটি বিশেষ গণ্যমান্য শ্রেণী।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 'ধর্ম' ব্যাপারটির ভিতরে অনেক জিনিষ গোড়া থেকেই জট পাকিয়ে রয়েছে। জগৎ-রহস্য ও পরপারের রহস্য—এই দুয়ের ক্ষীণ উপলব্ধি থেকে মানুষের মনে ধর্মবিষয়ক ধারণার সূত্রপাত হয়েছিল; কিন্তু কার্যতঃ নানারকম আচার অনুষ্ঠান ও সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে ধর্ম এমনভাবে

এখন পর্যন্ত আমাদের মনে জড়িয়ে আছে যে আমরা এগুলিকে ছেড়ে সাধারণতঃ ধর্মের কথা ভাবতেই পারি না। আদিম মানবের ঘোলাটে ধারণা থেকে আমরা আজও যথেষ্ট পরিমাণে মুক্ত হতে পারি নি। এটা একটা গোড়ায় গলদ।

ধর্মের ভিতরে আমরা সাধারণতঃ এই কটি জিনিষ ধরে নিই—

(১) আচার অনুষ্ঠান।

(২) কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ, পৌরাণিক কাহিনী ও তাতে বিশ্বাস।

(৩) কতকগুলি ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতি।

(৪) অন্তঃপ্রকৃতির জয় ও আধ্যাত্মিক জীবন।

এক একটি ধরে সংক্ষেপে এগুলির বিচার করা যাক।

(১) সাধারণ লোক কোন দুরূহ তত্ত্বের ধার ধারে না। তারা গতানুগতিকভাবে আচার অনুষ্ঠান মেনে চলে এবং তাতেই ধর্ম পালন করা হচ্ছে বলে মনে করে। প্রত্যেক ধর্মেই আচার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা কোন এক কিংবা একাধিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। প্রত্যেক 'গোঁড়া' এবং 'সনাতনী' ব্যক্তিই মনে করেন যে তিনি তাঁর ধর্মের 'প্রাচীন' ও 'প্রকৃত' আচার অনুষ্ঠানগুলিই হুবহু পালন করে যাচ্ছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই জানা যায় যে আচার-অনুষ্ঠানমূলক যে ধর্ম তা প্রত্যেক সমাজে ক্রমাগতই বদলেছে এবং বদলাচ্ছে। আর শুধু কালভেদে নয়,—দেশভেদেও বদলাচ্ছে। এও দেখা যায় যে, যে শাস্ত্র কিংবা বইকে নিয়ে আসলে ধর্মের উৎপত্তি—তার সঙ্গে প্রচলিত ধর্মের দু'চারশ মাইল তফাৎ। অথচ

সেই আচার অনুষ্ঠানকে শাশ্বত, সনাতন ধর্ম মনে করে আমরা জোর গলায় চেঁচাই এবং মাঝে মাঝে ঝগড়া-বিবাদেরও সৃষ্টি করি। ধরা যাক হিন্দুদের কথা। হিন্দুরা বেদকে তাঁদের ধর্মের মূল বলে মনে করেন। কিন্তু 'বেদ' পড়া দূরের কথা, বড় কেউ চোখেও দেখেন নি। স্মৃতিগ্রন্থ অনেক আছে এবং পরস্পর-বিরোধীও বটে। কিন্তু সেগুলিও—সাধারণ গৃহস্থ দূরের কথা—পুরোহিতেরাও বড় বেশী ঘাঁটান না। পঞ্জিকার পরিশিষ্টে যেটুকু বিধিব্যবস্থা, মন্ত্রতন্ত্র, ব্রতকথা ও ফর্দমালা লিখা থাকে সেটুকু জানলেই সুবিজ্ঞ। মোট কথা এই যে—যে সকল আচার-অনুষ্ঠান আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি—সেগুলিই আমরা গতানুগতিক ভাবে পালন করে চলি এবং তা'তেই তুষ্ট থাকি। গণ্ডগোল সৃষ্টি হয় তখনি, যখন আমরা এসকল ব্যাপারকে ধর্মের সম্পূর্ণ ও শাশ্বত রূপ বলে ভাবি, এবং মনে করি যে এগুলির তিলমাত্র ব্যতিক্রম না হওয়ার উপরেই নির্ভর করে আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ। একটু খোঁজ নিলে, একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে যে এক স্থান কিংবা সম্প্রদায়ের হিন্দুরা যেটা অনাচার বলে মনে করে, অপর স্থান কিংবা সম্প্রদায়ের হিন্দুরা সেটাকেই সদাচার বলে ভাবে। বাঙ্গালী হিন্দুরা ভাবেন মামাতো বোন বিয়ে করাটা অত্যন্ত বিসদৃশ ব্যাপার, এবং দিনের বেলায় বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়া বিধিবিরুদ্ধ। আর যারা গোঁড়া মাদ্রাজী হিন্দু তারা এ দুটিকেই মনে করেন খুব প্রশস্ত। এ রকম দৃষ্টান্ত আরো কত শত দেওয়া যেতে পারে।

বৌদ্ধধর্মের যে সকল আচার অনুষ্ঠান এখনকার নিষ্ঠাবান তিব্বতী বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত, তা দেখলে বুদ্ধদেব হয়ত ছুটে পালাবেন। খৃষ্টানদের বেলায়ও তাই। যিশুর উপদেশের সঙ্গে প্রচলিত খৃষ্টানী এবং ইউরোপীয় জাতিসমূহের কার্যকলাপের যথেষ্ট গরমিল আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। খৃষ্টধর্ম ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রে "সরকারী" ধর্ম; নানা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে এই "সরকারী" খৃষ্টানী জন্ম নিয়েছিল। বাইবেলে লিপিবদ্ধ যিশুর উপদেশ থেকে উহা অনেকাংশে ভিন্ন। কিন্তু সাধারণ লোক প্রচলিত আচার অনুষ্ঠানকেই গতানুগতিকভাবে মেনে চলে এবং মনে করে যে উহাই যথার্থ খৃষ্টধর্ম। ইসলামের বেলায়ও একই ব্যাপার ঘটেছে। ইসলামের প্রথম জন্ম হল আরবে। কালক্রমে যখন উহা নানা দেশের লোক ও নানা সভ্যতার সংস্পর্শে এল তখন তার প্রাচীন রূপ আর বজায় রইল না। আচার অনুষ্ঠানে অনেক পরিবর্তন ঘটল, নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। মোট কথা এই যে যার যার দেশে, সমাজে ও সম্প্রদায়ে প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান পালন করে সকলেই দিন কাটাচ্ছে এবং ভাবছে যে নিজের ধর্ম যথার্থভাবে পালন করা হচ্ছে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সকল ধর্মেরই বাহ্য আচার অনুষ্ঠান দেশভেদে ও কালভেদে পরিবর্তনশীল। এগুলিকে নিয়ে মারামারি, কাটাকাটির কোন সার্থকতা নাই। মানুষের আদিম অবস্থার অনেক স্মৃতি,—এবং মানুষ হবার আগে আমরা যে সকল ইতর প্রাণীর ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে এসেছি তারও কতক স্মৃতি ও

অভ্যাস—আমাদের মজ্জাগত হয়ে আছে এবং আমাদের প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত থেকে সর্বদাই কাজ করছে। খুঁজলে পর এগুলির মধ্যেই পাওয়া যাবে অনেক বিষয়ে আমাদের সংস্কার ও প্রবৃত্তির মূল। কিন্তু বহির্জগতের অবস্থা-পরিবর্তনের এবং আমাদের বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংস্কার এবং ধারণাই বদলাতে বাধ্য। এই কারণে লোকের অভ্যাস এবং আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তন সবদাই ঘটে। কখনো জড়তা, কুদৃষ্টান্ত, কুশাসন ইত্যাদির ফলে পরিবর্তন হয় মন্দের দিকে। আবার কখনো বা মহাপুরুষের আবির্ভাব, জ্ঞানের প্রসার ইত্যাদির ফলে পরিবর্তন হয় ভালর দিকে। ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে পরিবর্তন মাত্রকেই অবাঞ্ছনীয় মনে করে 'সনাতনী' সাজবার কোন সার্থকতা কিংবা বাহাদুরী নাই। দেশভেদে ও কালভেদে আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তন অনিবার্য। উন্নতির জন্য পরিবর্তন আবশ্যকও বটে। হিতকর পরিবর্তনকে হাসিমুখে বরণ করা উচিত। বৈদিক যুগের পোষাক এখন আমরা পরি না। এর জন্য যেমন আমরা লজ্জাবোধ করি না,—বৈদিক যুগের ধর্মানুষ্ঠানগুলিকে বর্জন কিংবা পরিবর্তন করবার দরুনও তেমনি আমাদের লজ্জিত কিংবা দুঃখিত হবার কোন কারণ নাই।

(২) প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে আচার অনুষ্ঠান ছাড়াও কতকগুলি মতবাদ অথবা তত্ত্ব আছে,—যেমন সৃষ্টিতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে একটা মোটামুটি ঐক্য অনেক বিষয়ে দেখা যায়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্মেই স্বর্গ-নরকের কথা আছে; মানুষ পাপের ফলে নরকে যায়, পুণ্যের

ফলে স্বর্গে যায়। স্বর্গ এবং নরকের বর্ণনাও প্রায় একই রকম। স্বর্গ হল ঊর্ধ্বে, আর নরক হল পায়ের নীচে পাতালে। হিন্দুপুরাণ, বৌদ্ধপুরাণ, গ্রীকপুরাণ—সবগুলিতেই সপ্তলোকের কথা আছে। খৃষ্টান ও মুসলমান শাস্ত্রে আছে কিয়ামৎ অথবা শেষ-বিচারের কথা। হিন্দুধর্মে আছে জন্মান্তরবাদ এবং পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা; অতএব উহার মতে "শেষ" বিচার নাই। কিন্তু তা না হলেও আছে যমের বিচার। যম হলেন ধর্মরাজ; তিনি মৃত ব্যক্তির পাপপুণ্য তুলাদণ্ডে বিচার করে স্বর্গ-নরক ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। যিশু ও হজরত মহম্মদ যেমন নিজের মতানুবর্তী ঘোর পাপীকেও শেষ বিচারের দিন বাঁচাতে পারেন, তেমনি হিন্দু মতে শিবদূত বিষ্ণুদূতেরা বিশেষ ভক্তদিগকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে সোজাসুজি শিবপুরী, বিষ্ণুপুরী প্রভৃতিতে নিয়ে যেতে পারেন।

সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়ে গোঁড়া খৃষ্টান পাদ্রীরা মনে করেন যে তারা সৃষ্টির সন তারিখ এবং আদি মানবযুগলের জন্মকাল ও জন্মস্থান ঠিক ঠিক ভাবে বলে দিতে পারেন। হিন্দুদেরও পঞ্জিকায় লেখা আছে কলি-যুগের উৎপত্তি হয়েছিল ৫০৭২ বছর পূর্বে মাঘীপূর্ণিমায়, শুক্রবারে। আধুনিক গণিতশাস্ত্র ও বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়বার পর কারো পক্ষে এসকল মতবাদে আক্ষরিকভাবে আস্থা স্থাপন করা, কিংবা নানাবিধ অদ্ভুত পৌরাণিক কাহিনী বিশ্বাস করা অসম্ভব। প্রাচীনের প্রতি টান ও ভালবাসা স্বাভাবিক। এজন্য হয় ত আমরা এগুলিকে সরাসরি আক্রমণ করি না। পৌরাণিক মতবাদ এবং কাহিনীগুলিকে রূপকভাবে ধরে নিই, এবং তাদের ভিতর থেকে ভাবরস ও আধ্যাত্মিকতা সঞ্চয়

করি ;—কিংবা হয় ত এই ভেবে শ্রদ্ধা করি যে সাধারণ লোকের নৈতিক জীবন গঠন করবার পক্ষে ওগুলি চিরকাল ধরে সাহায্য করে আসছে।

(৩) প্রত্যেক ধর্মই মানুষকে নৈতিক জীবন শিক্ষা দেয়। সত্য-কথন, সত্যপালন, দয়া, পরোপকার,সংযম, ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রভৃতি শিক্ষা সকল ধর্মেই আছে। মোটামুটিভাবে এগুলিকে বলা যেতে পারে শাশ্বত ও সার্বজনীন নীতি। দেশকাল নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই নীতি পালনীয়। সূক্ষ্মবিচারে এরও ব্যতিক্রম কল্পনা করা যেতে পারে, যেমন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট চিকিৎসকের ও শুশ্রূষাকারিণীর কখনো কখনো মিথ্যাভাষণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই সকল ব্যতিক্রম এতই নগণ্য যে এগুলি নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কোনই প্রয়োজন নাই।

শাশ্বত ও সার্বজনীন নীতি ছাড়াও এমন অনেক সামাজিক নীতি আছে যার উপযোগিতা দেশকালপাত্রে সীমাবদ্ধ। এই সকল নীতির সম্পর্কে দুটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। প্রথমতঃ মানুষের নীতিবোধ এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। শাস্ত্রের কঠোর অনুশাসন সত্ত্বেও নীতিবোধের পরিবর্তন চিরকাল ধরে হয়ে আসছে। দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। হিন্দুদের কোন কোন স্মৃতিতে সতীদাহের বিধান অছে এবং উহার প্রচলনও যথেষ্ট হয়েছিল। শ' দেড়শ বছর আগেও সতীদাহ প্রচলিত ছিল, এবং সাধারণ লোক দূরের কথা, অনেক সুপণ্ডিত এবং হৃদয়বান ব্যক্তিও উহা খুব ধর্মসঙ্গত ও নীতি-সঙ্গত বলে মনে করতেন। কিন্তু আজকাল উহা আমাদের নিকট একটা

বীভৎস কাণ্ড বলে মনে হয়। সতীদাহ পুনরায় বিধিবদ্ধ করবার প্রস্তাব এখন উত্থাপিত হলে অতি বড় সনাতনীরাও এর সপক্ষে ভোট দিবেন বলে মনে হয় না। মুসলমানী বিধানে চোরের শাস্তি হাত কেটে দেওয়া,—অসতী নারীর শাস্তি তাকে ঢিল মেরে মেরে ইহলোক থেকে বিতাড়ন করা। আজ যদি গভর্নমেন্ট এসকল শাস্তি ফৌজদারী আইনের সামিল করতে চান তবে গোঁড়া মুসলমানেরাও সম্ভবতঃ ঘোরতর আপত্তি করবেন। আসল কথা এই যে জ্ঞানবৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় ও হৃদয়বৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নীতিবোধ ক্রমশঃই পরিবর্তিত হচ্ছে। কোন গৎ-বাঁধা সমাজিক নীতিকে চিরন্তনও চিরমান্য বলে মনে করবার যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই।

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় কথা এই যে মুখে আমরা নিজেকে খাঁটি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ অথবা খৃষ্টান বলে যতই জাহির করি না কেন—নিজ নিজ ধর্মের উপদিষ্ট অনেক সহজ ও সুস্পষ্ট নীতিও আমরা কার্যতঃ পালন করি না। ব্রাহ্মণ যদি মদ্যপান করে তবে হিন্দুর স্মৃতি-শাস্ত্রে তার প্রায়শ্চিত্ত গলিত-সীসক-পান। তথাপি কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যেও মদ্যপান অপ্রচলিত নয়। মিথ্যাভাষণ, পরদার-গমন প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই মহাপাপ। কিন্তু মোকদ্দমায় মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়ে,অগম্যাগমন করে—হিন্দু-মুসলমান কেহই সমাজে পতিত হয় না—এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে নিন্দনীয় পর্যন্ত হয় না। মদ-চোলাইয়ের অনেক বড় বড় কার-খানার মালিক মুসলমান। সাহেবদের জন্যে মদ কিনে আনা ও পরিবেশন করার কাজে হাজার হাজার মুসলমান বাবুর্চি নিযুক্ত আছে। তারা কেউ মুসলমান সমাজে পতিত বলে গণ্য হয় না—যদিও হজরত

মহম্মদ শুধু মদ্যপায়ীকে নয়,—মদ্য-প্রস্তুতকারী,মদ্য-বিক্রেতা, মদ্য-আনয়নকারী, মদ্য-পরিবেশনকারী প্রভৃতি সকলকেই নিন্দনীয় ও অভিশপ্ত করে গিয়েছেন। বৌদ্ধ ও খৃষ্টান-ধর্মের মূলনীতি অহিংসা। সেই নীতি বৌদ্ধ ও খৃষ্টান রাষ্ট্রশক্তিদের দ্বারা যেভাবে প্রতিপালিত হয়ে আসছে তা দেখে সমগ্র জগৎবাসী স্তম্ভিত। আমাদের চারদিকে, এবং প্রতিদিনকার জীবনে একটু তাকালেই এরূপ ধর্ম না-মানার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যাবে।

(৪) এতক্ষণ যা বলা হল তা ধর্মের বহিরঙ্গের কথা ;—খোসার কথা, সারের কথা নয়। আচার-অনুষ্ঠান ও কতকগুলি বাঁধা-ধরা মতবাদ—এগুলি ধর্মের গৌণ অংশ। মুখ্যতঃ ধর্ম কি ? বুদ্ধির দিক দিয়ে দেখতে গেলে বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলে যে তত্ত্ব আছে তা জানতে পারা কিংবা জানবার চেষ্টা করাই মানুষের ধর্ম। এই বিরাট বিশ্বের পশ্চাতে কেহ একজন আছেন,—কোন একটা সত্য আছে—যাতে সমস্ত খণ্ড খণ্ড বস্তু "সূত্রে মণিগণা ইব" বিধৃত হয়ে আছে। সেই সত্যকে খুঁজে বা'র করা, তার মুখোমুখী হওয়া,—তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নির্ণয় করা,—এটাই আমার ধর্ম ; কারণ এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রত্যেকের মনেই আছে। জলের ধর্ম যেমন নীচু দিকে যাওয়া, নদীর ধর্ম যেমন সাগরের দিকে ধাবিত হওয়া—মানুষের ধর্ম তেমনি জগৎ-রহস্যের মূলে ছুটে যাওয়া। এ ছাড়া পরা তৃপ্তি হয় না, হতে পারে না। বিজ্ঞান তার বিশেষ যাত্রাপথে এই আকুল সন্ধানে বর্তিকা হস্তে অগ্রসর হয়েছে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধ কোথায় ? বিরোধ শুধু তখনি দেখা যায় যখন ধর্মগুরুরা কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদকে চিরন্তন

সত্য ও ধর্মের পরিপূর্ণ রূপ বলে চালিয়ে দিতে চান এবং এগুলির সম্পর্কে কোন প্রকার স্বাধীন চিন্তা বরদাস্ত করতে পারেন না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এরূপ গুরুগিরিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

বিজ্ঞানের আরেকটি দিক এই যে বিজ্ঞান প্রকৃতিকে শুধু জানতে চায় না, বশ করতেও চায়। আধুনিক ইউরোপ বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করেই অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির শুধু অর্ধেক অংশ বহির্জগতে; বাকী অর্ধেক মানুষের ভিতরেই রয়েছে। ত্রুটি এই জায়গায় যে ইউরোপ বহিঃপ্রকৃতিকে নিয়ে মত্ত হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতির উভয় অংশকে জয় করতে না পারলে শান্তি ও কল্যাণ নাই। সত্যিকার ধর্ম অন্তঃপ্রকৃতির জয়ের উপর খুবই জোর দেয়।

জীবনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ধর্ম শান্তির আধার। জীবনে প্রভূত বিরোধ, দুঃখদ্রারিদ্র্য, রোগ-শোক, ও নিরানন্দ আমরা দেখতে পাই। মনের ভিতরের হিংসাদ্বেষ ও নানা উগ্র বাসনা আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, এবং পরিণামে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করে। কিন্তু আমরা প্রাণে প্রাণে চাই শান্তি ও আনন্দ। আমরা মিথ্যা প্রলোভনকে এড়িয়ে সত্য আশ্রয় খুঁজি, আমরা অমঙ্গলকে এড়িয়ে পেতে চাই মঙ্গল, আমরা বিশৃঙ্খলা ও কোলাহল দূরে ফেলে চাই একটু ঘরগুছানো সৌন্দর্য ও অনাবিল আনন্দ। জীবনে এগুলি পেতে হলে কিরূপ সংযম ও সাধনা চাই—তাই দেখিয়ে গেছেন যত ধর্মগুরু মহাপুরুষ। সহজ, সরল উপদেশের দ্বারা—নিজেদের আচরণের দ্বারা—নানা যুগে নানা

দেশে তাঁরা এই শিক্ষা হাতে-কলমে দিয়ে গিয়েছেন। সকল ধর্ম ও সকল মহাপুরুষের বাণীতেই এ বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রত্যেক ধর্মের উপাসনা-প্রণালী ও আচার-অনুষ্ঠান সেই পরিমাণে সার্থক—যে পরিমাণে উহা আমাদিগকে আধ্যাত্মিক ও শান্তিপূর্ণ জীবনের দিকে নিয়ে যায়। তা না হলে সেগুলি হয় শুচিবাই ও বন্ধন। সকলের পক্ষে একই উপদেশ এবং একই অনুষ্ঠান উপযোগী না হতে পারে এবং না হওয়াই স্বাভাবিক। এজন্য জনৈক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলেছেন যে একজন অজ্ঞ ও একজন সুপণ্ডিত লোকের "ধর্ম" বস্তুতঃ এক হতে পারে না, যদিও বাহ্যতঃ তারা উভয়ে এক ধর্মাবলম্বী (যেমন খৃষ্টান) হতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের যে কলহ তা নিতান্ত অর্থহীন। আধ্যাত্মিক জীবনের ব্যাপার নিয়ে কখনো বিবাদ-বিসম্বাদ হয় না, ঝগড়া বাঁধে অসার মতবাদ কিংবা বাহ্য আচার অনুষ্ঠান নিয়ে। অথচ আচার অনুষ্ঠান, মতবাদ, সামাজিক নীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মে যেভাবে উপদিষ্ট হয়েছে—মানবজীবনে এবং সত্যদৃষ্টিতে তার কোন শাশ্বত এবং সর্বমান্য রূপ নাই। এগুলির উপযোগিতা ও সার্থকতা দেশ, কাল এবং পাত্রে সীমাবদ্ধ। আচার অনুষ্ঠান ও মতবাদের রদ-বদল, সংস্কার-সংশোধন চিরকাল ধরে হয়ে এসেছে। ধর্ম-প্রবর্তক ও মহাপুরুষদের জীবনে দেখা যায় তাঁরা এ কাজ প্রচুর ভাবেই করে গিয়েছেন।

মায়াপুরী

বিরাট বিশ্বের প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম। তারপর ক্রমে ক্রমে আমাদের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের দোষত্রুটি প্রভৃতি ছোটখাট বিষয়ের আলোচনায় এসে পৌঁছেছি। এবারে আবার ভূমার অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের দিকে ফিরে যাওয়া যাক।

আমরা প্রতিনিয়ত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে বিজ্ঞানচর্চার ফলে মানুষ প্রভূত শক্তি অর্জন করেছে এবং সেই শক্তিকে অসংখ্য রকমে কাজে খাটাচ্ছে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের এই সাফল্যের দ্বারাই আমরা সম্পূর্ণ তুষ্ট হতে পারি না। জগতের স্বরূপ সম্পর্কে বিজ্ঞান কতটুকু নির্ণয় করতে পেরেছে তা জানবার আগ্রহ আমাদের মনে স্বভাবতঃই জন্মে। এ বিষয়ে একটুখানি আভাস আমরা এখন দিতে চেষ্টা করব। বিষয় অত্যন্ত জটিল, সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করে সাধারণ পাঠকের নিকট সকল কথা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। অতএব যুক্তিপ্রমাণ বাদ দিয়ে শুধু সিদ্ধান্তগুলি উপস্থাপিত করা হবে। মোটামুটিভাবে এগুলি জানলেও আমাদের মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়।

গত পঞ্চাশ বছরে জড়বিজ্ঞানে যে সকল আশ্চর্য আবিষ্কার হয়েছে তার ফলে পূর্ববর্তী কালের অনেক ধারণার ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে ভৌতিক জগৎ সম্পর্কে

বৈজ্ঞানিকদের ধারণা এই কয়টি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যথা—দেশ, কাল, নিমিত্ত, জড়ের অবিনাশিত্ব, এবং শক্তির অবিনাশিত্ব। দেশ বলতে আমরা বুঝি অনন্ত বিস্তার। যে লক্ষ লক্ষ ছায়াপথের অস্তিত্ব আমরা দূরবীণের সাহায্যে জানতে পারি তাদের বাইরেও যে দেশ আছে এই জ্ঞান আমাদের স্বতঃসিদ্ধ। দেশের কোথাও শেষ আছে একথা আমরা ভাবতেই পারি না। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ নিয়ে দেশ দশ দিক জুড়ে রয়েছে। দেশ অনন্ত এবং সর্বব্যাপী।

কাল সম্পর্কেও আমাদের ধারণা, কালের কোথাও শেষ নাই। অতীতে যত দূর পানে তাকাই কাল নিশ্চয়ই ছিল; ভবিষ্যতেও যতদূর পানে তাকাই কাল নিশ্চয়ই থাকবে, কালের স্রোত কখনও বন্ধ ছিল না এবং বন্ধ হতে পারে না। যদি আমরা এরূপ কল্পনা করি যে বড় বড় নক্ষত্র, নীহারিকা, ছায়াপথ প্রভৃতি চিরকাল ধরে ছিল না, তা হলেও একথা আমরা মনে মনে ধরে নিই যে এগুলি সৃষ্টি হবার আগেও দেশ এবং কালস্রোত ঠিক এখনকার মতই ছিল। আবার, এগুলি যদি মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হয়ে যায় তবুও দেশ এবং কালস্রোত ঠিক এখনকার মতই থাকবে।

নিমিত্ত বলতে আমরা এই কথা বুঝি যে, কারণ ছাড়া কার্য হয় না এবং একই রকম কারণ থেকে সব সময়ে একই রকম কার্যের উৎপত্তি হয়, কোথাও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। কারণ ছাড়া কার্য নাই, এবং যেখানে কার্য সেখানেই তার পূর্ববর্তী কোন কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে। এর ব্যতিক্রম কখনো হয় না বলেই ভৌতিক জগতে

শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভবপর হয়েছে। কারণ এবং কার্য এক অবিচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বাঁধা। কারণ পূর্বগামী, কার্য তার অনুসরণকারী। কারণ দেখলেই আমরা বুঝতে পারি তার অবশ্যম্ভাবী ফল ঘটবেই। আবার যে কোন কার্য দেখলেই ধরে নিতে পারি যে সেই কার্যের কারণ নিশ্চয়ই পূর্বে ঘটে গিয়েছে।

জড়পদার্থের অবিনাশিত্ব বলতে এই কথা বুঝা যায় যে জড়ের রূপান্তর হয়, কিন্তু ধ্বংস হয় না। জড়পদার্থ মাত্রই সূক্ষ্ম পরমাণুর সমষ্টি। পরমাণু এত সূক্ষ্ম জিনিষ যে তাকে আর ভাগ করা চলে না। বিরানব্বই রকমের পরমাণু আছে। এগুলি যেন বিরানব্বই রকমের ইট। এগুলি দিয়েই জড়ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিশাল সৌধ নির্মিত হয়েছে। জড়পদার্থের ভর,—অর্থাৎ যার জন্যে জড়পদার্থ ভারী হয়,—তা এই পরমাণুর মধ্যেই নিহিত আছে। এক টুকরা কাঠ পুড়ালে আমরা মনে করি যে ছাইটুকু ব্যতীত কাঠের আর সমস্ত উপাদান বুঝি ধ্বংস হয়ে গেল। বৈজ্ঞানিক বলেন তা নয়। কাঠ পুড়াবার সময়ে তার অনেক উপাদান বাষ্প এবং বায়বীয় আকারে বাতাসে বিলীন হয়ে যায়, ধ্বংস হয় না। সেগুলি যদি আমরা যত্ন করে ধরে রাখি এবং তাদের ওজনের সঙ্গে সবটুকু ছাইয়ের ওজন যোগ করি তা হলে দেখতে পাব যে (দহনক্রিয়ার সময়ে বায়ুমণ্ডল থেকে আহরণ-করা অক্সিজেনের ওজন বাদ দিয়ে) এগুলির মোট ওজন, এবং জ্বালাবার আগে কাঠের যে ওজন ছিল, এই দুই ওজন ঠিক সমান। অর্থাৎ কাঠ পুড়ে তার কতক অংশ ছাই হয়েছে, কতক অংশ জলীয় বাষ্প হয়েছে, এবং অপর কতক অংশ অন্যান্য গ্যাসে রূপান্তরিত হয়েছে; কিন্তু একটি কণাও বস্তুতঃ

নষ্ট হয় নি এবং মোট ভরও কমে নি। আর জড় পদার্থ যদি অবিনাশী হয় তবে এটাও মেনে নিতে হবে যে জড়পদার্থ চিরকাল ধরেই আছে কোন বিশেষ মুহূর্তে তার সৃষ্টি হয় নি।

'শক্তি'র অনেক প্রকারভেদ আছে। বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব, আলোক, উত্তাপ, শব্দ—এগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তি। ঘড়িতে যখন চাবি দিই, তখন তার স্প্রিং এর মধ্যে শক্তি জমা হয়—সেই শক্তির জোরেই ঘড়ির কাঁটা ঘুরে। শক্তির ক্রিয়াতেই গাড়ীর চাকা ঘুরে, পাম্পে জল উঠে। আরেক রকম শক্তি আছে, রাসায়নিক শক্তি। কয়লার মধ্যে রাসায়নিক শক্তি যেন সুপ্ত অবস্থায় আছে। যেমনি কয়লা জ্বলতে আরম্ভ করে, অমনি সেই শক্তি ছাড়া পেয়ে উত্তাপ ও আলো বিকিরণ করতে থাকে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন রকম শক্তি মূলতঃ একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। যে কোন প্রকার শক্তিকে অন্য সব রকম শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এবং তার ফলে শক্তির মোট পরিমাণের কিছুমাত্র হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। শক্তির রূপান্তরের নানারকম দৃষ্টান্ত আমরা অহরহ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। সাইকেলের পাম্পের ভিতর দিয়ে যখন হাওয়া চালাই তখন পাম্পের ধাতব অংশগুলি গরম হয়ে উঠে। অর্থাৎ আমার হাতের পেশী যে কাজ করে সেই যান্ত্রিকশক্তিই কিয়ৎ পরিমাণে উত্তাপে রূপান্তরিত হয়। তড়িৎশক্তি দিয়ে আমরা বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাই, পাখা ঘুরাই, ট্রামগাড়ী চালাই, কিংবা শীতের দিনে ঘরের ভিতর গরম করি। তড়িৎশক্তির আলোকশক্তিতে, উত্তাপশক্তিতে এবং যান্ত্রিক-শক্তিতে রূপান্তরের এগুলি অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত। রেডিওতে যখন

গান শুনি তখন তড়িৎশক্তি রূপান্তরিত হয়ে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করে অর্থাৎ শব্দশক্তিতে পরিণত হয়। বিভিন্ন রকম শক্তি মাপবার জন্য নানাবিধ কৌশল বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন। মেপে দেখা গিয়েছে যে একপ্রকারের শক্তি যখন অন্য প্রকারের শক্তিতে পরিবর্তিত হয় তখন তার মোট পরিমাণের তারতম্য ঘটে না। জড়ের ন্যায় শক্তিও অবিনাশী অর্থাৎ চিরন্তন।

উপরে যে পাঁচটি তত্ত্বের কথা বলা হল এগুলির উপরেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত জড়বিজ্ঞান দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভৌতিক জগতের যে চিত্র বিজ্ঞান আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিল তা ছিল অনেকটা এ রকম ঃ—দেশ তার অনন্ত বিস্তার নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছে, সেই বিরাট ব্যাপ্তির ভিতরে জড়কণাগুলি শক্তির তাড়নে লাফালাফি, দাপাদাপি করছে, ভাঙছে, গড়ছে, জোড়া লাগছে। শক্তিই মৌলিক জড় পরমাণুগুলিকে একত্র সংহত করে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ তৈরি করছে। শক্তির প্রয়োগেই আবার সেগুলি ভেঙে চুরমার হচ্ছে। 'জড়' একটা আলাদা জিনিষ, 'শক্তি' একটা আলাদা জিনিষ। জড়কে নিয়ে শক্তি নিরন্তর ছুটাছুটি, লুফালুফি, দাপাদাপি এবং ভাঙ্গাগড়ার খেলায় মত্ত। 'দেশ' সেই খেলার মাঠ। আর সেই খেলা হচ্ছে 'কালে'। কালের একটানা স্রোত অবিশ্রান্ত গতিতে বয়ে চলেছে ; তারি সঙ্গে তুলনা করে আমরা বিভিন্ন ঘটনার পৌর্বাপর্য নির্ণয় করছি। ঘটনাগুলি আবার নিমিত্তের শৃঙ্খলে বাঁধা ; তারা যেমন খুশী ঘটতে পারে না। দেশ, কাল, নিমিত্ত, শক্তি এবং জড়—সব কটি পৃথক পৃথক সত্তা। সবগুলি একত্র মিলিয়েই এই ভৌতিক জগৎ।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে বিগত পঞ্চাশ বছরে বিজ্ঞানের এই পাঁচটি ভিত্তিই একে একে নড়ে গিয়েছে। দেশ এবং কাল যে অনন্ত এবং পরস্পরনিরপেক্ষ একথা বৈজ্ঞানিকেরা আর স্বীকার করেন না। তাঁরা এখন বলছেন যে দেশ এবং কাল এই দুটি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং এই যুক্ত উপাদানের কাঠামের মধ্যেই আমাদের এই জড়জগৎ খাড়া রয়েছে। দেশ এবং কাল সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি এই যে এ দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ, একটির সঙ্গে অপরটির সম্পর্ক নাই, দুটিকে একত্র মিশানো যায় না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বলছে যে এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি যাই হোক না কেন, প্রকৃতি স্বয়ং দেশ ও কালের কোন মৌলিক প্রভেদ স্বীকার করেন না। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে দেশ অসীম হলেও অনন্ত-বিস্তৃত নয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা ভূপৃষ্ঠের কথা বলতে পারি। কেউ যদি ভূপৃষ্ঠের উপরে অবিরতভাবে হেঁটে বেড়ায়, তবে সে কোথায়ও এমন দেখতে পাবে না যে পৃথ্বীতলের সীমায় পৌঁছে গিয়েছে, এবং সামনে আর পা বাড়াবার জায়গা নাই। যতদিন ধরেই হাঁটুক, সে দেখতে পাবে তার সম্মুখে ভূপৃষ্ঠ আরো বিস্তৃত রয়েছে। কিন্তু এথেকে সিদ্ধান্ত করা চলে না যে ভূপৃষ্ঠের বিস্তার অনন্ত। আমরা যে ভূপর্যটকের কথা কল্পনা করছি তার নিকট ভূপৃষ্ঠ অসীম প্রতিভাত হবার একমাত্র কারণ এই যে পৃথিবীর গঠন গোলাকার, পৃথ্বীতলের কোথাও কোন সীমা-রেখা নাই। ভূপৃষ্ঠ অসীম হলেও অনন্তবিস্তৃত নয়। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে যে দেশের সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। আমাদের কল্পনার অশ্বকে যদি খুব বেগে ছুটাই তবে সেই অশ্ব যত মাস, বৎসর,

শতাব্দী, যুগ ধরে ছুটুক, দেশের সীমা সে দেখতে পাবে না,—একথা ঠিক। কিন্তু এদ্দ্বারা প্রমাণ হয় না যে দেশ অনন্ত। আইনষ্টানীয় বিজ্ঞানের মতে দেশ এবং কাল উভয়েই সান্ত এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই তত্ত্ব অঙ্ক কষে পাওয়া গেলেও আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে এর ঠিক ধারণা করে উঠতে পারি না, মনে হয় যেন হেঁয়ালি।

নিউটনের সূত্রানুযায়ী মহাকর্ষ একটা অদৃশ্য শক্তির খেলা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জড়পিণ্ড গোপন বাহু মেলে যেন পরস্পরকে টানছে। পরস্পরের দূরত্ব যত বেশী, আকর্ষণের মাত্রা তত কম। এই টানাটানির ফলেই মহাশূন্যে গ্রহতারকা ঘুরে বেড়াচ্ছে নির্দিষ্ট কক্ষপথে, এবং সুনিয়ন্ত্রিত গতিতে। মহাকর্ষের শক্তি আসলে কি, এবং এক জড়পিণ্ডের আকর্ষণশক্তি কি করে ব্যবধান ডিঙিয়ে অপর এক জড়-পিণ্ডের উপর ক্রিয়া করে তার কোন ব্যাখ্যা নিউটনের সূত্রের ভিতর ছিল না। একটা দড়ি বেঁধে যখন কোন বস্তুকে আমার দিকে টানি, তখন বস্তুটার উপর আমার পেশীশক্তির আকর্ষণক্রিয়া, এবং যে সূত্রের সাহায্যে 'শক্তি' তার ক্রিয়া সম্পান্ন করে—উভয়ই প্রত্যক্ষ। কিন্তু চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যে যে মহাকর্ষ, সেই আকর্ষণশক্তিকে কে চালিত করে এবং কোন রজ্জু দ্বারা উহা চালিত হয় তা আমরা চাক্ষুষ দেখতে ত পাইই না, নিউটনও তার কোন হদিস দেন নি। আইনষ্টাইন এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে মহাকর্ষ আসলে টানাটানির ব্যাপারই নয়। দেশ এবং কাল অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে তৈরি হয়েছে একটি চতুর্মাত্রিক সত্তা (Time-space continuum : দেশের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ,

বেধ এই তিন মাত্রা+কাল এক মাত্রা)। এই সত্তার মধ্যে যদি কোথাও কোন জড়পদার্থ না থাকে তবে উহার হয় সাম্যাবস্থা এবং উহার বিস্তার হয় অনন্ত। কিন্তু এই শূন্যের ভিতরে একবার জড়ের আবির্ভাব ঘটলে শূন্য আর অনন্তবিস্তৃত থাকে না, উহা হয়ে পড়ে সান্ত। যেখানেই জড়পিণ্ডের অবস্থান সেখানেই তার আশেপাশের সত্তা যেন বেঁকেচুরে যায়। এক গতিশীল পদার্থ যখন অপর কোন পদার্থজনিত এরূপ বাঁকাচুরার মধ্যে এসে পড়ে তখন আর ঋজুভাবে চলতে পারে না, বাঁকাচুরার রকম অনুযায়ী তার গতিপথও হয়ে পড়ে কুটিল। গ্রহনক্ষত্রের কক্ষপথ রচনার উহাই আসল কারণ। মনে রাখা উচিত যে বাঁকাচুরা কথাটার ব্যবহার এক্ষেত্রে নিছক রূপক। সূক্ষ্ম গাণিতিক বিষয়কে সাধারণ কথায় বলতে গেলে তা হয়ে দাঁড়ায় ভাষার কসরৎ,—তাতে বিষয়টার আভাসমাত্র দেওয়া যায়, ঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় না।

আইনষ্টাইনের সূত্রগুলিতে দেশ ও কাল যেভাবে পরিমাপ করা হয় তাও অতি অদ্ভুত। আইনষ্টাইনের গণিতে দেশের একক ১,৮৬,০০০ মাইল (অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে আলোকরশ্মি যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে), এবং কাল-পরিমাপের একক ১ সেকেণ্ড। সাধারণ দৃষ্টিতে আইনষ্টাইনের ব্যাখ্যা আগাগোড়াই মনে হয় যেন একটা হেঁয়ালি। একে শুধু গণিতের মারপ্যাঁচ বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত—যদি না বাস্তবজগতে পাওয়া যেত এর সমর্থন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে বাস্তব ভৌতিকজগতের ব্যাখ্যায় যেখানেই নিউটনের সূত্র ও আইনষ্টাইনের সূত্রে ঠোকাঠুকি লেগেছে সেখানেই জয় হয়েছে আইন-

ষ্টানীয় গণিতের। আমাদের দৈনন্দিন ব্যাপারে, গৃহনির্মাণে, কল-কব্জাগঠনে নিউটনীয় বিজ্ঞানেই যথেষ্ট কাজ চলে; কিন্তু পরমাণু-লোকের এবং নক্ষত্রলোকের সূক্ষ্ম হিসাবনিকাশে দেখা গিয়েছে যে নিউটনীয় সূত্র অচল, আইনষ্টানীয় সূত্রেরই জয় জয়কার।

পরমাণুকে মনে করা হত অবিভাজ্য। কিন্তু উনবিংশ শতক শেষ হবার আগেই এ ধারণা বদলে যায়; কারণ পরমাণুর ভিতর থেকে সূক্ষ্মতর কণা বৈজ্ঞানিকেরা বের করে নিতে সমর্থ হন। ক্রমাগত চেষ্টার ফলে বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণুর বিশ্লেষণে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছেন। পরমাণুকে ভেঙ্গে চুরে আরো সূক্ষ্মতর পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এক একটি পরমাণু যেন এক একটি সৌরজগৎ; পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে আছে সূর্য্যের অনুরূপ ভারী বস্তু যাকে বলা হয় ন্যুক্লিয়স অথবা শাঁস। তাতে রয়েছে পজিটিভ বিদ্যুৎ ভরপূর। ন্যুক্লিয়সের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে 'ইলেকট্রন'-কণিকা। ইলেকট্রনের গতিবেগ অতি প্রচণ্ড; সেকেণ্ডে সহস্রাধিক মাইল। 'ইলেকট্রন'-কণিকা নিগেটিভ বিদ্যুতে ভর্তি। শাঁসের পজিটিভ বিদ্যুৎ ইলেকট্রনকে সব সময়ে কেন্দ্রস্থলের দিকে টানছে, পক্ষান্তরে ইলেক-ট্রনের দারুণ গতিবেগ তাকে বাইরের দিকে ঠেলছে;—এই টানা-টানির ফলে ইলেকট্রন কেন্দ্রস্থলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না, আবার দূরে ছুটে যেতেও পারে না—একটা চক্রাকার গতিতে শাঁসের চারদিকে কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছে।

আমাদের সূর্য্যের যেমন একাধিক গ্রহ আছে; তেমনি বিভিন্ন রকমের পরমাণুতে বিভিন্নসংখ্যক ইলেকট্রন আছে। যে রকমের

পরমাণুতে যতগুলি ইলেকট্রন থাকে সেই অনুযায়ী পরমাণুর 'এটমিক নম্বর' নির্দিষ্ট হয়। হাইড্রোজেন পরমাণুতে আছে একটি ইলেকট্রন, কাজেই উহার এটমিক নম্বর এক; হিলিয়ম পরমাণুতে আছে দুটি ইলেকট্রন, সুতরাং উহার এটমিক নম্বর দুই; লিথিয়ামের পরমাণুতে তিনটি ইলেকট্রন, অতএব উহার এটমিক নম্বর তিন ইত্যাদি। এরকমভাবে সর্বশেষ ইউরেনিয়াম পর্যন্ত পৌঁছেছে;—ইউরেনিয়ামের এটমিক নম্বর ৯২। পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ ন্যুক্লিয়সে থাকে পজিটিভ বিদ্যুতে ভরা প্রোটন কণিকা। প্রত্যেক পরমাণুতে সমস্ত ইলেকট্রন মিলে যতটুকু নিগেটিভ বিদ্যুৎ, কেন্দ্রের প্রোটন-কণিকা গুলিতে থাকে ঠিক সেই পরিমাণ পজিটিভ বিদ্যুৎ। এই জন্যই পরমাণুর ভিতরে সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। আরো দেখা গিয়েছে যে প্রত্যেক পরমাণুর যেটুকু ভর, তার প্রায় সবটুকুই ন্যুক্লিয়সে বিদ্যমান, ইলেকট্রনের ভর নাই বললেও চলে। পরমাণুর আকার এত ছোট যে ১০ কোটি পরমাণু পাশাপাশি সাজালেও এক ইঞ্চি লম্বা হয় কি না সন্দেহ। এরূপ সূক্ষ্ম জিনিষের ভিতর যে আরো বহুসংখ্যক সূক্ষ্মতর জিনিষ থাকতে পারে এবং তাদের মধ্যে যে সৌরজগতের অভিনয় চলছে—একথা ভাবলেও বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। সৌরজগতের অধিকাংশ স্থানই শূন্য; গ্রহ উপগ্রহ যেটুকু স্থান জুড়ে আছে সমগ্র সৌরজগতের ব্যাপ্তির তুলনায় তা অতি নগণ্য। আশ্চর্যের বিষয় পরমাণুর ভিতরেও ঠিক তাই। ইলেকট্রন কণিকাগুলির আকারের তুলনায় তাদের পরস্পরের ব্যবধান গ্রহনক্ষত্রের ব্যবধানের মতই অতি বিরাট। পরমাণুর ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের ভিতরেও শূন্য অথবা ফাঁকা জায়গাই

বেশী ;—এমন নয় যে ইলেকট্রনগুলি খুব ঠেসাঠেসি করে রয়েছে।

পরমাণুর ন্যুক্লিয়সও অবিভাজ্য নয়। ন্যুক্লিয়সকে ভেঙ্গে বৈজ্ঞানিকেরা ন্যুট্রন ও পজিট্রন নামক আরো দুরকম কণিকার সন্ধান পেয়েছেন। এখন ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে এই যে আমরা যেগুলিকে 'মৌলিক' পদার্থ বলি, তারা আসলে শুধু ইলেকট্রন ও প্রোটন কণিকার সমষ্টি। ইলেকট্রন ও প্রোটন কণিকার সংখ্যার তারতম্যই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পার্থক্যের একমাত্র কারণ। এই সংখ্যার যদি অদলবদল করা যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে এক মৌলিকপদার্থ আরেক মৌলিক পদার্থে পরিণত হতে বাধ্য। বৈজ্ঞানিকেরা এরূপ করতে সমর্থ হয়েছেন। আবার যেগুলি তেজস্ক্রিয় পদার্থ সেগুলির মধ্যে আপনা থেকেই একাজ হচ্ছে। এই ক্রিয়ার ফলেই ইউরেনিয়াম ধাতু রূপান্তরিত হচ্ছে হিলিয়ম ও সীসক এই দুটি মৌলিক পদার্থে। অতএব মৌলিক পদার্থ বলতে যে ৯২ রকমের অবিভাজ্য ও অপরিবর্তনীয় পরমাণু বুঝা যেত তা আর রইল না। ইলেকট্রন ও প্রোটন (তৎসঙ্গে ন্যুট্রন ও পজিট্রন) হয়ে দাঁড়াল ভৌতিক জগতের আসল উপাদান। কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

আগেকার যুগে মনে করা হত যে ভর শুধু জড়পদার্থেরই আছে, শক্তির কোন ভর নাই। আইনষ্টাইন গুণে দেখালেন যে 'শক্তি'রও ভর আছে, যদিও জড়ের তুলনায় উহা খুবই সামান্য। আলোকশক্তি, উত্তাপশক্তি, গতিশক্তি প্রভৃতি সব রকমের শক্তিরই একটু না একটু ভর আছে। মাল বোঝাই অবস্থায় কোন নোঙ্গরকরা জাহাজের ওজন

যদি ৫০০০০ টন হয় তবে উহা যখন ঘন্টাপ্রতি ২৫ মাইল বেগে চলে তখন উহার ওজন বাড়ে $\frac{১}{১০,০০০০০}$ আউন্স। ভূপৃষ্ঠের প্রতি বর্গমাইলে ১ মিনিটে যেটুকু সূর্যালোক পড়ে তার ওজন $\frac{১}{১০০০০}$ আউন্স। অতএব আগেকার বিজ্ঞানে যেমন 'শক্তি'কে একেবারে হিসাবের বাইরে রেখে বলা হত যে জড়ের মোট ভর সর্বাবস্থায় সমান—তা আর এখন বলতে পারা যায় না। নূতন বিজ্ঞানের সূত্রানুযায়ী জড় ও শক্তি প্রত্যেকের ভর পৃথক পৃথক ভাবে অটুট নয়;—কিন্তু উভয়ের সম্মিলিত ভর চিরস্থির।

আলোকের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা দেখতে পেলেন যে আলোর প্রকৃতির মধ্যে একটা দ্বৈতভাব রয়েছে। একভাবে দেখতে গেলে মনে হয় যেন আলোক-রশ্মি শুধু ঢেউয়ের পরে ঢেউ—একটা তরঙ্গমালা। আরেক ভাবে নিরীক্ষণ ও বিচার করলে মনে হয় যেন আলোকরশ্মি জড়কণিকার বর্ষণধারা। কণিকারাশি পর পর সারি বেঁধে ছুটে চলেছে—এরি নাম আলোকরশ্মি। এই কারণেই আলোকেরও ভর আছে। আলোক শুধু তরঙ্গ কিংবা শুধু কণিকা—একথা বলা চলে না। কতক ব্যাপারে আলোকের আচরণ তরঙ্গের ন্যায়, আবার কতক ব্যাপারে কণিকা-সমষ্টির ন্যায়।

পরমাণুর বিচার করতে গিয়েও বৈজ্ঞানিকেরা এই দ্বৈতভাব দেখতে পেয়েছেন। পরমাণুর বর্ণনায় আমরা বলেছি যে পরমাণু যেন বৈদ্যুতিক চার্জবিশিষ্ট অতি সূক্ষ্ম জড়কণিকাসমূহের এক একটি সৌরজগৎ। কিন্তু আরেকভাবে বিচার করে দেখা গিয়েছে যে এক একটি ইলেকট্রন

ও প্রোটন যেন তরঙ্গের এক একটি ঘূর্ণাবর্ত। জড় ও শক্তির মধ্যে কোন অলঙ্ঘ্য প্রাচীর নাই। জড় ষোল আনা ধ্বংস হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে এবং মহাশূন্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে সম্ভবতঃ বিপুলভাবে এই কাণ্ড চলেছে। তারি ফলে আমাদের এই পৃথিবীর তটে এসে আঘাত করে 'মহাজাগতিক' আলো (Cosmic Rays) যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু যার গতিবেগ এত প্রচণ্ড যে কয়েক গজ পুরু সীসা উহা অনায়াসে ভেদ করে চলে যেতে পারে। আবার কেউ কেউ বলছেন যে ব্যাপারটা শুধু একটানা নয় অর্থাৎ কেবলমাত্র জড় যে তেজ অর্থাৎ শক্তিতে পরিণত হচ্ছে তা নয়, তেজঃপদার্থও দানা বেঁধে জড়-পদার্থে পরিণত হতে পারে। মহাজাগতিক আলোকরশ্মিকে একদল বৈজ্ঞানিক প্রলয়ের,এবং আরেক দল বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির নিদর্শন বলে ব্যাখ্যা করছেন। যাই হোক না কেন, উভয় মতেই জড়পরমাণুর নিত্যতা অস্বীকার করা হচ্ছে। অতএব শুধু জড়ের কিংবা শুধু শক্তির অবিনাশিত্ব বলে আর কিছু রইল না; কিন্তু উভয়ের মিলিত সমষ্টি হচ্ছে চিরস্থির অর্থাৎ অবিনাশী। কথাটা দাঁড়াল এই যে একটি মাত্র সংবস্তু নানা রকম জড়-পদার্থ ও শক্তিরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। এই সৎবস্তুর আসলে বিনাশ নাই, পরিমাণেরও ব্যত্যয় নাই। কিন্তু এর রূপ অনবরত বদলাচ্ছে। ভৌতিক জগতের একমাত্র অথবা মুখ্য ব্যাপারই হল এই অদলবদল। কবির ভাষায়—

"বিশ্ব জুড়িয়া না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

দেশ, কাল, জড় ও শক্তি সম্পর্কে পুরাতন ধারণা ও সিদ্ধান্তসমূহ কিরূপ বদলে গিয়েছে তার আভাস উপরে দেওয়া হল, এখন বাকী রইল 'নিমিত্তের' কথা। প্রাণিজগতে বিশেষতঃ মানুষের কার্যকলাপে ইচ্ছাশক্তির খেলা আছে, কোন লৌহকঠিন নিগড় অথবা বাধ্যবাধকতা নাই। আমার ইচ্ছা হয় ত সারাদিন শুয়ে থাকতে পারি, কিংবা ঘুরে বেড়াতে পারি কিংবা আরো দশরকম দশটা করতে পারি। অতএব আমি কি করব কিংবা করব না—এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। কোন লোককে যদি চড় মারা যায় তবে সে নীরবে সহ্য করবে কিংবা রুখে দাঁড়াবে, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। কিন্তু প্রকৃতি হচ্ছে নিয়মের রাজ্য, সেখানে স্বাধীন ইচ্ছা কিংবা খামখেয়ালির স্থান নাই। একটা ঢিল পূবদিকে ছুঁড়ে মারলে তাকে সেই দিকেই যেতে হবে, অপর কোনদিকে যেতে পারবে না কিংবা যেতে অস্বীকার করতেও পারবে না। ভৌতিক জগতে সমস্ত বাঁধা-ধরা কারবার ;—এতটুকু নড়চড় হবার যো নাই। কার্যকারণ এক অবিচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বাঁধা। প্রকৃতির যন্ত্র একেবারে নিখুঁত —তার কাজ মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয় না, কিংবা তাতে তিলমাত্র হেরফের হয় না। জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে এই ধারণাও বদলাতে হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা এখন আবিষ্কার করেছেন যে প্রাকৃতিক জগতেও নিয়মের রাজত্ব অটুট নয়, সেখানেও হেরফের আছে। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি তেজস্ক্রিয় পদার্থের কথা। একখণ্ড রেডিয়াম থেকে ঠিক নির্দিষ্ট ম্যাদ অন্তে একটি করে পরমাণু ভেঙ্গে গিয়ে পরিশেষে হিলিয়ম ও সীসকের পরমাণুতে

রূপান্তরিত হচ্ছে। ঠিক কোন পরমাণুটি যে ভাঙবে তা আগে থাকতে কেউ বলতে পারে না। চোখ বুজে ভিড়ের উপর গুলি ছুঁড়লে যা ঘটে এ যেন ঠিক তাই। রেডিয়মের ভাঙনের পশ্চাতে যদি কোন প্রাকৃতিক নিয়ম থাকে তবে তা রেডিয়মখণ্ডের সমস্ত পরমাণুর উপর সমানভাবে একসঙ্গে ক্রিয়া না করে খামখেয়ালীভাবে একবারে শুধু একটি পরমাণুকে কেন আক্রমণ করে, তার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নি। গ্রামের মধ্যে ছেলে বুড়া স্ত্রী পুরুষ সবরকম লোক আছে; হঠাৎ যেন মৃত্যু এসে একজনকে ধরে নিয়ে গেল, বয়সের বিচার নাই, স্বাস্থ্যের বিচার নাই, কোন কিছুর বালাই নাই। এটা শুধু একটি দৃষ্টান্ত। পরমাণুজগতে আরো একাধিক বিষয় আছে যেখানে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। পরমাণুকে নিয়ে যদি একই পরীক্ষা ঠিক একই ভাবে বারংবার করা যায় তবে প্রত্যেকবারে ঠিক একই রকম ফল পাওয়া যায় না। অনেকবার পরীক্ষা করে একটা গড়পড়তার নিয়ম অবশ্য বার করা যায়—যেমন প্রতি একশবার পরীক্ষায় ৫০ বারে এক-রকম ফল, ৩০ বারে আরেক রকম ফল, এবং বাকী ২০ বারে তৃতীয় আরেক রকম। প্রাকৃতিক নিয়ম বলতে আমরা যেমন বাঁধাধরা, অব্যভিচারী নিয়ম বুঝি—এ সে রকম নিয়ম নয়। গড়পড়তা জন্মহার, মৃত্যুহার প্রভৃতি বলতে আমরা যেমন একটা মোটামুটি সম্ভাব্যতার কথা বুঝি এও সেই ধরণের। অর্থাৎ এতে কার্যকারণ সম্পর্কের নিশ্চয়তা ও অলঙ্ঘনীয়তা নাই। কোন অজানা ইচ্ছাশক্তি যেন গৎবাঁধা নিয়মকে মাঝে মাঝে ওলট পালট করে দিচ্ছে। এর মানে বুঝতে পারা দুষ্কর। সাধারণ ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে জগৎ তাতে প্রাকৃতিক নিয়মের

স্থিরতা ও অব্যভিচারিতা স্বীকার না করলে আমাদের কলকজ্জা, যন্ত্রপাতি সব কিছু অচল হয়ে যায়, অথচ পরমাণুলোকের সূক্ষ্ম গতিবিধিতে কার্য-কারণ সম্পর্কের ব্যতিক্রম স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। কার্যকারণ শৃঙ্খলাকে আমরা নিশ্চয়ই উড়িয়ে দিতে পারি না, অথচ একে সর্বত্র সমানভাবে স্বীকার করতেও পারছি না। নিমিত্ত ও দৈব দুইই যেন পাশাপাশি রয়েছে।

যে সকল ধারণা কিংবা উপপত্তি ছিল নিউটনীয় বিজ্ঞানের প্রধান অবলম্বন, আধুনিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে তাদের নিত্যত্ব উড়ে গিয়েছে। যেটা আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জগৎ তাতে দেশ, কাল, জড় ও শক্তির পৃথক অস্তিত্ব এবং নিত্যত্ব মেনে নিলে কোন ক্ষতি হয় না, সমস্ত গণনা ঠিক মিলে যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম পরমাণুলোকের, বিশাল নক্ষত্রলোকের, এবং আলোকরশ্মির ন্যায় প্রচণ্ড গতিশীল কোন পদার্থের বিচার যখন আমরা করি তখন দেশ এবং কালের পার্থক্য, জড় ও শক্তির পার্থক্য, নিমিত্তের অলঙ্ঘনীয়ত্ব—প্রভৃতি সব কিছু যায় টুটে। অর্থাৎ আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে এ সকল ধারণা শুধু আপেক্ষিকভাবে সত্য; সর্বাবস্থায় সত্য নয়। আমরা যদি সূর্যের ন্যায় বড় হতাম, ইলেকট্রনের ন্যায় ছোট হতাম, কিংবা সেকেণ্ডে দু'লক্ষ মাইল বেগে ছুটতে পারতাম তবে জগৎটার চেহারা এখন যেমন দেখছি তেমন দেখতাম না। সব কিছু হয়ে যেত অন্যরকম। কিন্তু তা হলেও ভৌতিক জগতে 'নিত্য' বলতে যে কিছুই নাই তা নয়। আইনষ্টাইনের মতে দেশ ও কালের মিশ্রণে উৎপন্ন যে চতুর্মাত্রিক সত্তা—তা হল নিত্য, সেটা আপেক্ষিক নয়। সেই সত্তার কাঠামের ভিতরে যে সকল 'ঘটনা' ঘটে

সেগুলিই শুধু আমাদের অনুভূতির বিষয়। জড় এবং শক্তি আসলে কি,—পরমাণু আসলে কি—তা আমরা জানি না এবং জানতে পারি না। শুধু তাদের কার্যকলাপ—অর্থাৎ তাদের ভিতরে কিংবা তাদের সমবায়ে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে—সেগুলিকেই আমরা প্রত্যক্ষ করতে এবং জানতে সমর্থ।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভৌতিক জগৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা রহস্য। জগতের প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানতে পারি না। জড় এবং শক্তির অন্তরালে অবস্থিত যে 'সৎ'বস্তু ভৌতিক জগতের আসল উপাদান—সেই বস্তুটির শুধু প্রকাশ আমরা দেখতে পাই,—আসল বস্তুটি আমাদের হাতে ধরা দেয় না। অর্থাৎ আরেক-ভাবে বলতে গেলে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হচ্ছে মায়া।

এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের এই যে মতবাদ ইহা কোন চরম সিদ্ধান্ত নয়। বিজ্ঞানের কোথাও 'ইতি' নাই। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সমূহ ক্রমাগত সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। কাল-ক্রমে আইনষ্টানীয় সিদ্ধান্তগুলিও হয়ত বদলে গিয়ে অন্যান্য সিদ্ধান্ত তাদের স্থান দখল করবে। কিন্তু তবুও একথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করতেই হবে যে আধুনিক বিজ্ঞান জগৎরহস্যের অনেকখানি ভিতরে প্রবেশ করেছে এবং তারই ফলে বৈজ্ঞানিকের ঔদ্ধত্য দূরীভূত হয়েছে। আইনষ্টানীয় মতবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে মহামনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল মন্তব্য করেছেন—"বিজ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না, কিন্তু যতটুকু জেনেছি তাতেও বিস্মিত না হয়ে

উপায় নাই ;—আর সেই স্বল্পমাত্র জ্ঞান ব্যবহারিক জগতে যে বিরাট ক্ষমতা মানুষের মুঠোর মধ্যে এনেছে তা আরও বিস্ময়কর।"

পরিদৃশ্যমান জগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার একটি প্রধান ত্রুটি এই যে এতে চেতনার কোন বিশেষ স্থান কিংবা বিচার নাই। যাঁরা নিছক জড়বাদী তাঁদের মতে জড়পদার্থই একমাত্র বাস্তব জিনিষ। মস্তিষ্ক হল জড়কণার সমষ্টি ; আর চিন্তা, অনুভূতি প্রভৃতি হল মস্তিষ্কেরই ধর্ম অথবা ক্রিয়া। অতএব জড়কে বাদ দিয়ে চেতনার পৃথক অস্তিত্ব বলতে কিছুই নাই। জীবজগতের অভিব্যক্তির ব্যাপারে আমরা দেখতে পাই যে দেহের পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে—নিম্নতর হতে উচ্চতর প্রাণিবর্গের মধ্যে ক্রমশঃ অধিকতর মাত্রায় মস্তিষ্কের পরিপুষ্টি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়েছে। অর্থাৎ, দেহের অভিব্যক্তির সঙ্গে বুদ্ধি এবং মননশীলতা সাক্ষাৎভাবে সংসৃষ্ট। যেহেতু দেহ একটা জড়পিণ্ড অতএব চেতনাকে সেই জড়পিণ্ডের একটা ক্রিয়া অথবা ধর্ম ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ?

এই যুক্তির মধ্যে একটা মস্ত ফাঁক রয়েছে। 'প্রাণ' ব্যতীত বুদ্ধি অনুভূতি ও চেতনার কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না। অভিব্যক্তির আলোচনায় আমরা দেখেছি যে সমগ্র জীবজগৎ জুড়ে একই প্রাণের বিকাশ। কিন্তু সেই প্রাণ কোথা থেকে এল, প্রাণের স্বরূপ কি—তা বৈজ্ঞানিকেরা এখনো জানেন না। জড় পরমাণুকে হরেক রকম ভাবে সাজিয়ে এবং জোড়া লাগিয়েও তাঁরা 'প্রাণ' সৃষ্টি করতে সমর্থ হন নি। অতএব শুধু জড়কণার সমবায়ে প্রাণ এবং চেতনা যে আপনা থেকে সৃষ্ট হয় একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত

অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক মনে করতেন যে জড়পরমাণু এমন একটা নিরেট অবিনশ্বর পদার্থ যে তার বাস্তবতার সম্পর্কে কোন সন্দেহ প্রকাশ করা যেতে পারে না। পক্ষান্তরে সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি অদৃশ্য জিনিষ মানুষের মনে উঠে এবং লয় পায়; অতএব এগুলি তেমন বাস্তব নয়,—অন্ততঃ জড়ের বাস্তবতার সঙ্গে এদের বাস্তবতার কোন তুলনা হয় না। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জড়পরমাণুর স্বরূপ যেটুকু উদ্ঘাটিত হয়েছে তাতে জড়ের সম্পর্কে আর এরূপ উগ্র বাস্তববাদী হবার যো নাই। পরমাণু হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন একটা রহস্যপূর্ণ ব্যাপার যাকে নিছক জড় বলে বর্ণনা করা যায় না। "বিশ্বজগতে জড়পরমাণুগুলিই আসল এবং চেতনার বিকাশ যেটুকু আমরা দেখতে পাই তা জড়েরই ধর্ম'—একথা না বলে এখন যদি কেউ ঘুরিয়ে বলেন যে 'চেতনাই আসল এবং জড়কণার ভিতর দিয়ে আমরা দেখতে পাই চেতনারই প্রকাশ' তা হলে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে তাঁকে ঠেকানো মুশকিল।

চেতনাকে বাদ দেওয়া মানে জ্ঞাতাকেই বাদ দেওয়া। বিজ্ঞানশাস্ত্র জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে ভৌতিক জগতের অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুর বিচার করে। সেজন্য এই বিচার অসম্পূর্ণ। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মাকে কেন্দ্র করে বিশ্বপ্রপঞ্চের বিচার করা হয়েছে। তাই এই দর্শনের নাম অধ্যাত্মশাস্ত্র। আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। যাঁরা এই জ্ঞান লাভ করেছেন তাঁরাও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মায়াময়। তার মানে এই নয় যে উহা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। 'মায়াময়' কিংবা 'মায়িক' বলতে তাঁরা এটাই বুঝাতে চান যে বিশ্বজগৎ যে ভাবে আমাদের নিকট

প্রতিভাত হয় উহা তার সত্যিকার রূপ নয়। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের ত্রুটির জন্য, এবং আমাদের দেখার দোষে জগৎকে একে আর বলে মনে করি। পুনঃ পুনঃ বিচারের দ্বারা, এবং সৎ জীবন যাপনের দ্বারা যখন বুদ্ধি ষোল আনা মার্জিত ও পরিশুদ্ধ হয়, তখন বিশ্বজগতের সত্যিকার রূপ আমাদের চোখে ধরা দেয়। যাঁর সেই দিব্যচক্ষু ফুটে তিনি অমৃতের অর্থাৎ পরমানন্দের আস্বাদ পান।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে আছে একটিমাত্র 'সৎ' বস্তু। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম ও চেতনার উপর ঘাত প্রতিঘাতের ফলে সেই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ আমরা জানতে পাই; কিন্তু বস্তুটির আসল স্বরূপ আমাদের বুদ্ধির নিকট ধরা দেয় না। অধ্যাত্মশাস্ত্র আমাদিগকে বলে যে জগতের আশ্রয় একটিমাত্র 'সৎ' বস্তু তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই বস্তুটি শুধু 'সৎ' নয়, অধিকন্তু উহা 'চিৎ' এবং 'আনন্দময়'। সেই 'সচ্চিদানন্দ' দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত। একথা ঠিক বটে যে শুধু যুক্তিবিচার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না; কিন্তু তাই বলে তিনি অজ্ঞেয় নন। জানবার আগ্রহ তীব্রভাবে মনে জাগলে উপযুক্ত সাধনা দ্বারা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে এবং নিঃসন্দেহরূপে জানা যায়,—যদিও সেই জ্ঞান বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। সকল যুগের এবং সকল দেশের তত্ত্বদর্শী ঋষিরা, মরমী সাধকেরা, এবং মহাপুরুষেরা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে আসছেন যে তাঁরা সেই পরম তত্ত্বকে জেনেছেন এবং জেনে পরা শান্তি লাভ করেছেন।

ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ!! ওঁ শান্তিঃ!!!